প্রতিচিন্তা



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

পঞ্চম বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫

**সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান** কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
**পরিবেশক :** প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

# প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা ২০১৫

**সম্পাদক**
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

**ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

**উপদেষ্টা পর্ষদ**
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাহবুব হোসেন, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; উপদেষ্টা, ব্র্যাক

**সম্পাদনা পর্ষদ**
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

**প্রচ্ছদ**
কাইয়ুম চৌধুরী, চিত্রশিল্পী

**শিল্প নির্দেশক**
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

**সহকারী সম্পাদক**
খলিলউল্লাহ্ ও জোশিতা জিহান অর্নব

**দাম : ৫০ টাকা**
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : protichinta.prothom-alo.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
January-March Issue, 2015; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

## সূ চি প ত্র

**স ম্পা দ কী য়**
৬

**রা জ নী তি**

**বাংলাদেশে নতুন ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল**
আলী রীয়াজ
৯

**অ র্থ নী তি**

**নজরদারির পুঁজিবাদ : একচেটিয়া-ফিন্যান্স পুঁজি, সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স ও ডিজিটাল যুগ**
জন বেলামি ফস্টার ও রবার্ট ডব্লিউ ম্যাকচেনজি
৩৭

**স মা জ ও না রী**

**স্বামীর প্রবাসকালে গ্রামীণ বাংলার নারী : ক্ষমতা, শক্তি ও অধীনতার ধারণার পুনর্ব্যাখ্যা**
সৈয়দা রোযানা রশীদ
৭৭

**জা তী য় তা বা দ**

**লিসবনে শহীদ মিনার : পর্তুগাল প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে স্মৃতি ও সম্প্রদায়ের রাজনীতি এবং দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ**
হোস ম্যাপ্রিল
১০৫

**সা ক্ষ্য প্র মা ণ ও দ লি ল প ত্র**

মার্কিন দলিলপত্রের সাক্ষ্য
**কেন বুদ্ধিজীবী হত্যা? কীভাবে জামায়াত জড়িত?**
মিজানুর রহমান খান
১২৬

**ব ই আ লো চ না**

**অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিন**
আসজাদুল কিবরিয়া
১৪১

**কিসিঞ্জারের বয়ানে পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার রূপকল্প**
রেজওয়ান মাসুদ
১৫৮

**লেখক পরিচিতি**
১৭১




বাংলাদেশে জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা বা পাবলিক স্ফেয়ার বরাবরের মতই উদারনৈতিকতাভিত্তিক ছিল। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মকেন্দ্রিকতার প্রভাব বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে জনপরিমণ্ডলব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা জরুরি হয়ে পড়েছে। ইসলামপন্থী একটি জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা বাংলাদেশের সমাজে ক্রমেই গড়ে উঠছে। আলী রীয়াজ এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জনপরিমণ্ডলের ইসলামীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ইসলামি ফিকশন লেখা ও প্রকাশ এবং নারীদের মধ্যে ইসলামসম্পর্কিত পাঠচক্র প্রতিষ্ঠার উপর আলোকপাত করেছেন। কিভাবে নতুন ধরণের জনপরিমণ্ডল তৈরিতে এই দুটি ব্যবহার করছে তার চিত্রটি তিনি এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

বর্তমান বিশ্বে অন্যতম আলোচিত বিষয় হল মার্কিন নজরদারি কর্মকাণ্ড এবং সেসব রেকর্ড ফাঁস হয়ে যাওয়া। ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটি একটি চরম আঘাত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার সঙ্গে নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার এবং সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সকে টিকিয়ে রাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম নীতিতে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়টির একটি তথ্যবহুল বিষদ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন জন বেলামি ফস্টার ও রবার্ট ডব্লিউ ম্যাকচেনজি। আমরাও ডিজিটাইজেশনের কথা বলছি, বলছি ডিজিটাল অর্থনীতির কথা—আমাদের ভবিষ্যৎ এই বিশ্ব বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই চলছে। এই বিশ্ব বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই চলছে। এই বিশ্ব বাস্তবতাকে পরস্পরের তাই বোঝা-পড়া জরুরি। সে বিবেচনা থেকে এ প্রবন্ধটি মান্থলি রিভিউ থেকে অনুবাদ করে ছাপানো হলো।

বৈদেশিক রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে এর সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা যুক্ত রয়েছে। স্বামীর শ্রম অভিবাসনের ফলে স্ত্রীর বহির্মূখী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটে থাকে। এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কিন্তু সৈয়দা রোযানা রশীদ ভিন্ন আঙ্গিকে নারীর ক্ষমতায়নকে দেখার চেষ্টা করেছেন। পুরুষের অনুপস্থিতিতে নারীর এই ক্ষমতায়ন বাস্তবিক অর্থে কতটুকু স্থায়ী হয় তা পর্যালোচনা করতে লেখিকা ক্ষমতায়নের ধারণায় আবদ্ধ না থাকে আমিত্ব (Selfhood), ইচ্ছাশক্তি (Agnecy), এবং 'ক্ষমতা'র (Power) মতো ধারণাগুলোর উপর জোর দিয়েছেন।

*প্রতিচিন্তায়* এবারই প্রথম আমরা আর্কাইভাল দলিলপত্র ছাপছি। *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে মিজানুর রহমান খান যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কাইভে গবেষণা কাজে দুমাসের বেশি সময় নিয়োজিত ছিলেন। সেখানে প্রাপ্ত দলিলপত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কেন দেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় এবং জামায়াত ইসলাম নামক দলটি কিভাবে সেই বর্বর হত্যাকাণ্ডে সরাসরি ভূমিকা রেখেছে তার প্রমাণাদি পাওয়া যায়।

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম স্তম্ভ বাংলাভাষাভিত্তিক আন্দোলন এবং আত্মত্যাগের মহিমা মাখা শহীদ মিনারের একটি ভিন্ন আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে এই সংখ্যায়। শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদকে জোসে ম্যাপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘ দুরত্বের জাতীয়তাবাদ এবং স্মৃতির রাজনীতি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং কিভাবে এই শহীদ মিনার প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সংযুক্ত রাখতে ভূমিকা রাখছে, তা তুলে ধরেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি সারা দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করার পরও যে তাঁদের মাতৃভাষার প্রতি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি অভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে এবং তা করে যাচ্ছেন, সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা থেকেই এই লেখাটি ছাপা হল।

বই আলোচনায় থাকছে জনাথন কুকের *ডিজঅ্যাপিয়ারিং প্যালেস্টাইন*। আলোচনা করেছেন আসজাদুল কিবরিয়া। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নিয়েই এই বইটি। বিশ্ব রাজনীতিতে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিষয়টি একটি চলমান সংকট। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে এটি আদতে গোটা বিশ্ব রাজনীতিতেই বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এই সংকটটি মাথায় রেখে দ্বিতীয় বই আলোচনাটি বাছাই করা হয়েছে হেনরি কিসিঞ্জারের *ওয়ার্ল্ড ওর্ডার*, যেখানে বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে সার্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন সাবেক মার্কিন কূটনীতিক হেনরি কিসিঞ্জার। আলোচনা করেছেন রেজওয়ান মাসুদ।

সম্প্রতি বরেণ্য চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী প্রয়াত হয়েছেন। তিনি *প্রতিচিন্তার* বিগত নয়টি সংখ্যার প্রচ্ছদ অংকন করেছিলেন। এই খ্যাতিমান শিল্পীর শূন্যতায় দেশ ও জাতির যেমন অপূর্ণ ক্ষতি হয়েছে, তেমনি *প্রতিচিন্তা* ও এর পরিবারেরও অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উনার পূর্ববর্তী অঙ্কিত কয়েকটি প্রচ্ছদের সমন্বয়ে আমাদের এবারের সংখ্যার প্রচ্ছদ করা হয়েছে। আমরা শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

খাতি রাজনীতি চিন্তা

# বাংলাদেশে নতুন ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল

**আলী রীয়াজ**

**সারসংক্ষেপ**

বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবেই শক্তিশালী, গতিশীল এবং দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত একটি জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা বা পাবলিক স্ফেয়ার উপস্থিত থেকেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ এবং জনমানস সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে এই জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ যাবৎ জনপরিমণ্ডলব্যবস্থার ধারণার ভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ যৌক্তিকতা বা ধর্মীয় উদারনৈতিকতা। কিন্তু এখন একটি ইসলামি বা ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা তৈরির প্রক্রিয়া বাংলাদেশে ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। এই নিবন্ধে এই ধরনের চেষ্টার দুটি উদাহরণের ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে, যেগুলো জনপরিমণ্ডলের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এগুলো হচ্ছে ইসলামি ফিকশন লেখা ও প্রকাশ এবং নারীদের মধ্যে ইসলামসম্পর্কিত পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, বহুত্ববাদিতার সম্ভাবনার বদলে ইসলামি জনপরিমণ্ডলব্যবস্থায় ইসলামের একটি ব্যাখ্যাই গৃহীত হচ্ছে, সেখানে প্রথাগত মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা বিভিন্ন ইসলামপন্থী চিন্তাবিদের মতবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। তদুপরি বিকাশমান ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল এটা এখনো দেখাতে পারেনি যে এটি বাংলাদেশি সমাজের ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। ইসলাম পন্থার বৈশ্বিক প্রবণতা এসব প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা বলেই মনে হয়।

**মুখ্য শব্দগুচ্ছ:** জনপরিমণ্ডল, জনবলয়, বিরোধী বলয়, শরিয়া, ইসলামি ফিকশন, হালাকা, পাঠচক্র।

## সূচনা

বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবেই শক্তিশালী, গতিশীল এবং দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত একটি জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা বা পাবলিক স্ফেয়ার উপস্থিত

থেকেছে। অন্য কথায় বললে, বাংলাদেশের জনজীবনে একটি যুক্তিনির্ভর এবং সমালোচনামূলক ভাব বিনিময়ের ব্যবস্থা দুর্লভ কোনো বিষয় নয়, কোনো বহিরাগত বিষয়ও নয়। বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ এবং জনমানস সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে এই জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আর এই ব্যবস্থার মধ্যে সব সময়ই প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু অসম কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি ছিল। এক বিবেচনায় জনপরিমণ্ডলব্যবস্থার ধারণার ভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ যৌক্তিকতা বা ধর্মীয় উদারনৈতিকতা।[১] এসব ধারণার প্রতিনিধিত্বকারী কণ্ঠস্বরগুলো জনপরিমণ্ডলের আলোচনায় বা বিতর্কে, এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত, ধর্মীয় উপাদান যুক্ত করতে আগ্রহী ছিল না।

কিন্তু এখন পরিস্থিতির বদল ঘটছে। দেশের ভেতরে ইসলামপন্থী রাজনীতির ক্রমবর্ধমান শক্তি[২] এবং বৈশ্বিকভাবে বিকাশমান প্রবণতার কারণে একটি ইসলামি বা ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা তৈরির প্রক্রিয়া বাংলাদেশে ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। ইসলামি জনপরিমণ্ডল বলতে আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হচ্ছে, বিতর্ক এবং আলোচনার এমন একটি স্পেস তৈরি করা, যা ইসলামি গ্রন্থ এবং ইসলামি ধ্যানধারণা দিয়ে প্রভাবিত, যা দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রক্রিয়ায় ইসলামকে সামনে নিয়ে আসে এবং বর্তমান জনপরিমণ্ডলব্যবস্থার বিপরীতে ভিন্নধর্মী প্রভাববলয় সৃষ্টির প্রয়াসী। এই নিবন্ধে আমি এ ধরনের চেষ্টার দুটি উদাহরণের ওপরে আলোকপাত করব যেগুলো জনপরিমণ্ডলের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এগুলো হচ্ছে প্রথমত, ইসলামি ফিকশন লেখা ও প্রকাশ, দ্বিতীয়ত, নারীদের মধ্যে ইসলামসম্পর্কিত পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা। এসবের পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় বাংলাদেশের সমকালীন সমাজে ইসলামকে সামনে নিয়ে আসছে; সমাজে ও রাজনীতিতে ইসলামের সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য উপস্থিতি থেকে এই প্রচেষ্টাগুলো যেমন লাভবান হচ্ছে, তেমনি এগুলোও ইসলামকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

## জনপরিমণ্ডল এবং কাউন্টার পাবলিক (বিরোধী পরিমণ্ডল)

জনপরিমণ্ডলের ধারণা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক রয়েছে—এ কথা বিবেচনায় রেখেই এ প্রবন্ধে আমি জনপরিমণ্ডল ধারণাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি : পরিবার এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রভাববলয়ের বাইরে স্বাধীন সামাজিক তৎপরতার ক্ষেত্রকে আমি জনপরিমণ্ডল বলে বিবেচনা করেছি। জারগেন হেবারমাস জনপরিমণ্ডল ধারণাটির সূচনার বা প্রবর্তনের ব্যাপারে কৃতিত্বের অধিকারী।[৩] তাঁর ধারণাটির সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে আমাকে অনেকাংশে সাহায্য করেছে এবং এই প্রবন্ধে এই ধারণার ব্যবহার সেই প্রায়োগিক বিবেচনা দিয়ে



প্রভাবিত। সেই সঙ্গে ধারণাটির সীমাবদ্ধতাকেও মেনে নেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে আমার চিন্তা মিরিয়াম হেক্সটার[৪] এবং রজার কার্টিয়ারের চিন্তা ও ব্যাখ্যার মোটামুটি কাছাকাছি। কার্টিয়ার জনবলয় বলতে 'রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত আলোচনা-সমালোচনা এবং ভাববিনিময়ের একটি ক্ষেত্রকে' বুঝিয়েছেন।[৫]

জনপরিমণ্ডলকে এত ব্যাপকভাবে সংজ্ঞায়িত করার পরও বিষয়টি আরেকটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। হেবারমাসের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত জনপরিমণ্ডলের এ ধরনের সংজ্ঞায়নের সঙ্গে অনেককেই দ্বিমত করতে দেখা যায়। যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের জার্মানি) বিবেচনায় নিয়ে তিনি তাঁর জনপরিমণ্ডল ধারণার সূচনা ঘটিয়েছেন তাতে কিছু উপাদানের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী কিংবা সম্পত্তির মালিক নন এমন গোষ্ঠীগুলো হেবারমাসের কথিত জনপরিমণ্ডলে স্থান পায়নি, যার ফলে এ শ্রেণিগুলোর মানুষেরা সমাজের প্রচলিত বিষয়ের আলোচনায় কিংবা 'সমাজের সকলের জন্য ভালো' বলে যা বিবেচিত সেই আলোচনায় স্থান করে নিতে পারেনি।[৬] এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য যা দরকার তাকে ন্যান্সি ফ্রেজারের ভাষায় বলা যায়, 'সমালোচনামূলক জিজ্ঞাসা (ক্রিটিক্যাল ইন্টারগেশন) এবং বিনির্মাণ'। এই চেষ্টা আমরা দেখতে পেয়েছি গত এক দশকে। বিরাজমান সমস্যার স্বীকৃতি হিসেবে এবং সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রমণের জন্য এখন সমাজে একাধিক জনপরিমণ্ডলের উপস্থিতির কথা বলা হয়ে থাকে।[৭] এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, যেকোনো সময় এবং যেকোনো সংস্কৃতিতে জনপরিমণ্ডলব্যবস্থাকে বোঝার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি এবং ক্ষমতার মধ্যকার সম্পর্কটি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা জনপরিমণ্ডলে সমাজের সবার জন্য কোনটি ভালো (ইংরেজিতে যাকে বলে কমন গুড) সে প্রশ্নে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী, প্রবণতা এবং আন্দোলনের মধ্যে শুধু আন্তবিনিময়ই ঘটে তা নয়; বরং সমাজের জন্য ভালো বলতে কী বোঝানো হবে সেই প্রশ্নে এঁদের মধ্যে মধ্যস্থতা, বিরোধিতা, সংঘাত এবং একধরনের প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করতে চাই যে এই সংঘাত ও সহযোগিতা কোনটি প্রকৃতপক্ষে ভালো সেই বিষয়ে নয়, তার চেয়ে বরং 'সকলের ভালো' বলতে কী বোঝানো হবে সেই বিষয়ে। কমন গুডের সংজ্ঞা কে দিচ্ছে, সেটিই হলো মূল বিবেচ্য বিষয়। আইসেনস্ট্যাড বিষয়টিকে বলেছেন 'ফ্রেমিং' (সাজানো) বা 'শ্রেণীকরণ'।[৮] এ ক্ষেত্রে আমরা মিশেল ফুকোর ধারণার সাহায্য নিলে বলতে পারি যে, যেকোনো ধরনের আলাপ-আলোচনায় একটা প্রচলিত রীতি উপস্থিত থাকে, আর ওই রীতি আসলে বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কেরই প্রকাশ।[৯] ফলে 'সকলের জন্য ভালো' বিষয়ে যখন ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘাত হয় তখন এই সংঘাতের প্রকৃতি পূর্বনির্ধারিত থাকে

না, বরং তা নির্ধারিত হয় অনেক বিষয় দিয়ে যার মধ্যে রয়েছে স্থান, কাল এবং সামাজিক মূল্যবোধগুলো।

আমার মতে, জনপরিমণ্ডল কোনো রাজনীতিশূন্য আলোচনার জায়গা নয়, একে রাজনৈতিক সক্রিয়তার বাইরেও রাখা সম্ভব নয়। বরং জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা হচ্ছে বাস্তব জীবনের রাজনৈতিক সক্রিয়তা পুনরুৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য ক্ষেত্র। এটি এমন একটি স্থান যেখানে বিস্তৃত পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ বহনকারী মানুষ তাদের নিজ নিজ মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় এবং একই সঙ্গে বিরোধী মতের সমালোচনা এবং নিজ মতবাদের সপক্ষে তাদের নিজস্ব যুক্তি তুলে ধরে।[১০]

আর তাই জনপরিমণ্ডল এবং রাজনীতির মধ্যে কেবল যে একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তা-ই নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই এ দুটি বিষয়কে পৃথক করা অসম্ভব। যেহেতু জনপরিমণ্ডল কার্যত ভিন্নভাবে (প্রত্যক্ষ মুখোমুখি নয় এই অর্থে) মতবিনিময়ের প্রকৃতি নির্ধারণ করে, গ্রহণ ও বর্জনের মানদণ্ড নির্ধারণ করে এবং 'অন্য'কে (বা আদার) স্বীকৃতি প্রদান করে সেহেতু একে ব্যাপক অর্থে রাজনীতিরই একটি অঙ্গ হিসেবে বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।[১১]

জনপরিমণ্ডলসম্পর্কিত এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি 'বিরোধী পরিমণ্ডল' (কাউন্টার পাবলিক) সম্পর্কিত বিষয়টি আমরা আলোচনা না করি। বিরোধী পরিমণ্ডলের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে জনপরিমণ্ডলব্যবস্থার বিপরীতে একটি সমান্তরাল বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র তৈরি হয়। বিপরীতমুখী মনে হলেও এ দুটি সমান্তরাল আলোচনার ধারার মাঝে একটি আন্তসম্পর্ক লক্ষ করা যায়। অন্য কথায় :

> বিরোধী জনপরিমণ্ডল হলো জনপরিমণ্ডলেরই একটি অংশ, যাকে এ ব্যবস্থার বহুমাত্রিকতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একটি সমন্বিত জনপরিমণ্ডলবিরোধী জনপরিমণ্ডলের উপস্থিতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভিন্নধর্মী ক্ষমতার সম্পর্ককে নির্দেশ করে। যেসব মানুষ জনপরিমণ্ডলব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, তাদের জন্য এ ব্যবস্থা একটি সুস্পষ্ট বিকল্প হিসেবে কাজ করে।[১২]

বিরোধী জনপরিমণ্ডলের দুই ধরনের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। এক. আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় গঠন এবং প্রচলিত জনপরিমণ্ডব্যবস্থার প্রভাব থেকে নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষার একটি জায়গা তৈরি করে নেওয়া। দুই. বৃহত্তর জনপরিমণ্ডলব্যবস্থায় সক্রিয়তার জন্য প্রশিক্ষণ এবং প্রতিরোধের একটি ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করা।[১৩]

ইসলামপন্থীদের কাছ থেকে ইসলামি জনপরিমণ্ডলের যে চিত্র আমরা পাই, তাতে যে মূলধারার বিপরীতে একটি বিপরীতমুখী ধারা সৃষ্টি ও তার প্রচলনের



চেষ্টাই কেবল নিহিত থাকে তা নয়, বরং হারসকিন্ডের মতে, একটি ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মীয় আবেগভিত্তিক একটি নৈতিক ক্ষেত্র বা স্পেস রচনা করে।[১৪] মুসলিম সমাজে জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে, সেটা বোঝার জন্য ইসলামি সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকানো দরকার। এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুব সহজেই উঠে আসে। প্রথমত, সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য সত্ত্বেও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামি জনপরিমণ্ডল (বা জনপরিমণ্ডলগুলো) ইসলামি ধ্যানধারণা ও ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।[১৫]

দ্বিতীয়ত, উলামা বা ইসলামি চিন্তাবিদ, শরিয়া বা ইসলামি আইন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ এবং শাসকগোষ্ঠীর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ ধরনের ইসলামি জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করত। তাঁদের এই পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটত যে কাঠামোর অধীনে তা হলো শরিয়া, যা হচ্ছে নৈতিক এবং ধর্মীয় চিন্তার নিয়ন্ত্রক, মুসলিম সমাজের ঐক্যের এবং সমাজের ভালো-মন্দ নির্ধারণের মানদণ্ড।[১৬]

যদিও অনেকেই এই কথা স্বীকার করতে চান না তথাপি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে ইসলামি সমাজব্যবস্থায় প্রাণবান জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা উপস্থিত ছিল, তবে এটাও দেখা যায় যে ওই জনপরিমণ্ডল ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তার সীমারেখা নির্ধারিত ছিল ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা।

বাংলাদেশে একটি নতুন জনপরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রচেষ্টা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমি মনে করি, এই নতুন বা বিকাশমান জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা কোনো পূর্বনির্ধারিত, অনিবার্য বিষয় নয়; বরং একে একটি সচেতন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখাই যুক্তিযুক্ত।

একটি নতুন জনপরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রক্রিয়া কখনোই সহজসাধ্য কোনো বিষয় ছিল না এবং বর্তমানেও তা একটি কঠিন প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ। অনেকগুলো বিষয় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সমাজের নতুন ধ্যানধারণা গ্রহণ করার প্রবণতা, নতুন সৃষ্ট ধারণা বোঝার সক্ষমতা এবং প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় সেসবের প্রতিফলন ঘটানো—এমন বিভিন্ন বিষয় এ প্রক্রিয়াকে সুগঠিত রূপদানের ক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল তৈরির কাজে সহায়তা করছে। এসব কাজ এই অর্থে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র যে সেগুলো কোনো একটি একক উৎস থেকে পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলো একটি ব্যাপক প্রচেষ্টার অংশ এই অর্থে যে তারা একই ধরনের অভীষ্ট অর্জন করতে চাইছে।

## ইসলামপন্থী উপন্যাস (ফিকশন) : ধর্মানুভূতি এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম

হেবারমাসের মতে, দুই ধরনের জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা রয়েছে। একটি সাহিত্যিক এবং অপরটি রাজনৈতিক। তিনি মনে করেন, পত্রলিখনের মধ্য দিয়ে যা সাহিত্যিক ধারার সূচনা হয়, তা কালপরিক্রমায় উপন্যাসের সূচনা করে এবং এর মাধ্যমে সাহিত্যিক জনপরিমণ্ডল ধারণারও সূচনা হয়। তাঁর মতে, ব্যক্তিমানসের সঙ্গে সাহিত্যের যে সম্পর্ক, তা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করে। মূলত আঠারো শতকের ইউরোপীয় উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্কের উত্থান, যাকে পরবর্তীকালে 'মানব অস্তিত্ব বিকাশের নিরাপদ আশ্রয়স্থল'[১৭] হিসেবে অভিহিত করা হতো। তার মানে হলো উপন্যাসের মতো আপাতনির্দোষ সাহিত্যিক ধারা জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে এবং রেখে চলেছে।

বুর্জোয়া জনপরিমণ্ডলব্যবস্থার বিকাশে উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বর্তমানেও নতুন জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা বিকাশের ক্ষেত্রে কিংবা প্রতিষ্ঠিত জনপরিমণ্ডলব্যবস্থার বিপরীতে ভিন্ন কোনো জনপরিমণ্ডল সৃষ্টির সক্ষমতা উপন্যাসের রয়েছে। আর তাই বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে জনপরিমণ্ডলব্যবস্থা সৃষ্টি বা পুনর্গঠনের পেছনে উপন্যাসের ভূমিকা নানাভাবে আলোচনায় আসে। এ বিষয়ে সিংহলা ভাষায় রচিত উপন্যাস বিষয়ে ভিমল দেশানায়েকের এবং আফ্রিকান উপন্যাস বিষয়ে এম এস সি ওকোলোর গবেষণা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।[১৮]

'সেক্যুলার' ধারণা দ্বারা প্রভাবিত বিদ্যমান জনপরিমণ্ডলব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে ইসলামপন্থীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পণ্য তৈরি করা হচ্ছে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উপন্যাস বা ফিকশন, বিশেষ করে রোমান্স এবং থ্রিলার।[১৯] গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফিকশন প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলোকে আমরা ইসলামি ফিকশন বলে চিহ্নিত করতে পারি।[২০] এ ধরনের লেখকের সংখ্যা খুব কম এবং প্রচলিত সেক্যুলার ঘরানার তুলনায় এগুলোর পাঠকসংখ্যা এখনো কম, তবে এ ধরনের উপন্যাসের পাঠক ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২১] এ ধরনের উপন্যাসের পাঠক কারা, সে সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য বা উপাত্ত পাওয়া দুর্লভ। তবে মায়মুনা হকের মতে, 'সমাজের উচ্চবিত্ত অংশ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী অংশ এবং ক্ষুদ্র বা বড় ব্যবসায়ীদের অনেকেই এ ধরনের ইসলামি ফিকশনের পাঠক।'[২২]

এ ধরনের ইসলামি ফিকশন রচনার মূল কারণ হলো সেক্যুলার লেখকদের, যাঁদের ইসলামপন্থীরা মনে করেন অধঃপতিত, লেখার প্রভাবকে স্তিমিত করা। হক সঠিকভাবেই বলেছেন, 'আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে শোভিত রোমান্স উপন্যাস ছিল সেক্যুলার সাহিত্যের এক শক্তিশালী ভিত্তি, যাকে এই এক দশক আগেও



ইসলামপন্থীরা গ্রহণযোগ্য বিশেষত ইসলামীকরণের জন্য যথাযথ বলে কল্পনাও করতে পারত না।'[২৩] কিন্তু এখন এই মত ধীরে ধীরে, কিন্তু অবিচলিতভাবেই, পরিবর্তিত হচ্ছে এবং 'কিছু ইসলামি প্রকাশক মনে করেন যে অদূর ভবিষ্যতে উপন্যাস ইসলামি সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারা হয়ে উঠবে।'[২৪] এই ধারায় প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা দীর্ঘ হওয়া এই আশাবাদকে সমর্থন করে।

বাংলাদেশে ইসলামি সাহিত্যের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই।[২৫] সেটি অন্যত্রও আমরা লক্ষ করে থাকি। বাংলাদেশের বাইরের একটি পুস্তক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, যেটি মূলত ইংরেজি ভাষার ইসলামি ফিকশন বিক্রয় করে থাকে, যার নাম হচ্ছে 'ইসলামিক ফিকশন বুকস', তাদের মতে :

> সৃজনশীল, কল্পনানির্ভর ফিকশন বই যা মুসলমান সাহিত্যিক দ্বারা রচিত এবং মুসলমান পাঠকদের মধ্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে বিপণন করা হয়, তাই ইসলামি ফিকশন। এসব ফিকশনের কাহিনি খানিকটা ধর্মীয় উপাদান বা ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে রচিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে এসব বইয়ে ফিকশনবহির্ভূত ঐতিহাসিক বা সত্য ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বা ধর্মীয় বিষয়বস্তু উপস্থিত থাকে। এগুলো কখনো কোরআন ও হাদিস থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করে এবং কিছু ক্ষেত্রে তা ব্যতিরেকেই ঘটনা বর্ণিত হয়। এসব কাহিনিতে আধুনিক বাস্তব জীবন, নৈতিকতার সংকটও তুলে ধরা হয়।[২৬]

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে এই ধরনের উপন্যাসের শুভানুধ্যায়ীরা 'সেক্যুলার উপন্যাসের' সঙ্গে সুস্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়। পূর্বোক্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে এর ব্যাখ্যা মেলে এভাবে—

> মুসলিম লেখকদের যেসব ফিকশন ইসলামি ফিকশনের মানদণ্ড বজায় রাখতে অক্ষম সেগুলোই সেক্যুলার ফিকশন। এসব সেক্যুলার ফিকশনে মুসলিম চরিত্র থাকলেও কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু ইসলাম নয় এবং চরিত্রগুলোর কর্মকাণ্ড ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সেক্যুলার ফিকশনে ইসলাম ধর্মের বিষয় নেই এবং এগুলো লেখা হয় সেক্যুলার বাজারের ভোক্তাদের কাছে আবেদন তৈরির জন্য।

বাংলাদেশের ইসলামি সাহিত্যের প্রকাশ ও রচয়িতাদের মধ্যেও এ ধরনের মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়।

নব্বইয়ের দশকে যখন ইসলামপন্থীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক জগতে লক্ষণীয় হয়ে উঠল তখনই ইসলামি ফিকশনের এই ঘরানার সূচনা হয়। এটি তাঁদের পূর্বসূরিদের থেকে ভিন্ন এক প্রচেষ্টা, তাঁদের পূর্বসূরিরা চেষ্টা করেছেন প্রচারণামূলক সাহিত্য এবং জীবনযাপনের পদ্ধতিবিষয়ক বইপত্রের মধ্য দিয়ে তাঁদের বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে। কিন্তু তরুণ ইসলামপন্থীরা চান, তাঁদের সমসাময়িকদের কাছে পৌঁছাতে, তাঁরা চান তাঁদের কল্পনার কাছে আবেদন করতে। ফিকশনের যে একটি আবেগপূর্ণ গুরুত্ব রয়েছে, সেটা সবাই স্বীকার

করেন :

> ফিকশন এমনভাবে মানব হৃদয় এবং আবেগকে স্পর্শ করে যা নন-ফিকশন, এমনকি সত্য জীবন কাহিনিও করতে পারে না। এটি আমাদের আবেগাপ্লুত করে, আমাদের কল্পনাকে ধারণ করতে পারে, এবং আমাদের নিজের সম্পর্কে ও আমাদের বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাগুলোকে সত্যায়ন করে। এটি আমাদের জীবনের অনেক বিষয়কে মোকাবিলা করার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু তার জন্য আমাদের কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় না। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অন্য সংস্কৃতিকে দেখার একটি সুযোগ এর মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। ফিকশন কখনো কাঁদায়, কখনো হাসায়, কখনো আমাদের ভেতরে তৈরি করে কম্পনের অনুভূতি, কখনো আমাদের আনন্দে ভাসিয়ে দেয়। মোট কথা, আবেগের দ্বার খুলে দিয়ে আমাদের উত্তেজনা ও চাপ থেকে মুক্তি দেয়। এ জন্যই গল্প বলার বিষয়টি প্রতিটি সংস্কৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ।[২৭]

জনপরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ইসলামপন্থীদের রোমান্স ও থ্রিলারকে বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। এর লক্ষ্য হচ্ছে পাঠকদের উৎসাহী করা, যেন তাঁরা ইসলামি চেতনার আয়নায় নিজেদের এবং অন্যদের জীবনকে কল্পনা করতে পারেন।[২৮] অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে একটিমাত্র টেক্সট বা একটি ঘরানাই জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে; কেননা :

> একটি লেখা [বা একটি টেক্সট] কখনো জনপরিমণ্ডল সৃষ্টি করে না। এমনকি একটি কণ্ঠস্বর, একটি ঘরানা কিংবা একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমকে দিয়েও এ উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। সবগুলো মিলেও একটি কার্যকারণ সূত্র তৈরি করতে পারে না, যাকে আমরা জনপরিসর বলে বর্ণনা করতে পারি; কেননা জনপরিসর বললে বুঝতে হবে বিভিন্ন মতের মধ্যে নিরন্তরভাবে বিনিময়ের একটি জায়গাকে। আর তাই একটি লেখা বিচ্ছিন্নভাবে জনপরিসর সৃষ্টিতে অল্পই ভূমিকা রাখে। বরং একই ধরনের লেখা সমন্বিতভাবে জনপরিমণ্ডল গঠনপ্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।[২৯]

আমাদের আলোচনার জন্য তাই এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে বিভিন্ন ধরনের ফিকশন যেমন উপন্যাস, থ্রিলার এবং ইতিমধ্যে জনপ্রিয় জীবনযাপনবিষয়ক পুস্তক মিলে সমন্বিতভাবে একটি টেক্সট তৈরি হচ্ছে। ইসলামি সাহিত্য কেবল যে এ ঘরানার লেখকদের সৃষ্টিশীলতার বহিঃপ্রকাশ তা নয়, বরং এসব লেখার উদ্দেশ্য ইসলামপন্থী রাজনীতির বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়াও। ইসলামি ফিকশন সম্পর্কে পামেলা টেলরের বক্তব্যে বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় :

> ফিকশন 'দাওয়া'র [ইসলামের পথে আসার আমন্ত্রণ] জন্য একটি শক্তিশালী উপকরণ হতে পারে। যদিও গল্পগুলো সত্য নয়, তবু ফিকশনের বিষয় প্রকৃত ঘটনা, প্রকৃত আবেগ আর পাঠকেরা এসব চরিত্রের সঙ্গে এমনভাবে নিজেদের সংশ্লিষ্ট ভাবে যেন এই চরিত্রগুলো তাঁদের নিজেদের পরিবার কিংবা বন্ধুবান্ধব। এভাবে ব্যক্তির অনুভূতি, চিন্তা ও বিশ্বাসের ওপরে ফিকশন নন-ফিকশনের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। এগুলো তাঁদের নিজেদের মূল্যবোধ এবং অভ্যাসের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে উদ্দীপিত করতে পারে, যা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ সুগম করে।...তাই জীবনকে বদলে দেওয়ার সক্ষমতা ফিকশনের রয়েছে।[৩০]

আপাতদৃষ্টিতে ইসলামি ঘরানার উপন্যাসগুলোর কাহিনি সেক্যুলার ফিকশন থেকে ভিন্ন কিছু মনে হবে না। প্রেম, বিরহ, আশা, নিরাশা—এই ধারণাগুলোই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। উদাহরণ হিসেবে আমরা কাসেম আবু বকর, আবদুস সালাম মিতুল ও মোশাররফ হোসেনের ফিকশনগুলো উল্লেখ করতে পারি। আবু বকর ও সালাম মিতুলের দুটি জনপ্রিয় উপন্যাস হচ্ছে *প্রতীক্ষা* (১৯৯৪) এবং *গোলাপের কাঁটা* (১৯৯২)। এ দুটো উপন্যাসেই তরুণদের সামাজিক জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু সেগুলোতে প্রত্যক্ষভাবেই লেখকদের বিবেচনায় যা অনৈতিক মেলামেশা তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে এসব উপন্যাসে রয়েছে ইসলামি নৈতিকতার শিক্ষা। অনৈতিক কার্যকলাপের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরে এসব উপন্যাস : বিপরীতক্রমে, ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নৈতিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস এসব উপন্যাসের মধ্যে সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। চরিত্রগুলো কোনো রাজনৈতিক কর্মী নয়, আর তাই কোনো আদর্শিক ঝান্ডা তুলে ধরা তাদের কাজ নয়, তার পরও তাদের জীবনপদ্ধতি ইসলামি জীবনযাপনের ইতিবাচক দিকগুলোর পরিচায়ক।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এ ধরনের ফিকশনে অমার্জিত ভাষা, দৃশ্যমান যৌন সম্পর্ক কিংবা অনৈসলামিক বলে বিবেচিত আচরণসমূহ এবং ইসলামের নেতিবাচক উপস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। মায়মুনা হক যেমনটি উল্লেখ করেছেন, এসব লেখকের মধ্যে মোশাররফ হোসেন সাগরের উপন্যাসে রাজনৈতিক ইসলামের উপস্থিতি স্পষ্ট। যেমন *অবুঝ হৃদয়*।[৩১] উপন্যাসটিতে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে উপন্যাসের নায়ক একজন সাধারণ মানুষ থেকে সক্রিয় ইসলামি রাজনৈতিক কর্মীতে পরিণত হয় এবং 'ইসলামি মুক্তি সংঘ' নামক সংগঠনের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিজের অবস্থানকে সংহত করে।[৩২]

ইসলামি রোমান্টিক উপন্যাসগুলো এখনো জনপ্রিয়তা অর্জনের পথে রয়েছে কিন্তু ইসলামি থ্রিলারগুলো ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তার বিচারে অনেকটাই এগিয়ে আছে।[৩৩] ইসলামি থ্রিলারের অন্যতম জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে আছেন আবুল আসাদ, আসাদ বিন হাফিজ, তৌহিদুল ইসলাম বাবু এবং হাশেম রনি। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত এসব থ্রিলারের চারটি সিরিজ ইতিমধ্যে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। এসব সিরিজ হলো সাইমুম, ক্রুসেড, অপারেশন এবং স্পাই। এর মধ্যে সাইমুম সবচেয়ে পুরোনো সিরিজ। আবুল আসাদ রচিত এবং বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত সাইমুম সিরিজের ইতিমধ্যেই (২০০৭ সাল পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী) ৪৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

লেখক আবুল আসাদ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য এবং জামায়াতের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত দৈনিক *সংগ্রাম*-এর সম্পাদক। সেই সঙ্গে তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদেরও সভাপতি। একটি ইসলামি ওয়েবসাইটের তথ্যমতে,

> আবুল আসাদ সাইমুম সিরিজের থ্রিলারের জন্য অনেক বেশি পরিচিত এবং প্রশংসিত। এ সিরিজের বইগুলো বাংলাদেশের সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। লেখক বইগুলোর মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য, আকাঙ্ক্ষা ও মতাদর্শকে এক সুতোয় বাঁধতে পেরেছেন। এর কাহিনিগুলো পাঠককে ইসলামের সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করে।[৩৪]

এ সিরিজের কেন্দ্রীয় চরিত্র আহমেদ মুসা। মধ্য এশিয়ার মুসলিম পরিবার থেকে উঠে আসা এক বীর সেনানী। মুসা একপর্যায়ে কমিউনিস্টদের দ্বারা বিতাড়িত ও নির্যাতিত হন। পরবর্তীকালে তিনি ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 'সাইমুম' নামের একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি বিপ্লবী সংগঠনের একজন নেতা। নিপীড়িত মুসলমানদের রক্ষায় তিনি পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরে তাদের হয়ে লড়াই করেন। যেমন এ সিরিজের *অপারেশন তেল আবিব-১* এবং *অপারেশন তেল আবিব-২*-এ তাঁকে ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মুসলমানদের পক্ষ হয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে দেখা যায়। সিরিজের ৪৩তম বইয়ে তাঁকে দক্ষিণ থাইল্যান্ডের সুলতানগড় নামক এলাকায় যুদ্ধ করতে দেখা যায়। সেখানে তিনি মুসলমানদের প্রতিনিধি শাহ পরিবারের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেন। *পাত্তানির সবুজ অরণ্য* শিরোনামের এ বইয়ে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে রাজকীয় এ পরিবারের সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। জনপ্রিয় মুসলিম রাজকীয় এ পরিবারকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে নানাভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতন করছে ক্ষমতাসীন অমুসলিম শাসকগোষ্ঠী। তাঁর যোদ্ধারা মুসলিম সন্ত্রাসী হিসেবে অমুসলিমদের কাছে পরিচিত। মুসা আবিষ্কার করেন, মুসলিম ছদ্মবেশে যারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেই যোদ্ধারা যে সমরাস্ত্র ব্যবহার করে থাকে সেগুলো হিব্রু ভাষায় নামাঙ্কিত।[৩৫]

জনপ্রিয়তার বিচারে সাইমুমের পরেই আসে ক্রুসেড সিরিজের নাম। আসাদ বিন হাফিজ রচিত 'ক্রুসেড' শিরোনামে এ সিরিজের ৩০টি বই ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রকাশনা সংস্থা 'প্রীতি', জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এর সম্পৃক্তির কথা জানা যায়। এই সিরিজের কাহিনি ক্রুসেডের ইতিহাসিক চরিত্র সালাউদ্দিনের বীরত্ব, রোমান্টিক আখ্যান এবং ঘৃণার মধ্য দিয়ে ক্রুসেডের 'ইতিহাস' তুলে ধরা হয়। অপরদিকে অপারেশন সিরিজের থ্রিলারগুলোর পটভূমি 'বিশ্বব্যাপী মুসলিম শক্তির পুনর্জাগরণ' এবং 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র'। তবে এর মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে চীনের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে। লেখকের মতে, চীনের মুসলমানরা নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যার



শিকার। তাঁর ভাষায়, এ অন্যায় ও অবিচারকে রুখে দেওয়ার প্রত্যয়ে সেখানে চলছে মুসলিমদের 'মুক্তির লড়াই'। লেখক তৌহিদুল ইসলামের বর্ণনায় পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে মুসলিমদের নিপীড়নের জন্য যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলমান এই সংগ্রাম তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই সিরিজের আটটি বই প্রকাশিত হয়েছে।[৩৬]

ইসলামি থ্রিলারের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য তরুণ অনেক লেখকও এ ধরনের লেখায় এগিয়ে আসছেন। উদাহরণ হিসেবে ২০০৬ সাল থেকে প্রকাশিত স্পাই সিরিজের কথা বলা যেতে পারে। হাশেম রনি রচিত এ সিরিজের প্রথম বই *সিক্রেট জোন* লেখক আসাদ বিন হাফিজ ও আবুল আসাদকে উৎসর্গ করা হয়েছে।[৩৭] প্রারম্ভিক বক্তব্যে লেখক তাঁর লেখার পেছনে সাইমুম এবং ক্রুসেডের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, লেখক নিজেকে মাসুদ রানা সিরিজের মতো সেক্যুলার ঘরানার থ্রিলারের একজন একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩৮] তাঁর থ্রিলারগুলোতেও বিশ্বব্যাপী মুসলমান জনগোষ্ঠী, যাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন, তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের একটি চিত্র ফুটে ওঠে।

যদিও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে রচিত হয় এসব থ্রিলার, রোমান্টিক উপন্যাস কিংবা ফিকশন, কিন্তু তাতে নীতি-নৈতিকতা ও সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা বিষয়ে একটি বার্তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এসব বার্তা সবচেয়ে স্পষ্ট হয় এসব লেখার নারী চরিত্রগুলো চিত্রণে এবং তাদের ভূমিকা রূপায়ণে। যেমন সাইমুম সিরিজে জোসেফিন নামক নারী চরিত্রটি সেসব নারীর প্রতিনিধিত্ব করেন যাঁরা ঐতিহ্যের ধারক ও অভিভাবক। জোসেফিন তাঁর স্বামীকে উৎসর্গ করেছেন মহৎ দায়িত্বে, তা হলো সব ধরনের অন্যায় থেকে বিশ্বের মুসলিমদের রক্ষা করা। জোসেফিনের স্বামী আহমেদ মুসা কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। জোসেফিনের ব্যক্তিগত অবদান হলো এই যে মুসলমানদের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া মুসার স্ত্রী হিসেবে জোসেফিন বরণ করেছেন একাকিত্বের কষ্ট। অধিকাংশ ইসলামপন্থী নারীদের দেখতে চান এভাবে। পারিবারিক দায়িত্ব পালন এবং পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনাই তাঁদের কাজ, যাতে করে তাঁরা স্ত্রী ও জননী হিসেবে এক নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারেন, যাঁরা মুসলিম উম্মাহ গঠনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিতে পারবেন। জোসেফিন সে কাজটিই করেছেন, মুসার সন্তান আহমদ আবদুল্লার প্রতিপালনের সব দায়দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এই কাঠামোয় নারীদের বাইরের জগতে অংশগ্রহণ ঐতিহ্য এবং এমন ব্যাখ্যা দ্বারা সীমিত, যা নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার ধারণা পরিপন্থী। এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একজন আদর্শ নারী নাগরিক তৈরি যার দায়িত্ব হচ্ছে

ইসলামি সংস্কৃতির 'শুদ্ধতা' নিশ্চিত করা।[৩৯] অর্থাৎ পরোক্ষভাবে নারীর অবস্থান সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে ফুটে উঠেছে।

## 'হালাকা' : একটি বিরোধী জনপরিমণ্ডল? (কাউন্টার পাবলিক স্ফেয়ার)

সাম্প্রতিক কালে নারীবিষয়ক গবেষণায় গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে দুটি দিকে। এক দিকে রয়েছে নারী অধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, নারীর ক্ষমতায়নের মতো বিষয়; অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগুরু ও মুসলিম সংখ্যালঘু উভয় সমাজেই মুসলিম নারীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ধর্মপরায়ণতাবোধের বিষয়। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ, বিশেষত সমতার সেক্যুলারপন্থী লিবারেল ব্যাখ্যা এবং নারীর ক্ষমতায়নের কথিত পথরেখা, অসম্পূর্ণ এবং এগুলো দাবি করে নিবিড় পর্যালোচনা। সমালোচকেরা বলছেন যে আধুনিকতা (মডার্নিটি) এবং ধর্মের মধ্যে কঠোর দ্বিমূল (বাইনারি) বিভাজন এবং তার ভিত্তিতে ইসলাম ও নারীর সম্পর্ককে পশ্চাৎমুখী ও সেকেলে বলে ব্যাখ্যা নারীদের আত্মনিষ্ঠা (সাবজেকটিভিটি), কর্তৃত্ব (এজেন্সি) এবং আধুনিকতা (মডার্নিটি) বোঝার ক্ষেত্রে মোটেই সহায়ক নয়। ধর্মপরায়ণতাকে ধর্মীয় কুসংস্কার বা পশ্চাৎপদতার সঙ্গে এক করে দেখার যে প্রবণতা সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্ট, তা শুধু তীব্র সমালোচনার মুখেই পড়েছে তা নয়, বরং তার বিপরীতে 'ইসলামি নারীবাদ'[৪০] এবং 'ইসলামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি' হিসেবে দুটি নারীবাদী চিন্তাধারাও গত এক দশকে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত এবং তাদের যুক্তিগুলোকেই হাজির করে, যদিও এগুলোর প্রচারক হচ্ছেন নারীরাই। অন্যদিকে প্রথমোক্তটি উপস্থাপন করে নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামি টেক্সটের সমালোচনা এবং পুনর্ব্যাখ্যা। উল্লিখিত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও নারীর ক্ষমতায়ন এবং আত্মনিষ্ঠা বিষয়ে আলোচনার আরেকটি ধারা গড়ে উঠেছে, যাকে আমি বলতে চাই 'ধর্মানুরাগী' (ইংরেজিতে যাকে বলা হয় পাইয়েটি) ধারা।[৪১] মিসরের নারীদের মসজিদভিত্তিক কার্যক্রমের ওপর সাবা মাহমুদের 'ধর্মানুরাগের রাজনীতি : ইসলামি পুনর্জাগরণ ও নারীবাদী বিষয়' (পলিটিকস অব পাইয়েটি : দি ইসলামিক রিভাইভেল অ্যান্ড দ্য ফেমিনিস্ট সাবজেক্ট)[৪২] এবং লারা দিবের বৈরুতের শিয়া নারীসমাজের ওপর গবেষণাগ্রন্থ 'মোহময় আধুনিকতা : শিয়া লেবাননে জেন্ডার এবং জনপ্রকাশ্য ধর্মানুরাগ' (অ্যান এনচানটেড মডার্ন : জেন্ডার এবং পাবলিক পাইয়েটি ইন শিয়া লেবানন) প্রকাশিত হওয়ার পর সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা বোঝার চেষ্টা করছেন কেন নারীরা সক্রিয়ভাবে ধর্মানুরাগী আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন। অনেক গবেষকের মতে, আলোচনার সূচনার জায়গাটা হচ্ছে—



> কেন...মুসলিম বিশ্বে নারীদের বিরাট একটি অংশ এমন একটি ব্যবস্থাকে সমর্থন জোগাচ্ছে, যা তাদের নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী, বিশেষত বর্তমান সময়ে যেখানে তাদের সামনে বন্ধনমুক্তির বিভিন্ন রকমের বিকল্প সুযোগ রয়েছে।[৪৪]

এসব ধর্মানুরাগী আন্দোলন সাধারণত অনানুষ্ঠানিক ছোট ছোট গ্রুপ বৈঠকের আকারে সংগঠিত, প্রায়ই এদের বলা হয়ে থাকে হালাকা, তালিম বা পাঠচক্র।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মায়মুনা হক, সামিয়া হক, ইলোরা শেহাবুদ্দিন ও সারাহ হোয়াইট এ ধরনের গোষ্ঠীসমূহের কার্যক্রমের ওপর গবেষণা চালিয়েছেন।[৪৫] আমি ব্যক্তিগতভাবে ২০১০ সালে ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এ ধরনের গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি।[৪৬] তাদের সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণ এসব গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে আমার আলোচনা এবং প্রকাশিত গবেষণাসমূহের ওপরে নির্ভর করে তৈরি।

প্রাথমিকভাবে সমাজের মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত শ্রেণির কাছে পৌঁছানোর জন্য এ ধরনের গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে প্রান্তিক এবং সাক্ষরতাহীন গ্রামীণ নারীসমাজের মধ্যেও এসব গোষ্ঠীর কার্যক্রম চোখে পড়ে। বর্তমান এই প্রবণতা ২০০০ দশকের দিকে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে এবং পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে, এ ধরনের গোষ্ঠীভিত্তিক কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। একজন সাংবাদিক, যিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছেন, তিনি জানান যে এসব পাঠচক্র বর্তমান সময়ের একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।[৪৭] গ্রামীণ জনসমাজে এ ধরনের অধ্যয়নগোষ্ঠীর কার্যক্রমকে তালিম নামে অভিহিত করা হয়। তালিম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এমন দুজন নারীর কার্যক্রমের ওপরে গবেষণা করেছেন সারাহ হোয়াইট। এঁদের একজন তাবলিগ জামাতের সদস্য এবং অপরজন সাংগঠনিকভাবে নিরপেক্ষ। ইলোরা শেহাবুদ্দিন ২০০১ ও ২০০৩ সালে মাঠপর্যায়ে গবেষণা চালানোর সময় শহরের বস্তি এলাকায় মহিলাদের জন্য আয়োজিত এ ধরনের বৈঠকে যোগ দেন, যেখানে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মীরা কোরআনবিষয়ক আলোচনা করেন এবং এ রকম ধারণা দেন যে তা রাজনৈতিকভাবে দলনিরপেক্ষ ও এগুলোকে ধর্ম প্রচারকর্ম হিসেবে অভিহিত করেন।[৪৮] মায়মুনা হকের গবেষণার উত্তরদাতারা জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সদস্য। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে এসব পাঠচক্রের কিছু সংগঠিত হয় ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের, বিশেষত জামায়াতে ইসলামীর, রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে আর কিছু গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু মোটা দাগে দেখলে বলা যায় যে এসব পাঠচক্রের

সূত্রপাত হয়েছে, এবং অংশত এখনো উপস্থিতি রয়েছে, ইসলামপন্থী দল বিশেষত জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের।

তবে নারীদের জন্য আয়োজিত এসব পাঠচক্রকে দলের সদস্য বৃদ্ধির চেয়ে ধর্মানুরাগের চর্চা হিসেবেই দেখা হয়ে থাকে।

> এসব পাঠকেন্দ্রে দেখা যায় যে দলগতভাবে আলাপ-আলোচনার চেয়ে একজন গোষ্ঠীনেত্রী কোরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করছেন। অংশগ্রহণকারীদের ইসলামি জ্ঞান সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা তৃণমূল পর্যায়ের এ ধরনের পাঠচক্রের প্রধান বিষয় নয়, বরং তাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় (এবং নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর) ব্যক্তি ও পরিবারে নৈতিকতার পুনর্জাগরণ তৈরি করা। সেটা করা হয় কোরআনে বর্ণিত করণীয় বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান প্রদানের মধ্য দিয়ে এবং তার জন্য [বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে দেওবন্দী আলেম আশরাফ আলী থানভী রচিত] *বেহেশতি জেওর*-এর মতো জনপ্রিয় পরামর্শমূলক বই নয়, গুরুত্ব দেওয়া হয় মূল উৎসে, অর্থাৎ কোরআনে প্রত্যাবর্তনকে।[৪৯]

এ যাবৎ আমি যেসব গবেষণা উদ্ধৃত করেছি তাতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে এসব গোষ্ঠী হলো নারীদের মধ্যে ধর্মানুভূতির প্রকাশ। কিন্তু এসব গবেষণায় ধর্মানুভূতির কোনো সংজ্ঞা কিংবা তার বিস্তারিত অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়নি। সাবা মাহমুদের গবেষণার প্রশ্নে বিষয়টি তুলে ধরেছেন আমিনা ওয়াদুদ, যেখানে তিনি বলেছেন যে এসব গবেষণায় রাজনীতি বা ধর্মানুভূতি (যা কোরআনে বিস্তারিতভাবে তাকওয়া, এই পদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যার অর্থ ইসলামের মিস্টিক্যাল আন্দোলনের ইতিহাসে আলোচিত হয়েছে) বিষয়ে যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।[৫০]

লারা দিবের গবেষণার মধ্যেও এ ধরনের দুর্বলতা চোখে পড়ে, বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য হলো পঞ্চম অধ্যায়। সেখানে উপর্যুপরিভাবে 'ধার্মিক' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও তিনি অন্যত্র বলেছেন যে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য রয়েছে এবং 'ধার্মিক' শব্দটিতে এই বৈচিত্র্যকে ধারণ করা যায় না।[৫১] জামায়াতে ইসলামীর নারী কর্মীদের মধ্যে পরিচালিত পাঠচক্র বিষয়ে মায়মুনা হকের গবেষণায় উঠে আসে যে এ ধরনের পাঠচক্র কেবল কোরআন ও হাদিসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় না। 'প্রচলিত ইসলামি চিন্তাবিদদের, যার মধ্যে সমসাময়িক বা সাম্প্রতিক কালের চিন্তাবিদেরাও আছেন, কোরআনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং ধর্মতাত্ত্বিক বক্তব্যও' আলোচিত হয়।[৫২] সামিয়া হক এবং অন্য গবেষকেরা যেসব পাঠচক্র পর্যবেক্ষণ করেছেন সেখানেও এই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

তবে মায়মুনা হক লক্ষ করেন যে ইসলামি পাঠচক্রগুলো 'এক বিশেষ ধরনের ইসলামি আত্মনিষ্ঠা (সাবজেকটিভিটি) তৈরির' সূতিকাগার।[৫৩] তবে যে বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো :

> এ ধরনের পাঠচক্র বাংলাদেশে ইসলামি আন্দোলনের টিকে থাকা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটা তারা করে কর্মীদের আত্মবোধ, ধর্মীয় দায়িত্ব এবং অন্যদের সম্পর্কে তাদের ধ্যানধারণাকে ঢেলে সাজানোর মধ্য দিয়ে। এই ঢেলে সাজানোর কাজ সম্পাদিত হয় কথাবার্তার একটি ধরন ব্যবহার করে, যেখানে ধার্মিকতা ও ধর্মীয় পরিচয়, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, বিশ্ব মুসলিম সমাজ বা উম্মাহ এবং বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট একধরনের চিন্তা তুলে ধরা হয়।[৫৪]

সামিয়া হক ও সাবিনা ফায়েজ রশিদ ঢাকার উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পরিচালিত পাঠচক্র বিষয়ে গবেষণার উপসংহারে বলেন যে নতুন ইসলামি আত্মনিষ্ঠা নারীদের বিভিন্নভাবে ক্ষমতায়ন করে।[৫৫] তাঁরা যে গোষ্ঠীটির ওপর গবেষণা চালান, সে পাঠচক্রটি ২০০২ সালে একজন বিদেশি কূটনীতিকের স্ত্রীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০৪ সালে উদ্যোক্তা মহিলা বাংলাদেশ ত্যাগ করার পর সেটি যে শুধু কার্যক্রম জিইয়ে রেখেছে, তা-ই নয়, বরং নতুন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে এর কলেবর ও কার্যক্রমও অনেক বেশি বেগবান হয়েছে। তাঁদের গবেষণা দেখায় যে এই ধরনের পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারীদের বিরাজমান এবং পরিচিত স্পেসকে বদলে দেয়, যাতে করে তারা তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর খুঁজে পায় এবং তাঁদের কর্তৃত্ব (এজেন্সি) প্রকাশ করতে পারে, এর মধ্য দিয়ে এসব পাঠচক্র জনপরিমণ্ডলের ইসলামীকরণে এক বড় ভূমিকা পালন করে। এই পাঠচক্রগুলো দুই দিক থেকে ব্যতিক্রমী। প্রথমত, আপাতদৃষ্টে এসব পাঠচক্র দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে একধরনের টানাপোড়েন তুলে ধরে। এই দুই প্রবণতা হলো ঐতিহ্যবাহী বা প্রথাগত চিন্তাভাবনা (কোরআন এবং হাদিসের আক্ষরিক অনুবাদ অনুসরণ) এবং ইসলামি 'সংস্কারবাদ'। এসব পাঠচক্র, বিশেষ করে হক এবং রশিদ যে ধরনের গোষ্ঠীর কথা বলছেন, সেগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে প্রচলিত ধর্মসম্মত টেক্সটগুলোর বিষয়ে নারীদের ধারণা সুস্পষ্ট করা, যাতে করে প্রথাসিদ্ধ জেন্ডার ভূমিকাকে আরও বেশি শক্তিশালী করা যায়।[৫৬] দ্বিতীয়টি হলো, এসব গোষ্ঠীর লক্ষ্য হচ্ছে, 'নিজেদের জন্য স্বাধীন এবং স্ব-কর্তৃত্বাধীন বিভিন্ন রকম জায়গা তৈরি করা'। এই লক্ষ্য প্রথাসিদ্ধ ব্যাখ্যার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এ ধরনের পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারী মহিলারা নিজেদের এমন আধুনিক চিন্তাশীল নারী হিসেবে দেখে থাকে, যারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলামের আরও গুরুত্বপূর্ণ ও দৃশ্যমান ভূমিকা নিশ্চিত করতে নিজেকে, পরিবারকে এবং নিজ সমাজকে নতুন করে ঢালাই করতে সংকল্পবদ্ধ।[৫৭]

তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ক্ষমতায়ন এবং কর্তৃত্বের (এজেন্সি) প্রশ্ন সমস্যার ঊর্ধ্বে নয়। হক এবং রশিদ বলছেন, 'নতুন করে খুঁজে পাওয়া জ্ঞান, ঐশ্বরিক নির্দেশনা এবং আত্মসমীক্ষা এই নারীদের এমন সব পরিস্থিতিতে তাদের কর্তৃত্ব প্রয়োগের সুযোগ করে দেয় অতীতে যেসব পরিস্থিতিতে তারা কোনো রকম প্রতিবাদ করেনি (অথবা তারা ভেবেছে তারা প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত নয়)', কিন্তু

এই 'প্রতিবাদ এবং কর্তৃত্ব সমাজে বিদ্যমান জেন্ডার সম্পর্ককে বদলে দেয়নি।'[৫৮]

যদিও সাধারণত বলে হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ধর্মচর্চা বা ধর্মানুরাগ এ ধরনের গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার কারণ, কিন্তু ধীরে ধীরে নিজ সম্প্রদায় ও সমাজের বদল এবং দাওয়া কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া এ ধরনের গোষ্ঠীর লক্ষ্য হয়ে ওঠে। মায়মুনা হক, সামিয়া হক ও সাবিনা ফায়েজ রশিদ যেসব পাঠচক্র পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের পথরেখা দেখলেই তা স্পষ্ট হয়। পাঠচক্রে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী একজনের ভাষ্যমতে, 'আমাদের কী করতে হবে এই নিয়ে আমরা বহু বছর ধরে গবেষণা করেছি এবং শুনেছি। এখন আরও কাজ করা দরকার, আমাদের কাজ হলো অন্য সবার মাঝে একে ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা যদি অন্যদের নিজেদের দলভুক্ত না করি তবে স্রষ্টার প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করলাম না।'[৫৯] শুধু আত্মোপলব্ধি বা ব্যক্তিগত ধর্মচর্চার ধারণা থেকে এ ধরনের স্পৃহা প্রকাশ পায় না, বরং আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে এই ধরনের পাঠচক্রে যারাই অংশ নিচ্ছে তাদের পথপরিক্রমা প্রায় একই রকম। বলা প্রয়োজন যে এ ধরনের পাঠচক্র ছড়িয়ে পড়েছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলিম সংখ্যালঘু উভয় ধরনের দেশে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের গোষ্ঠীর উপস্থিতি ও কার্যক্রম দেখতে পাওয়া যায়।[৬০] ইয়েমেনের সানার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এ ধরনের পাঠচক্র রয়েছে,[৬১] পাকিস্তানে 'আল হুদা' ইসলামি স্কুল হিসেবে পরিচিত প্রতিষ্ঠান আরও সংগঠিতভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে,[৬২] মালয়েশিয়ায় এ ধরনের কার্যক্রম 'সিস্টার্স অব ইসলাম'[৬৩] এবং 'মজলিস-এ-দোয়া'[৬৪] নামে পরিচালিত হচ্ছে। থাইল্যান্ডে 'বানাতুল হুদা' যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[৬৫] ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মানুভূতি এবং নারীদের সংগঠনের প্রশ্ন ব্যাপকভাবে আলোচিত।[৬৬] শ্রীলঙ্কায়, বিশেষত কলম্বোতে, ১৯৯০ সাল থেকে 'আল মুসলিমাত' নামে নারীদের এ ধরনের গোষ্ঠীর কার্যক্রম রয়েছে। আল মুসলিমাতের লক্ষ্য 'দাওয়া কার্যক্রম পরিচালনা, যার বিশেষ লক্ষ্য নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।'[৬৭] আমি আগে যেসব সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছি তাদেরও এই ধরনের কাজ প্রধান লক্ষ্য বলে বিবেচিত। মিসরে সাবা মাহমুদ, বাংলাদেশে সামিয়া হক বা শ্রীলঙ্কায় ফারজানা হানিফার গবেষণায় যখন এটা স্পষ্ট হয় যে এসব গোষ্ঠীর লক্ষ্য এ ধরনের তখন সেগুলোকে কেবল ধর্মানুরাগের আন্দোলন বলে বিবেচনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা তাঁদের বিশ্লেষণে দাওয়ার মর্মবস্তুই উপেক্ষিত হচ্ছে।

সাবা মাহমুদের গবেষণার সমালোচনায় সামেহ সালিম যে কথাগুলো বলেন সেগুলো অন্য গবেষণাকাজগুলোর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য।



সালিম বলছেন যে সাবা মাহমুদের গবেষণায় ধারণা এবং আন্দোলন হিসেবে দাওয়া বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। কেননা দাওয়া রাজনীতি ও ক্ষমতার এক বিশেষ সম্পর্ক প্রকাশ করে, যা কেবল নিজের আত্মিক বিষয় হিসেবে নিজের শরীরের ওপরে নিয়ন্ত্রণ নয়, অন্যদের শরীরের ওপরও নিয়ন্ত্রণের কথা বলে। সালিম বলছেন, দাওয়ার মধ্যে অন্যদের কাছে আবেদনের যে বিষয় রয়েছে (সলিসিটেশন) যাকে সাবা মাহমুদ বলছেন 'প্রণোদনার শিক্ষা' (পেডাগোজি অব পারসুয়েশন) তাকে ধর্মান্তরীকরণ (কনভারশন) বলেও বোঝা যেতে পারে। এটি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ যখন এসব আন্দোলনের ব্যাপকতর লক্ষ্যের কথা যদি আমরা বিবেচনা করি। সালিম এই বলে সাবা মাহমুদের সমালোচনা করেন যে এখানে একটি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত। এসব ধর্মানুরাগী আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাসম্পর্কিত কার্যক্রমের কোনো রকম সমালোচনামূলক পাঠ নেই। তিনি বিশেষভাবে যেসব কার্যক্রমের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন তা হলো স্থানীয় মসজিদ নির্মাণ, সামাজিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠান তৈরি, ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং ছাপাখানা স্থাপন। তা ছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত কথোপকথন বা প্রচারণার মাধ্যমে মুসলিমদের প্রতি আরও বেশি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানানো। এগুলোকে সাবা মাহমুদ দেখেছেন নারীদের ধর্মানুরাগ আন্দোলনের নির্ভেজাল নৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের ইতিবাচক দিক হিসেবে। কিন্তু সালিম বলছেন এগুলোর মধ্যে যে রাজনৈতিক নির্দেশনার দিক রয়েছে সাবা মাহমুদ তা উপেক্ষা করেছেন।[৬৮] যদিও মায়মুনা হক তাঁর গবেষণায় দাবি করেন যে এগুলো সবই ধর্মানুরাগী আন্দোলন, কিন্তু তাঁর গবেষণার জন্য নির্ধারিত গোষ্ঠী ইসলামি ছাত্রী সংস্থা (জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন) অন্য রকম প্রমাণ হাজির করে।[৬৯] হক স্পষ্ট করেই বলেছেন যে তাঁর গবেষণার অধীত বিষয় ছাত্রী সংস্থা মনে করে, 'বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান নিবিড় সম্পর্ক এবং সমাজের ওপর রাষ্ট্রের ক্ষমতার কারণে নিজ নিজ ঘরে ধর্ম প্রতিষ্ঠার কাজে সাফল্যের জন্য জনপরিমণ্ডলের ইসলামীকরণ অত্যাবশ্যকীয়।'[৭০]

তর্কের খাতিরে অনেকে বলতে পারেন, কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এসব পাঠচক্র বিস্তার লাভ করেনি। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে সমাজে নারীদের ভূমিকা নিয়ে চলমান বিতর্কের প্রেক্ষাপটেই এসব পাঠচক্রের উদ্ভব ঘটেছে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও এ দেশের গ্রামীণ প্রান্তিক পর্যায়ে মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারা অনুযায়ী নারীসমাজকে উন্নয়ন কার্যক্রমের কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। ইসলামপন্থীরা প্রথমে এসব প্রকল্পের বিরোধিতা করে এবং সহিংসভাবে এসব

এনজিওর মোকাবিলা করে। পরবর্তী পর্যায়ে তারা তাদের কৌশলের পরিবর্তন আনে, নিজেরাই এনজিও প্রতিষ্ঠা করে এবং সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে।[৭১] এসব প্রতিষ্ঠান তারপর সমাজে জেন্ডার এবং জনসমক্ষে নারীদের ভূমিকাকে ভিন্নভাবে নির্ধারণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়।

পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতা সত্ত্বেও কোরআন ও হাদিস ছাড়াও সমাজে নারীর ভূমিকা নিয়ে লেখা মাওলানা মওদুদীর বিভিন্ন বই এসব পাঠচক্রের অন্যতম পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মওদুদীর মতে, 'নারীরা ইসলামি সংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ' আর তাই যেকোনো মূল্যে একে রক্ষা করতে হবে। কোরআন এবং হাদিসের যে ব্যাখ্যা মওদুদী প্রদান করেন তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে নারী ও পুরুষের এক নির্ধারিত পদসোপান এবং নারীর পৃথক্করণ। তাঁর মতে, আদর্শ নারীর প্রতিমূর্তি হচ্ছে অন্তঃপূরবাসিনী নারী এবং মাতৃত্ব যার চূড়ান্ত লক্ষ্য।[৭২]

এসব পাঠচক্রে যেহেতু কেবল নারীর ভূমিকা আলোচিত হচ্ছে তা নয়, আলোচিত হচ্ছে অন্যান্য সামাজিক রীতিনীতি ও অনুশীলনের বিষয়ও, সেহেতু এসব আলোচনা ইসলাম বিষয়ে আলাপ-আলোচনা এবং প্রকাশ্য বিতর্কের পথও উন্মুক্ত করছে। এসব বিতর্ক কেবল 'সেক্যুলার' চিন্তা ও প্রবণতার ধারা দিয়েই প্রভাবিত হচ্ছে তা নয়, বরং এসব বিতর্কে উপস্থিত থাকছে কোরআন ও হাদিসের পাঠনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিও। কিন্তু আমাদের এটা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে কেবল এসব টেক্সট পুনর্পাঠ বা চিরায়ত টেক্সটের আলোচনা নারীদের মধ্যে ভিন্ন ধরনের আত্মনিষ্ঠা তৈরির জন্য যথেষ্ট নয়। এগুলো নিজে নিজেই সমাজে জেন্ডারের সমতা বা নারীর ভূমিকা বিষয়ে নতুন ধারণা তৈরি করে না। এসব পাঠ বড়জোর সংস্কার (রিফরমেশন) কিন্তু টেক্সটের পুনর্গঠন (রিকন্সট্রাকশন) নয়।

আমার উপরিউক্ত বক্তব্য খানিকটা ব্যাখ্যা দাবি করে। আমি এ ক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিষ্টান নারীবাদী চিন্তার ধারা এবং তাদের ইতিহাসকে বিবেচনায় রাখছি এবং সেই কাঠামোর আলোকেই এ বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। খ্রিষ্টান ও ইহুদি নারীবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি হলো: ধর্মীয় পবিত্র পাঠের কাছে প্রত্যাবর্তনের মূল উদ্দেশ্য কী? এর উত্তর হলো হয় সংস্কার, নতুবা পুনর্গঠন। সংস্কারের মূল বক্তব্য হলো, যে কেউ যখন ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করবেন তিনি শুরু করবেন এই বিবেচনা থেকে এসব টেক্সট ইতিহাসের প্রেক্ষাপট দিয়ে সীমিত, এর কিছু কিছু অংশ আছে যেগুলো সর্বজনীন বা অনিবার্য, আর অন্য কিছু অংশ আছে আপেক্ষিক। পুনর্গঠন ধারা এই অবস্থান থেকে সরে গিয়ে তার অবস্থান তৈরি করে; তাঁরা বিবেচনা করে যে 'এসব পবিত্র টেক্সট মানুষকেন্দ্রিক (এন্ড্রোসেন্টিক) এবং সেগুলো মানুষের



প্রয়োজনে মানুষের তৈরি।' এন সোফি রোয়ান্ডের ভাষায়, 'সংস্কারের পরোক্ষ বিষয় হলো বিদ্যমান চিন্তাগুলোকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা, অন্যদিকে পুনর্গঠনের পরোক্ষ বিষয় হলো ওই চিন্তাগুলোকে পুরোপুরি খণ্ডন করা'[৭৩] শেষোক্ত ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ধর্মীয় জ্ঞান তৈরি এবং তার প্রচারের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলোকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্বিবেচনা করা। সুনির্দিষ্টভাবে বললে এই দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানের উৎস বিষয়ে প্রশ্ন তোলে।

কোরআন পাঠচক্র বিষয়ে এ যাবৎকালের গবেষণাগুলোতে এটাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে এগুলো নারীদের ইসলামসম্পর্কিত টেক্সট পুনর্বিবেচনার (বা পুনরায় সংজ্ঞায়নের) সুযোগ তৈরি করে, কিন্তু তাঁদের এ দাবি বিষয়ে সমর্থন মেলে না যখন আরও ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে এসব পাঠচক্রে মওদুদীর মতো পুরুষ লেখকদের রচিত তফসির (কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা) পাঠ্যতালিকায় প্রাধান্য পাচ্ছে। রাজনৈতিক ইসলামের পুরুষতান্ত্রিক দীক্ষাগুরুদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার ফলে এসব আলোচনা ও পাঠচক্রের শৃঙ্খলমুক্তির সম্ভাবনা দূরপরাহতই থেকে যাচ্ছে।

## উপসংহার

জনপরিমণ্ডল সেক্যুলার, সমপ্রাকৃতিক এবং উদার গণতান্ত্রিক একটি স্থান বলে যে ধারণা বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিল ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল তৈরি সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। বাংলাদেশের জনপরিমণ্ডলব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি থাকলেও ধর্মীয় ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত কণ্ঠস্বর সেখানে অনুপস্থিত ছিল। ফলে এই নতুন ও বিকাশমান কণ্ঠস্বর জনপরিমণ্ডলে বহুত্ববাদিতাকে যুক্ত করছে। কিন্তু প্রশ্ন থাকছে যে এই জনপরিমণ্ডল বৃহত্তর জনপরিমণ্ডলব্যবস্থাকে বিচূর্ণ/বিভক্ত করে ফেলবে কি না[৭৪] এবং প্রথাসিদ্ধ ধর্মীয় যে কর্তৃত্ব ও কাঠামো আছে তাকে চ্যালেঞ্জ করার গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা এর মধ্যে আছে কি না।

গত এক দশকে মার্কিন গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এ বিষয়ে জোরদার বক্তব্য ছিল এই যে একটি উদীয়মান মুসলিম জনপরিমণ্ডল আরও ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণের পথ তৈরি করছে এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। মধ্যপ্রাচ্যে বিকাশমান জনপরিমণ্ডলের অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক গবেষক এই যুক্তি উপস্থাপন করেন যে এই জনপরিমণ্ডল জাতিরাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত মুসলিম অথরিটির সঙ্গে সমালোচনামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম। সহজ করে বললে এই জনপরিমণ্ডল প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। ডেল আইকেলম্যান ১৯৯৯ সালে বলেন, কোনো ধরনের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ইসলাম যে সামাজিক আলোচনার ও বিতর্কের বিষয়

হতে পারে সেই ধারণা শক্তিশালী হচ্ছে। ইসলামের প্রতীকী [ও পরিচিত] ভাষার ব্যবহার নিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে এই নতুন জনপরিসর (পাবলিক স্পেস) আকার লাভ করছে। তদুপরি, আইকেলম্যান বলেন যে, নতুন [সামাজিক] মাধ্যমে এবং নতুন অংশগ্রহণকারীদের কারণে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে চলমান বিতর্ক এই ধারণা দিচ্ছে যে ভিন্ন ভিন্নভাবে ইসলামকে বোঝা যায় এবং ইসলামি মূল্যবোধ তৈরি করা যায়। এতে করে জনপরিসর সম্পর্কে এই ধারণা জোরদার হচ্ছে, জনপরিসর আলোচনার জায়গা এবং তা অংশগ্রহণমূলক আর জনপরিসর রাষ্ট্রস্বীকৃত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান নয়।[৭৫]

এ ধরনের আশাবাদী মনোভাব অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কিছুদিন পরই বিশ্লেষকেরা এই দিকে অঙ্গুলি সংকেত করতে থাকেন যে নতুন ব্যবস্থা তাত্ত্বিকভাবে যতটা প্রতিনিধিত্বশীল হবে বলে আশা করা হয়েছিল বাস্তবে ততটা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পুরোনো কর্তৃত্বের বদলে নতুন কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে, আর সেগুলো আগের চেয়ে মোটেই কম নিয়ন্ত্রণমূলক নয়। এই নতুন বাস্তবতা মোটেই বিস্ময়কর বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়, কেননা এই আশঙ্কার কথা এমনকি যারা বিরোধী জনপরিসরের উত্থানের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন তাঁরাও নাকচ করে দেননি। ন্যান্সি ফ্রেজার বিরোধী জনপরিসর উত্থানের প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্টভাবে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে এগুলো সব সময়ই যে সুনীতিসম্পন্ন হবে তা তিনি মনে করেন না। তিনি বলেছিলেন, 'হা ঈশ্বর! এসবের কিছু কিছু সুস্পষ্টভাবে অগণতান্ত্রিক এবং সমতার ধারণার বিরোধী। এমনকি যেগুলোর গণতান্ত্রিক এবং সমতার উদ্দেশ্যও রয়েছে সেগুলো অন্যদের বাইরে রাখার ও প্রান্তিকীকরণের নিজস্ব ধরনের পদ্ধতি অনুশীলন করে থাকে।'[৭৬]

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ইসলামি জনপরিমণ্ডলব্যবস্থায় যেখানে ইসলামের একটি ব্যাখ্যাই গৃহীত হচ্ছে, সেখানে প্রথাগত মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা মাওলানা মওদুদীর মতো বিভিন্ন ইসলামপন্থী চিন্তাবিদের মতবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। আমার মতে, এটি সার্বিক ইসলামীকরণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যে ইসলামীকরণের ধারণা তৈরি হয়েছে তাদের হাতে যারা বিদ্যমান সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ বদলে দেওয়ার রাজনৈতিক কর্মসূচি দ্বারা পরিচালিত। ইসলামীকরণ বলতে কেবল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বোঝায় না, বরং সংস্কৃতি, ধর্ম এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় এ প্রক্রিয়ার অংশ। ইসলামপন্থীদের বিবেচনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের প্রশ্ন আসে সমাজের ইসলামীকরণের পরে।[৭৭] আপাতদৃষ্টে এখন যে ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল বিকাশমান তাতে জনপরিমণ্ডলের মৌলিক দিকসমূহ—নিয়ন্ত্রণহীন, গণতান্ত্রিক এবং সমালোচনামূলক—অনুপস্থিত।



নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। নতুন জনপরিমণ্ডল মুসলিম নারীদের ভিন্ন প্রতিকৃতি এবং পাঠচক্রগুলো সমাজে নারীদের নতুন ধরনের দৃশ্যমানতা দেয়, কিন্তু তাদের ওপরে এই নিয়ন্ত্রণও চাপিয়ে দেয় যে তাদের বলা হয় সমাজে তাদের ভূমিকা বিষয়ে ইসলামের ব্যাখ্যার একধরনের কর্তৃত্বকে (অথরিটি) মেনে নিতে। ইসলাম পন্থার এটি একটি অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা বলে মনে করেন নিলুফার গোলে :

> ইসলামপন্থী রাজনীতি (ইসলামইজম) নারীদের কর্তৃত্বের (এজেন্সি) কথা বলে এবং তাঁদের ব্যক্তিয়ানের (ইনডিভিজুয়ালাইজেশন) ওপরে জোর দেয়, কিন্তু তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইসলামপন্থী রাজনীতি নারীদের জনজীবনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে, কিন্তু সেই সুযোগ সীমিত কেবল নিজ সম্প্রদায়ের অভিন্ন কাজে অবদানের জন্য। 'ইসলামি জীবনের' রাজনীতিকীকরণের মধ্যে সম্ভাব্য আশঙ্কা থেকে গেছে যে তা নারীর ব্যক্তিগত জীবন, পেশাগত কৌশল এবং ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশের পথে বাধা হবে। ইসলামপন্থী রাজনীতি মুসলিম নারীকে আধুনিক জীবনের সুযোগ দেয়, কিন্তু আধুনিকতার (মডার্নিটি) এক অস্পৃশ্য রূপ।[৭৮]

যেকোনো জনপরিমণ্ডলের অকৃত্রিমতা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে সমাজের সঙ্গে তার সংযুক্তির ওপরে। এটি এমনকি বিরোধী জনপরিমণ্ডলের জন্যও প্রযোজ্য। এ কথা বলা বাহুল্য, একেবারে স্থানীয় না হলে কোনো জনপরিমণ্ডল বেঁচে থাকতে পারে না। বিশ্বায়ন নিঃসন্দেহে বিদ্যমান জনপরিমণ্ডলে নতুন কণ্ঠস্বর তৈরি বা যুক্ত হওয়া এবং তাদের চরিত্র-প্রকৃতির ওপরে প্রভাব ফেলবে, কিন্তু সেসব কণ্ঠস্বরের শিকড় প্রোথিত হতে হবে স্থানীয় সমাজে এবং তার বেঁচে থাকার উপাদান আসতে হবে স্থানীয় ঐতিহ্যের মধ্য থেকেই। বিকাশমান ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল এটা এখনো দেখাতে পারেনি যে এটি বাংলাদেশি সমাজের ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। ইসলাম পন্থার বৈশ্বিক প্রবণতা এসব প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা বলেই মনে হয়। এই ধরনের উদ্যোগে বাংলাদেশের স্থানীয় সমন্বয়মুখী (সিনক্রেটিস্টিক) ঐতিহ্যের উল্লেখের অনুপস্থিতির কারণে এই নতুন ধারার অকৃত্রিমতা প্রশ্নবিদ্ধ। এ যাবৎ, ঐতিহ্যিক ধারা ও সাম্প্রতিক প্রবণতার মধ্যে সৃজনশীল সংশ্লেষ ঘটানোর প্রচেষ্টার উদাহরণ খুবই সীমিত।

## টীকা ও তথ্যসূত্র

১. সাধারণভাবে বলা যায়, হেবারমাস এক জনপরিমণ্ডলের একটি নির্ধারক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জারগেন হেবারমাস, *দ্য স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফরমেশন অব দ্য পাবলিক স্ফেয়ার : এন এনকোয়ারি ইনটু এ ক্যাটাগরি অব বুর্জোয়া সোসাইটি, অনুবাদ থমাস বার্গার* (কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস; দ্য এমআইটি প্রেস, জার্মান ১৯৬২, ইংরেজি অনুবাদ ১৯৮৯)।

২. ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের ক্রমবর্ধমান শক্তি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আলী রীয়াজ, 'দ্য পলিটিকস অব ইসলামাইজেশন ইন বাংলাদেশ', *রিলিজিয়ন*

*অ্যান্ড পলিটিকস ইন সাউথ এশিয়া*, সম্পাদনা আলী রীয়াজ , (লন্ডন; রাউটলেজ, ২০১০), পৃ. ৪৫-৭০।

৩. হেবারমাস, দ্য স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফরমেশন অব দ্য পাবলিক স্ফেয়ার, হেবারমাসের বইয়ের দুটি প্রধান বিষয় রয়েছে : একটি হচ্ছে 'বুর্জোয়া জনপরিমণ্ডলের' ঐতিহাসিক উৎস এবং অপরটি হচ্ছে সমকালে জনপরিমণ্ডলের কাঠামোগত পরিবর্তনের সমালোচনামূলক বর্ণনা, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের উত্থান, সংস্কৃতি শিল্প ও জনজীবনে ক্রমশ অর্থনৈতিক করপোরেশনগুলোর ও বৃহৎ বাণিজ্যের শক্তিশালী অবস্থান।

৪. মিরিয়াম হোয়েক্সটার, 'দি ওয়াকফ অ্যান্ড দ্য পাবলিক স্ফেয়ার', *দ্য পাবলিক স্ফেয়ার ইন মুসলিম সোসাইটিস*, সম্পাদনা মিরিয়াম হোয়েক্সটার, স্যামুয়েল এন, আইসেনস্টাড ও নেহেমিয়া লেভটজিয়ন (নিউইয়র্ক; স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক প্রেস, ২০০২), পৃ. ১১৯।

৫. রজার কার্টিয়ার, *দ্য কালচারাল অরিজিনস অব দ্য ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন*, অনুবাদ এল জি কোকরেন (ডারহাম, নর্থ ক্যারোলাইনা ও লন্ডন; ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯১), পৃ. ১৭।

৬. তালাল আসাদ, *ফরমেশনস অব দ্য সেক্যুলার* (স্ট্যানফোর্ড, সানফ্রানসিসকো; স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৩, পৃ. ১৮৩, ন্যান্সি ফ্রেজার, 'রিথিংকিং দ্য পাবলিক স্ফেয়ার : এ কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অব অ্যাকচুয়ালি একজিসটিং ডেমোক্রেসি', *সোশ্যাল টেক্সট*, নং ২৫/২৬ (১৯৯০); পৃ. ৫৬-৮০।

৭. দেখুন শীলা বেনহাবিব, 'টুয়ার্ড এ ডেলিভারেটিভ মডেল অব ডেমোক্রেটিক লেজিটিমেসি', *ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ডিফারেনসেস : কনটেসটিং দ্য বাউন্ড্যারিস অব দ্য পলিটিক্যাল*, সম্পাদনা, শীলা বেনহাবিব (প্রিন্সটন, নিউজার্সি, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬), পৃ. ৬৭-৯৪; চার্লস টেইলর, *ফিলসফিক্যাল আর্গুমেন্টস* (কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস : হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫), টেইলর, 'গ্রন্থিত জনপরিমণ্ডলের' একটি নমুনা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, যেখানে বড় আকারের জনপরিমণ্ডলের মধ্যে ছোট আকারের জনপরিমণ্ডলগুলো গ্রন্থিত হয়ে জাতীয় জনপরিমণ্ডলের এজেন্ডায় অংশ নেয়। হেবারমাসও তাঁর মূল ধারণায়নে বাদ দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। (জারগেন হেবারমাস, 'দ্য পাবলিক স্ফেয়ার : এন এনসাইক্লোপেডিয়া আর্টিকেল', *ক্রিটিক্যাল থিওরি অ্যান্ড সোসাইটি*—রিডার, সম্পাদনা স্টিফেন এরিক ব্রোনার এবং ডগলাস কেলনার (নিউইয়র্ক : রাটলেজ, ১৯৮৯), পৃ. ১৩৬-১৪২; জারগেন হেবারমাস, 'ফারদার রিফ্লেকশনস অন দ্য পাবলিক স্ফেয়ার', *হেবারমাস অ্যান্ড দ্য পাবলিক স্ফেয়ার*, সম্পাদনা, ক্রেইগ ক্যালহুন (কেমব্রিজ : এমআইটি প্রেস, ১৯৯২), পৃ. ৪২১-৪৬১।

৮. স্যামুয়েল এন আইসেনস্ট্যাড, 'কনক্লুডিং রিমার্কস : পাবলিক স্ফেয়ার, সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডাইনামিকস ইন ইসলামিক সোসাইটিজ', *দ্য পাবলিক স্ফেয়ার ইন মুসলিম সোসাইটিজ*, পৃ. ১৪০।

৯. মিশেল ফুকো, 'টু লেকচারস' *পাওয়ার/নলেজ : সিলেকটেড ইন্টারভিউস অ্যান্ড আদার রাইটিংস, ১৯৭২-১৯৭৭*, সম্পাদনা সি. গর্ডন (নিউইয়র্ক : প্যানথিয়ন, ১৯৮০), পৃ. ৭৮-১০৮।

১০. মুহাম্মদ আই আইয়স, *দ্য নিউ আরব পাবলিক স্ফেয়ার* (বার্লিন, ফ্রাঙ্ক অ্যান্ড টিম, ২০০৮), পৃ. ২৫।

১১. আইসেনস্ট্যাড, 'কনক্লুডিং রিমার্কস', পৃ. ১৪০।

১২. রবার্ট এসেন, 'সিকিং দ্য 'কাউন্টার' ইন কাউন্টারপাবলিকস', *কমিউনিকেশন থিওরিস* ১০, নং ৪ (নভেম্বর ২০০০), পৃ. ৪২৫।

১৩. রবার্ট এসেন অ্যান্ড ড্যানিয়েল ব্রাউয়ার সম্পাদিত, *কাউন্টারপাবলিকস অ্যান্ড দ্য স্টেট* (নিউইয়র্ক : স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক প্রেস, ২০০১), পৃ. ১৬১-৮৬।

১৪. চার্লস হারস্কিনড, *দ্য এথিক্যাল সাউন্ডস্কেপ : ক্যাসেট সারমনস অ্যান্ড ইসলামিক কাউন্টারপাবলিকস* (নিউইয়র্ক : কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬)।

১৫. আইসেনস্ট্যাড, 'কনক্লুডিং রিমার্কস', পৃ. ১৪৮।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

১৭. এন্ড্রু এডগার, *দ্য ফিলসফি অব হেবারমাস* (মন্ট্রিল : ম্যাকগিল-কুইনস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫), পৃ. ৩৭।

১৮. ভিমাল দেশানায়েকে, *সিনহালা নভেল অ্যান্ড দ্য পাবলিক স্ফেয়ার : থ্রি ইলাসট্রেটিভ মোমেন্টস* (কলম্বো : ভিসিডুনু প্রকাশাকায়ো (প্রাইভেট) লি., ২০১০) এমএসসি ওকোলো, 'কনটেস্টিং দি আফ্রিকান পাবলিক স্ফেয়ার : এ ফিলসফিক্যাল রিইমেজিং অব পাওয়ার অ্যান্ড রেসিস্ট্যান্স ইন গুগি'স উইজার্ড অব দ্য ক্রো', *আফ্রিকা ডেভেলপমেন্ট* ৩৪, নং ২ (২০০৯); পৃ. ৫৯-৮০।

১৯. ফিকশন শব্দটি পুরো প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে একটি কল্পনামূলক সৃষ্টি অথবা একটি সাহিত্যিক কাজ হিসেবে, যার মূলকথা তৈরি হয় কল্পনা দ্বারা, যা সত্যের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে এমন নয়। মেরিয়াম ওয়েবস্টারের অভিধানে ফিকশনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে কল্পনা দ্বারা উদ্ভাবিত কোনো কিছুকে, নির্দিষ্ট করে বললে, একটি উদ্ভাবিত গল্পকে।

২০. যথাযথ পদ বা শব্দ না থাকায় 'ইসলামিস্ট ফিকশন' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। মায়মুনা হক এসব ফিকশনকে ইসলামকেন্দ্রিক টেক্সট অর্থে বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে এসব উপন্যাসের উৎপাদক ও পাঠক এগুলোকে ইসলামি কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। মায়মুনা হক, 'ফ্রম পাইয়েটি টু রোমান্স : ইসলাম ওরিয়েন্টেড টেক্সট ইন বাংলাদেশ', *নিউ মিডিয়া ইন দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড : দি ইমার্জিং পাবলিক স্ফেয়ার*, সম্পাদনা ডেল ইকেলম্যান, জে ডব্লিউ এন্ডারসন এবং মার্ক টেসলার (ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৩), পৃ. ১২৯।

২১. এসব বইয়ের বিক্রেতারা ডিসেম্বর ২০০৫ এবং জানুয়ারি ২০০৮ সালে ব্যক্তিগত আলোচনায় আমার কাছে স্বীকার করেন যে তাঁরা প্রায়ই একই ক্রেতা বারবার পেয়ে থাকেন। এসব উপন্যাসের লেখকদের লেখা প্রতি সংস্করণের হাজার হাজার কপি বিক্রি হয় এবং প্রতি উপন্যাস এক বছরে কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়।

২২. হক, 'ফ্রম পাইয়েটি টু রোমান্স', পৃ. ১৫৫।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

২৫. যেমনটি আগেও বলা হয়েছে অনেকে এগুলোকে ইসলামপন্থী না বলে ইসলামিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২৬. ইসলামিক বুক ফিকশন, 'সংজ্ঞা' www.islamicfictionbook.com/defintions.html

২৭. পামেলা টেইলর, 'কল ফর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইসলামিক ফিকশন', Pettionspot.com, july 21 2006, www.petiyionspot.com/petitions/islamicfiction

২৮. হক, 'ফ্রম পাইয়েটি টু রোমান্স', পৃ. ১৪১।

২৯. মিশেল ওয়ার্নার, *পাবলিকস অ্যান্ড কাউন্টারপাবলিকস* (নিউইয়র্ক : জোন বুকস, ২০০২), পৃ. ৯০।

৩০. টেইলর, 'কল ফর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইসলামিক ফিকশন'।

৩১. প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৫; দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬।

৩২. হক, 'ফ্রম পাইয়েটি টু রোমান্স', পৃ. ১৪৭।

৩৩. নিয়মিত আকারে এসব থ্রিলার প্রকাশিত হওয়া দেখলে এদের জনপ্রিয়তা বোঝা যায়। ঢাকার বইবিক্রেতারা উৎসাহসহকারে এসব থ্রিলারের বহুল বিক্রির কথা বলেন। (২০০৮ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় বইয়ের দোকানের কর্মচারীর সঙ্গে আলাপচারিতা)।

৩৪. islam-bd.org. 'Abul Asad', www.islam-bd.org/personalities/AbulAsad/AbulAsad.html.

৩৫. আবুল আসাদ, *পাতনির সবুজ অরণ্যে*, সাইমুম সিরিজ ৪৩ (ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ২০০৬) পৃ. ৭৭।

৩৬. তৌহিদুল ইসলাম বাবু, *অপারেশন সিরিজ* (ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন)। এটি উল্লেখ্য, এই বইগুলোর প্রকাশক আসাদ বিন হাফিজ।

৩৭. হাশেম রনি, *সিক্রেট জোন* (ঢাকা, খেয়া প্রকাশনী, ২০০৬)।

৩৮. মাসুদ রানা হচ্ছে কাজী আনোয়ারের একটি ফিকশন চরিত্র। এই প্রকাশনার শুরু হয়েছিল ষাটের দশকে জেমস বন্ডের অনুকরণে, চরিত্রটি পরিপক্ব ও পরিবর্তিত হয়েছে তাৎপূর্যপূর্ণভাবে। এই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের শেষ পর্যন্ত ৩৭২টি বই প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত এটি বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ এবং বহুল পঠিত গোয়েন্দা থ্রিলার। প্রতি মাসে একটি নতুন বই প্রকাশিত হয়। এতে যৌনতার বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকায় এটি একটি প্রাপ্তবয়স্ক সিরিজ হিসেবে পরিচিতি পায়। সিরিজটি তরুণ পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়, বিশেষ করে যাদের পক্ষে ইংরেজি থ্রিলার পড়া সহজ নয়। অনেক ইসলামপন্থী মনে করেন, এটি ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ এবং অভিযোগ করেন যে এ সিরিজ অধার্মিকতাকে এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে উৎসাহিত করে। এই সিরিজবিষয়ক পরিচিতিমূলক আলোচনার জন্য দেখুন মাহমুদ রহমান, 'মাসুদ রানা : সুপার স্পাই অব ট্রান্সপ্ল্যান্ট ফিকশন', *ডেইলি স্টার*, ১০ মার্চ ২০০৭।

৩৯. আবুল আসাদের সাইমুম থ্রিলার সিরিজের বেশ কিছু উপাখ্যান থেকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত হয়েছে আহমেদ মুসা ও জোসেফিনের মধ্যকার টেলিফোন আলোচনায়, যা রয়েছে সিরিজের ৪২তম বই *ডুবো পাহাড়*-এ। আবুল আসাদ, *ডুবো পাহাড়* (ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ২০০৬), পৃ. ৬-৯।

৪০. ইসলামি নারীবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে এর সংজ্ঞা নিয়ে উল্লেখযোগ্য মতপার্থক্য থাকলেও এটি একটি বিকাশমান গবেষণা ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মূল কাঠামো ও প্রধান যুক্তিগুলোর জন্য দেখুন, আমিনা ওয়াদুদ, *কোরআন অ্যান্ড উইমেন : রি-রিডিং দ্য সেক্রেড টেক্সট ফর আ উইম্যানস পারসপেকটিভ* (নিউইয়র্ক : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯), পৃ. ৬৯-৭৮; আজিজাহ আল হিবরি, *অ্যান ইনট্রোডাকশন টু মুসলিম উইমেনস রাইটস, উইন্ডোস অব ফেইথ : মুসলিম উইমেন স্কলার—অ্যাকটিভিস্ট ইন নর্থ আমেরিকা*, সম্পাদনা গিসেলা ওয়েব (সিরাক্যুস, নিউইয়র্ক : সিরাক্যুস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০) পৃ. ৬৩-৬৫; রিফাত হাসান, 'মুসলিম উইমেন অ্যান্ড পোস্ট-পেট্রিয়ার্ক্যাল ইসলাম', *আফটার পেট্রিয়ার্কি : ফেমিনিস্ট ট্রান্সফরমেশনস অব দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস*, সম্পাদনা পলা এম কোইই, উইলিয়াম আর একিন এবং জে বি ম্যাকড্যানিয়েল (ম্যারিনল, নিউইয়র্ক; অরবিস বুকস, ১৯৯১), পৃ. ৫৪-৫৭; আসমা বারলাস, 'বিলিভিং উইমেন', *ইসলাম : আনরিডিং পেট্রিয়ার্ক্যাল ইন্টারপ্রিটেশনস অব দ্য কোরআন*, (অস্টিন : ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস প্রেস, ২০০২), পৃ. ১৮৪-১৮৯; কেসিয়া আলী, *সেক্সুয়াল এথিকস অ্যান্ড ইসলাম : ফেমিনিস্ট রিফ্লেকশনস অন কোরআন, হাদিস অ্যান্ড জুরিসপ্রুডেন্স* (অক্সফোর্ড, ওয়ানওয়ার্ল্ড, ২০০৬), পৃ. ১১৭-১২৬; সা'দিয়া শেখ, 'এক্সেগেটিক্যাল ভায়োলেন্স : নুসুজ ইন কোরআনিক জেন্ডার আইডিওলজি', *জার্নাল ফর ইসলামিক স্টাডিজ* ১৭ (১৯৯৭), পৃ. ৪৯-৭৩; ফাতিমা মারনিসি, 'ফেমিনিটি এজ সাবভারসন : রিফ্লেকশনস অন দ্য মুসলিম কনসেপ্ট অব নুসুজ,' *স্পিকিং অব ফেইথ : উইমেন, রিলিজিয়ন অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ*, সম্পাদনা ডায়না এল ইক (ফিলাডেলফিয়া : নিউ সোসাইটি পাবলিশার্স, ১৯৮৬)।

৪১. যদিও মূল কাঠামোটি এখনো একটি শিরোনাম দ্বারা চিহ্নিত করা যায়নি, কিন্তু বিকল্প শব্দ না থাকায় আমি এই শব্দটি ব্যবহার করেছি; সচরাচর গবেষণাগুলো এই দিকটির ওপর জোর দেয়, যদিও আমি মনে করি ধর্মানুরাগের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়।

৪২. সাবা মাহমুদ, পলিটিকস অব পাইয়েটি : দি ইসলামিক রিভাইভাল অ্যান্ড দ্য ফেমিনিস্ট সাবজেক্ট (প্রিন্সটন, নিউজার্সি; প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫।

৪৩. লারা দিব, *অ্যান এনচানটেড মডার্ন : জেন্ডার অ্যান্ড পাবলিক পাইয়েটি ইন শিয়া লেবানন* (প্রিন্সটন, নিউজার্সি; প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬)।

৪৪. মাহমুদ, পলিটিকস অব পিয়েটি, পৃ. ২।

৪৫. মায়মুনা হক, 'রিডিং দ্য কোরআন ইন বাংলাদেশ : দ্য পলিটিকস অব 'বিলিফ' অ্যামং ইসলামিস্ট উইমেন', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ* ৪২, নং ২/৩ (২০০৮), পৃ. ৪৫৭-৪৮৮; মায়মুনা হক, 'টকিং জিহাদ অ্যান্ড পাইয়েটি : রিফরমিস্ট এক্সারশনস অ্যামং ইসলামিস্ট উইমেন ইন বাংলাদেশ', *জার্নাল অব দি রয়্যাল এনথ্রোপলজিক্যাল ইনস্টিটিউট* ১৫, স্পেশাল ইস্যু : ইসলাম, পলিটিকস, এনথ্রোপলজি, অতিথি সম্পাদনা, ফিলিপ ওসেলা এবং বেঞ্জামিন সোর্স, ইস্যু সাপ্লিমেন্টস ১ (মে ২০০৯) : এস১৬৩-৮২; সামিয়া হক এবং সাবিনা ফায়েজ রশিদ, 'রিফ্যাশনিং ইসলাম : এলিট উইমেন অ্যান্ড পিয়েটি ইন বাংলাদেশ,' *কনটেম্পরারি ইসলাম* ২ (২০০৮) : ৭-২২; সামিয়া হক এবং সাবিনা ফায়েজ রশিদ, 'নেগোশিয়েটিং ইসলাম : কনজারভেটিজম, স্পিলন্টার্ড অথরিটি অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট ইন আরবান বাংলাদেশ,' *আইডিএস বুলেটিন* ৪১, নং ২, স্পেশাল ইস্যু : নেগোশিয়েটিং এম্পাওয়ারমেন্ট (মার্চ ২০১০) : ৯৭-১০৫; ইলোরা শেহাবুদ্দিন, *রিশেপিং দ্য হলি : ডেমোক্রেসি, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মুসলিম উইমেন ইন বাংলাদেশ* (নিউইয়র্ক : কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮; সারাহ সি. হেয়াইট, 'ডোমেইনস অব কনটেস্টেশন : উইমেনস এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড ইসলাম ইন বাংলাদেশ, *উইমেনস স্টাডিজ ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম* ৩৩ (২০১০) : ৩৩৪-৪৪)।

৪৬. ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গ্রামীণ এলাকায় এ রকম একটি দলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তারা তাদের পরিচয় দেয় তালিম গ্রুপ হিসেবে। আমাদের কথোপকথনে মহিলা জানায় যে তারা একটি দলের সদস্য, যেখানে একটি শিক্ষিত কিন্তু 'সাধারণ' নারী ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর থেকে প্রতি মাসে আসেন। তাঁরা ইসলাম ও নারীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন এবং ওই মহিলা সেই আলোচনায় নেতৃত্ব দেন। ২০১০ সালের শুরুর দিকে ঢাকায় আমি মধ্যবিত্ত শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষিত মহিলার সঙ্গে কথা বলি, এঁদের সবারই

পরিবার রয়েছে। এসব মহিলা আমাকে জানান যে তাঁরা নিয়মিত একটি পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করেন। এই পাঠচক্র মাসে কমপক্ষে একবার মিলিত হয়, কখনো কখনো দুবারও বৈঠক হয়। একজন 'জ্ঞানী মহিলা' তাঁদের আলোচনা 'এগিয়ে নেন'। আর যাঁদের সঙ্গে আমি কথা বলি তাঁর মধ্যে ছিলেন ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। তাঁদের একটি গ্রুপ রয়েছে, যাঁরা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্র হন, যাঁরা একজন তরুণ মুসলিম মহিলা বাংলাদেশের মতো সমাজে কী ভূমিকা রাখতে পারেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁরা জানান যে এটি শুধু স্রেফ প্রশ্ন-উত্তরের বৈঠক নয়, বরং অংশগ্রহণকারীরা কোরআন, হাদিস ও ইসলামি চিন্তাবিদদের টেক্সট পড়ে তাঁদের মতামত দেন ও আলোচনায় অংশ নেন। পাঠ্যসূচিতে আবুল আলা মওদুদীর বইও রয়েছে। ছাত্রীরা, বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে একজন, বারবার জোর দিয়ে বলেন যে তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সদস্য নন।

৪৭. *প্রথম আলোর* প্রদায়ক, কুররাতুল-আইন-তাহ্‌মিনার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা, এপ্রিল ২৪, ২০০৯। তাহিমনা *প্রথম আলোতে* এ ঘটনার রিপোর্ট করেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি যশোর জেলার শার্শা উপজেলার ডিহি ইউনিয়নের এ ধরনের একটি গ্রুপের ওপর রিপোর্ট করেন।

৪৮. ইলোরা শেহাবুদ্দিন, *রিশেপিং দ্য হলি*, পৃ. ১৯৩-১৯৫, ২০৪-২০৬।

৪৯. হক, 'রিডিং দ্য কোরআন ইন বাংলাদেশ,' ৪৬০, আশরাফ আলী থানভীর লেখা *বেহেশতি জেওর*, হেভেনলি অর্নামেন্টস (নিউ দিল্লি, তাজ পাবলিশার্স, ২০০২) বইটি দাবি করে যে এটি ধর্মীয় জীবনের একটি নির্দেশিকা। যদিও আশরাফ আলী থানভী যুক্তি দেখান যে নারীদের শিক্ষিত হওয়া দরকার, কিন্তু তিনি তীব্রভাবে নারীদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতা করেন। তিনি উপদেশ দেন যে মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে দেওয়ার বদলে তাঁদের কন্যাদের বেশ্যালয়ে পাঠানো উচিত।

৫০. আমিনা ওয়াদুদ, 'পলিটিকস অব পাইয়েটি : দি ইসলামিক রিভাইভাল অ্যান্ড দ্য ফেমিনিস্ট সাবজেক্ট', *জার্নাল অব দি আমেরিকান একাডেমি অব রিলিজিয়ন* ৭৪, নং ৩ (সেপ্টেম্বর ২০০৬); পৃ. ৮১৫-৮১৮।

৫১. এই বইটির রিভিউ এবং এ বিষয়ের ওপর আলোচনার জন্য দেখুন, উসামা মাকদিসি, 'রিয়েল মুসলিমস, রিয়েল লাইভস;' *এমআরজাইন*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮; www.mrzine.monthlyreview.org/2008/makdisil60208.html

৫২. হক, 'রিডিং দ্য কোরআন ইন বাংলাদেশ' পৃ. ৪৫৭।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯।

৫৫. হক অ্যান্ড রশিদ, 'রিফ্যাশনিং ইসলাম'।

৫৬. যদিও এই দলটি দাবি করে যে এটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা এবং তাদের কোনো রাজনৈতিক ঝোঁক নেই, কিন্তু ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তক জামায়াতে ইসলামীর প্রতি দলটির ঝোঁক নির্দেশ করে। এ দলে পঠিত ও আলোচিত বইগুলো আবুল আলা মওদুদীর লেখা। হক ও রশিদ বলেন, 'যদিও অংশগ্রহণকারীরা তাদের পছন্দমাফিক কোরআনের অনুবাদ নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু শিক্ষক এবং অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর 'দি মিনিং অব কোরআন' শীর্ষক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অনুসরণ করেন। (হক অ্যান্ড রশিদ, 'রিফ্যাশনিং ইসলাম,' পৃ. ৯)।



৫৭. হক অ্যান্ড রশিদ, 'রিফ্যাশনিং ইসলাম', পৃ. ৮।

৫৮. হক অ্যান্ড রশিদ, 'রিফ্যাশনিং ইসলাম', পৃ. ২০।

৫৯. উদ্ধৃত প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৬০. হালাকা অথবা পাঠচক্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে এবং সম্ভবত উত্তর আমেরিকার অন্য মুসলমানদের কাছেও নিয়মিত বিষয় হয়ে উঠছে। এ ধরনের অনেক গ্রুপ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে তৈরি। এসব অনেক গ্রুপ জেন্ডার অনুযায়ী ভাগ হয়ে মিলিত হয়, আবার অনেকগুলোতে নারী ও পুরুষেরা একসঙ্গে বৈঠক করে।

৬১. জেনিন ক্লার্ক, 'ইসলামিক উইমেন ইন ইয়েমেন : ইনফরমাল নোডস অব অ্যাকটিভিজম', *ইসলামিক অ্যাকটিভিজম : এ সোশ্যাল মুভমেন্ট থিওরি অ্যাপ্রোচ*, সম্পাদনা, কুইন্টান উইকটোরউজ (ব্লুমিংটন : ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪), পৃ. ১৬৪-১৮৪।

৬২. সাদাফ আহমেদ, 'আইডেনটিটি ম্যাটারস, কালচার ওয়ারস : অ্যান অ্যাকাউন্ট অব আল হুদা, (রি) ডিফাইনিং আইডেনটিটি অ্যান্ড রিকনফিগারিং কালচার ইন পাকিস্তান', *কালচার অ্যান্ড রিজিয়ন* ৯, সংখ্যা ১ (২০০৮); পৃ. ৬৩-৮০।

৬৩. ইয়াসমিন মোল, 'পিপল লাইক আস' ইন পারসুট অব গড অ্যান্ড রাইটস : ফেমিনিস্ট ডিসকোর্স অ্যান্ড সিসটারস ইন ইসলাম ইন মালয়েশিয়া', *জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ* ১১, সংখ্যা ১ (২০০৯); পৃ. ৪০-৫৫।

৬৪. সিলভিয়া ফ্রিস্ক, 'ক্লেইমিং রিলিজিয়াস স্পেস : মালয় উইমেন অ্যান্ড দ্য ট্রান্সফরমেশন অব রিচুয়ালস ইন আরবান কনটেক্সট', *এনআইএএস-নিট এশিয়া ইনসাইট* (নরডিক ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ), নং ৪ (২০০৪) : পৃ. ১০-১১।

৬৫. এমপ্রোন মারড্যান্ট, 'জেন্ডারিং পাইয়েটি অব মুসলিম উইমেন ইন থাইল্যান্ড', *Silapatsamnuk*, ৭ম বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩৭-৪৩, ২০০৭।

৬৬. র‍্যাইচেল রিনাল্ডো, 'দ্য ইসলামিক রিভাইভাল অ্যান্ড উইমেনস পলিটিক্যাল সাবজেকটিভিটি ইন ইন্দোনেশিয়া', *উইমেনস স্টাডিজ ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম* ৩৩ (২০১০) : পৃ. ৪২২-৩১।

৬৭. আল-মুসলিমাত : শ্রীলঙ্কার মুসলিম নারী সমিতি এবং আল মুসলিমাত উদ্বোধন প্রকল্পের সুভেনির। 'মুসলিম উইমেন ইন দ্য মিডস্ট অব চেঞ্জ', ৩০ নভেম্বর ১৯৯১ উদ্ধৃত হয়েছে, ফারজানা হানিফা, 'পাইয়েটি এজ পলিটিকস অ্যামং মুসলিম উইমেন ইন কনটেম্পরারি শ্রীলঙ্কা', *মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ* ৪২, নং ২/৩ (২০০৮); পৃ. ৩৫৩।

৬৮. সামাহ সেলিম, 'বুক রিভিউ : পলিটিকস অব পাইয়েটি : দ্য ইসলামিক রিভাইভাল অ্যান্ড দ্য ফেমিনিস্ট সাবজেক্ট', *জাদালিয়া*, ১২ নভেম্বর ।

৬৯. হক স্বীকার করেন যে তাঁর পর্যবেক্ষণ করা দলটির সদস্যদের ধারণা, অন্যান্য ধর্মানুরাগী আন্দোলন যেমন তাবলীগ কিংবা সাবা মাহমুদের গবেষণার বিষয় মসজিদ আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন। হক, 'টকিং জিহাদ অ্যান্ড পাইয়েটি', এস ১৭৭।

৭০. প্রাগুক্ত, এস ১৭৬।

৭১. এনজিও এবং তাতে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে ইসলামপন্থীদের বিরোধিতা নিয়ে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। আমি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি *গড উইলিং : দ্য পলিটিকস অব ইসলামিজম ইন বাংলাদেশ* গ্রন্থে (লেনহাম, মেরিল্যান্ড : রোওম্যান অ্যান্ড লিটলফিল্ড, ২০০৪); আরও দেখুন তাজ আই হাশমী, *উইমেন অ্যান্ড ইসলাম ইন বাংলাদেশ, রিয়েড সাবজেকশন অ্যান্ড টাইরানি* (নিউইয়র্ক : প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০০০), পৃ. ১৩৪-১৭৯;

ইলোরা শেহাবুদ্দিন, *রিশ্যাপিং দ্য হলি : ডেমোক্রেসি, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মুসলিম উইমেন ইন বাংলাদেশ* (নিউইয়র্ক, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮), পৃ. ১১১-১১৫।

৭২. মওদুদীর দৃষ্টিতে নারীদের অবস্থানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, লামিয়া রুস্তম শেহাদেহ, *দ্য আইডিয়া অব উইমেন আন্ডার ফান্ডামেন্টালিস্ট ইসলাম*, (গেইনেসভিল : ইউনিভার্সিটি প্রেস অব ফ্লোরিডা, ২০০৩), পৃ. ২৩-৪৮; রয় জ্যাকসন, *মাওলানা মওদুদী অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইসলাম* (লন্ডন, রাটলেজ, ২০১১), পৃ. ১৩৩-১৩৯।

৭৩. অ্যান সোফি রোয়ান্ড, 'ফেমিনিস্ট রিইন্টারপ্রিটেশন অব ইসলামিক সোর্সেস : মুসলিম ফেমিনিস্ট থিওলজি ইন দ্য লাইট অব দ্য ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাডিশন অব ফেমিনিস্ট থট', *উইমেন অ্যান্ড ইসলামাইজেশন : কনটেম্পরারি ডাইমেনশনস অব ডিসকোর্স অন জেন্ডার রিলেশনস*, সম্পাদনা করিম আসক এবং মারিট টমসল্যান্ড (অক্সফোর্ড এবং নিউইয়র্ক : বার্গ, ১৯৯৮), পৃ. ১৮-১৯।

৭৪. আমি এই পয়েন্টটা নিলুফার গোলের কাছ থেকে নিয়েছি। নিলোফার গোলে, 'স্ল্যাপশটস অব ইসলামিক মডার্নিটি', *ম্যাল্টিপল মডার্নিটিজ*, সম্পাদনা সুমেল এন আইসেনস্ট্যাড (নিউ ব্রন্সউইক, নিউজার্সি : ট্রান্সজেকশন পাবলিশার্স, ২০০২), পৃ. ১১১।

৭৫. ডেল এফ আইকেলম্যান, 'দ্য কামিং ট্রান্সফরমেশন অব দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড', *ফরেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ওয়্যার* (ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভানিয়া) ৭, সংখ্যা ৯ (আগস্ট ১৯৯৯),

৭৬. ফ্রেজার, 'রিথিংকিং দ্য পাবলিক স্ফেয়ার', পৃ. ৬৭।

৭৭. শেহাদেহ, দ্য আইডিয়া অব ওমেন আন্ডার ফান্ডামেন্টালিস্ট ইসলাম, পৃ. ২৯।

৭৮. গোলে, 'স্ল্যাপশটস অব ইসলামিক মডার্নিটি', পৃ. ১০১।

এই লেখার ইংরেজি ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ সালে গ্লোবাল চেঞ্জ, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি জার্নালে; বাংলা ভাষ্য তৈরিতে সহযোগিতার জন্য লেখক সিফাত বিন সাদেকের কাছে কৃতজ্ঞ।



অর্থনীতি

# নজরদারির পুঁজিবাদ : একচেটিয়া-ফিন্যান্স পুঁজি, সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স ও ডিজিটাল যুগ

**জন বেলামি ফস্টার ও রবার্ট ডব্লিউ ম্যাকচেনজি**

**সারসংক্ষেপ**

'সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো পুঁজিবাদ।' একুশ শতকে এসে সাম্রাজ্যবাদের ধরনে পরিবর্তন এলেও আদর্শের দিক থেকে এটি অবিচল রয়ে গেছে। নব্য উদারবাদ অর্থনীতির যুগে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো ভূখণ্ডভিত্তিক উপনিবেশ স্থাপনের পরিবর্তে অন্য রাষ্ট্রের বাজার দখলের মাধ্যমে তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি বহাল রেখেছে। সামরিক শিল্প কমপ্লেক্সের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটানোর ফলে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত পুঁজিই বিদেশি বাজার দখলের পেছনে তাড়না হিসেবে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তার সামরিক শিল্প কমপ্লেক্সকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সেই সাম্রাজ্যবাদী নীতিটি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে একদিকে যেমন ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তেমনি কর্মসংস্থান ধরে রাখতেও সহায়তা করে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাযুক্তিক বিকাশ ত্বরান্বিত করে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতেও এই প্রক্রিয়া বহুল ফলদায়ক। বিশ শতকের মার্কিন এই সাম্রাজ্যবাদ নীতিটি যেমন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধবাজ ও নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে, তেমনি একুশ শতকের তথ্যপ্রাযুক্তিক বিপ্লব বা ডিজিটাল বিশ্বব্যবস্থা সেই যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার মূল হাতিয়ার—নজরদারি ব্যবস্থা জোরদারকরণে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারি উপকরণগুলো এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়া, বিক্রয় প্রচেষ্টা জোরদার, ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন, ডেটা মাইনিং ও সাইবার যুদ্ধ, ইন্টারনেটভিত্তিক একচেটিয়া পুঁজি ইত্যাদি সবই এই সামরিক শিল্প কমপ্লেক্সকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে নজরদারির পুঁজিবাদ বা নতুন ধারার সাম্রাজ্যবাদকেই প্রকারান্তরে বাস্তবায়ন করছে।

**মুখ্য শব্দগুচ্ছ :** পুঁজিবাদ, নজরদারি, একচেটিয়া-ফিন্যান্স পুঁজি, সামরিক শিল্প-ডিজিটাল কমপ্লেক্স, রাজনৈতিক অর্থনীতি, সাম্রাজ্যবাদ/সমরবাদ

## প্রারম্ভিক কথা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার অর্থনীতির প্রভু হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র ত্রিশের দশকের মহামন্দা কাটিয়ে ওঠে; সারা দুনিয়ায় অস্ত্র ও সেনার যে চাহিদা সৃষ্টি হয়, তা সরবরাহ করে দেশটির অর্থনীতি উঠে দাঁড়ায়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে প্রকৃত দেশটির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৬৫ শতাংশ, শিল্প উৎপাদন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে ৯৫ শতাংশ।[১] যুদ্ধের পরপরই ইউরোপ ও জাপানের উৎপাদনব্যবস্থা ধসে পড়ায় এ সময় দুনিয়ার মোট উৎপাদনের ৬০ শতাংশই হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে।[২] সমাজের উচ্চকোটিতে একটি ভীতি কাজ করছিল, পাছে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেশটির অর্থনীতি আবার যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরে যায় : দেশের অভ্যন্তরের চাহিদা দেশটির উৎপাদনব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্তের তুলনায় কম, ফলে নতুন করে মন্দা ও নিশ্চলতা সৃষ্টি হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন একিসন ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধপরবর্তী অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনাসংক্রান্ত বিশেষ কংগ্রেশনাল কমিটির সামনে ঘোষণা করেন, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যদি যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরে যায়, তাহলে 'দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে ঘোর বিপদ। বিশের দশক ও ত্রিশের দশক শুরুর আগের ১০টি বছর আমাদের যেভাবে কেটেছে, সেরূপ আরও ১০টি বছর আমাদের জাতীয় জীবনে ফিরে আসুক, আমরা তা চাই না (স্টক মার্কেট ধস ও মহামন্দা)। সেটা হলে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে'। একিসন এটাও পরিষ্কার করে বলেন, সমস্যাটা আমাদের উৎপাদনের নয়, বরং এটা অধিক উৎপাদনের সমস্যা। 'সমস্যাটা খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এটা বাজারের সমস্যা। উৎপাদনের সমস্যা আমাদের নেই। আমাদের সৃজনশীলতা অফুরান, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাজার'।[৩]

দেশটির সরকার ও শিল্পের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাবিদেরা দ্রুতই এ অবস্থা কাটিয়ে উঠে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিক্রয়ব্যবস্থায় জোর দেন। এ প্রক্রিয়ায় ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-কেন্দ্রিক করপোরেট বিপণন বিপ্লব ঘটে যায়। একই সঙ্গে নানা দেশে চিরস্থায়ী যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এর মাধ্যমে বিশ্ববাজারের ওপর সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়, শীতল যুদ্ধে লড়াই করাও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুবিধাজনক হয়, যার কেন্দ্র ছিল পেন্টাগন। একদিকে বিক্রয়ব্যবস্থা ও অন্যদিকে সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স, এ দুই মাধ্যমে (ভোগ ও বিনিয়োগ ছাড়া) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের ২৫ বছর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। তারপর ১৯৭০-এর দশকের সংকটের পর উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণের তৃতীয় প্রক্রিয়া হিসেবে ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন সামনে চলে আসে—বিক্রয়ব্যবস্থা ও সামরিক শিল্প



থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণের পরিমাণ কমে আসায় এই প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চার করে ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন।

এসব প্রক্রিয়া কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটানোয় তেল-জল জোগায়। প্রতিটি মাধ্যমই নতুন ধরনের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। ফলে সারা দুনিয়াই নজরদারির আওতায় চলে আসে, নিম্নোক্ত তিনটি মাধ্যমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই নজরদারি প্রক্রিয়া : ১. সমরবাদ/ সাম্রাজ্যবাদ/ নিরাপত্তা, ২. করপোরেটভিত্তিক বিপণন ও মিডিয়াব্যবস্থা, ৩. ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন।

## যুদ্ধরাষ্ট্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ওয়াশিংটনে এক নতুন পেন্টাগন পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে। যুদ্ধোত্তরকালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে যুদ্ধরাষ্ট্রের সৃষ্টি, এর মূল নিহিত রয়েছে সামরিক শিল্প কমপ্লেক্সে। দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল ডউইট ডি, আইসেনহাওয়ার ১৯৪৬ সালের ২৭ এপ্রিল নিম্নোক্ত ব্যক্তি/ বিভাগের উদ্দেশে একটি মেমো প্রদান করেন : 'সাধারণ যুদ্ধ বিভাগসমূহের পরিচালক ও প্রধান, বিশেষ কর্মী বিভাগ, ব্যুরোসমূহ, প্রধান কমান্ডসমূহের কমান্ডিং জেনারেলগণ'। এর বিষয় ছিল 'সামরিক পরিসম্পদ হিসেবে বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক সম্পদ'। আইসেনহাওয়ার ১৯৬১ সালের ১৭ জানুয়ারির জাতির উদ্দেশে দেওয়া তাঁর প্রখ্যাত বিদায় ভাষণে যে 'সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স'-এর কথা বলেছিলেন, সেই মৌর মেলম্যান এই মেমোকে তার ভিত্তি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এই মেমোতে আইসেনহাওয়ার জোর দিয়ে বলেছিলেন, সামরিক ও বেসামরিক বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, শিল্প ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন ও চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হোক। তিনি এতে লিখেছিলেন, 'আমাদের যে বেসামরিক সম্পদ জরুরি অবস্থায় প্রধান সহায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেগুলো শান্তির সময়েও সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন।' ফলে জাতীয় নিরাপত্তাব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয়—বেসামরিক বিজ্ঞানী, শিল্প ও ঠিকাদারদের সরকারের ক্রমবর্ধমান ও গোপন জালের মধ্যে আনা হয়। 'এই বেসামরিক প্রতিভাবানদের ঠিকঠাক কাজে লাগাতে হলে তাঁদের ভবিষ্যৎ সামরিক সমস্যায় যুক্ত করতে হবে, তাঁদের পরিকল্পনা ও গবেষণা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। একটি পন্থা হতে পারে পরিকল্পনায় অর্থসহায়তার চুক্তির অনুমোদন দেওয়া। এরূপ একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে আমাদের পরিকল্পনার কার্যকারিতা বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং কৌশলগত কর্মসূচি আরও নিবিড়ভাবে পালন

করা সম্ভব হবে।' আইসেনহাওয়ার বলেছিলেন, বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য যতটা সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া যায় ততটা দিতে হবে, তবে তা অবশ্যই সমরশিল্পের 'মৌলিক সমস্যার' আলোকে প্রণীত শর্ত মেনে।

আইসেনহাওয়ারের মতে, এ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে জাতির জরুরি অবস্থার সময় সমর খাত যেন শিল্প ও প্রাযুক্তিক সক্ষমতার একটি বড় অংশ আত্তীকরণ করতে পারে, যাতে এগুলো দেশটির 'সামরিক কাঠামোর অবিভেদ্য অংশে পরিণত হতে পারে'। বিজ্ঞান ও শিল্পের সঙ্গে সমর খাতের যে সম্পর্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গড়ে উঠেছে, সেটাকে কোনোভাবেই চূড়ান্ত বিবেচনা করা যাবে না। এ সম্পর্ককে আরও প্রসারিত করতে হবে। তিনি লিখেছেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃহত্তর পরিসরে গবেষণায় সহায়তা করা আমাদের কর্তব্য। সেটা যদি শিল্পেও হয়, তাহলেও আমাদের সেখানে সহায়তা দিতে হবে। মানে সামরিক ও বেসামরিক সম্পদের সম্মিলন ঘটলে তা শুধু সেনাবাহিনীর জন্যই লাভজনক হবে না, দেশের নিরাপত্তার জন্যও তা সহায়ক হবে।' যে সমন্বয়ের কথা তিনি বলেছেন, সেটা 'যুদ্ধ বিভাগের চূড়ান্ত পর্যায়ের, ইতিমধ্যে তা অর্জন হয়ে গিয়েছিল'[৪]।

১৯৪৬ সালে আইসেনহাওয়ার যে সামরিক বিদ্যার সঙ্গে বেসামরিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের কথা বলেছেন, সেটা আসলে যুদ্ধ অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটার ভিত্তি হচ্ছে সামরিক কেইনসবাদ, আর এর উৎপত্তি হয়েছে ট্রুম্যান প্রশাসনের জামানায়। ১৯৪৬ সালের এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট অনুসারে একটি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়, যাদের কাজ ছিল অর্থনীতির বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করা এবং হোয়াইট হাউসের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নীতি প্রণয়ন করা। এই পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন এডউইন নৌর্স, ১৯৩৪ সালের ব্রুকিং ইনস্টিটিউশন স্টাডি আমেরিকার উৎপাদনের ক্ষমতা (আমেরিকাস ক্যাপাসিটি টু প্রডিউস) শীর্ষক একটি প্রকাশনার জন্য তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনি এতে বাজারের সম্পৃক্ততা ও মার্কিন অর্থনীতির অতি উৎপাদনক্ষমতায় আলোকপাত করেছেন। সংস্থাটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন লিও কেইসারলিং, পরবর্তীকালে তিনিই সামরিক কেইনসবাদের প্রধান প্রবক্তায় পরিণত হন। ১৯৪৯ সালে নৌর্স সরে গেলে কেইসারলিং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অন্যদিকে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ১৯৪৭-এর আওতায় জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল) গঠিত হয় (এই অ্যাক্টের আওতায় পরে সিআইএ গঠিত হয়)। এই অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ ও জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রকে একটি যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রে পরিণত করার সব আয়োজন সম্পন্ন করে। ট্রুম্যান ১৯৫২ সালে জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সি (ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি) গঠন করেন, এটি ছিল খুবই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। এটা সামরিক বাহিনীর একটি অঙ্গ হিসেবে সম্ভাব্য বিদেশি



(ও অভ্যন্তরীণ) নাশকতামূলক কাজের ওপর নজরদারি করার জন্য গঠিত হয়[৫]।

১৯৫০ সালে একিসনের অধীন যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি প্ল্যানিং স্টাফের পরিচালক পল এইচ. নিটজেকে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ৬৮-এর প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। এতে শীতল যুদ্ধ ও বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনীতিগত এক মহাকৌশলের রূপরেখা প্রণীত হয়। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, অর্থনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার : 'সরকার আরও ইতিবাচক কর্মসূচি প্রণয়নে মনোযোগ না দিলে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য মুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ভাটা পড়বে'। এতে শুধু ভূরাজনৈতিক বিবেচনা ছাড়াও 'বন্দুক ও মাখনের' নীতি সামরিক কেইনসবাদের ওপর ভর করে ব্যাপক পুনঃশস্ত্রীকরণ ঘটে।

এই প্রতিবেদন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে মার্কিন অর্থনীতির ব্যাপক প্রসারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। মার্কিন অর্থনীতিতে শতভাগ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য থাকলেও তা ক্রমবর্ধমান সামরিক ক্রয় ও উচ্চ মাত্রার অভ্যন্তরীণ ভোগের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। অন্য কোনোভাবে সেটা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ ধরনের অর্থনীতিতে বন্দুক ও মাখন দুই-ই উৎপাদন সম্ভব। এই প্রতিবেদনে বলা হয়, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক হারে উৎপাদন পেতে পারে। সে কারণে জীবনমানের অবনমন না ঘটিয়েও দেশটি নিজের ও তার সহযোগীদের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি নির্মাণ করতে পারে'। বটেই, 'কোনো জরুরি অবস্থার সময়' যুক্তরাষ্ট্র তার মোট জাতীয় উৎপাদনের ৫০ শতাংশ সামরিক খাত, বিদেশি সহায়তা ও বিনিয়োগে ব্যয় করতে পারে বা 'বর্তমানের চেয়ে অন্তত পাঁচ বা ছয় গুণ বেশি ব্যয় করতে পারে'। প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়, ব্যাপক হারে পুনঃ শস্ত্রীকরণ ঘটলে অর্থনীতিতে যে চাপ পড়বে ব্যাপারটা তেমন নয়, কারণ, 'এতে হয়তো জনগণের জীবনমানের অবনমন ঘটবে না', বরং এর উল্টোটাও ঘটতে পারে :

সামরিক ও বিদেশি সাহায্যে যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে, তার চেয়ে জাতীয় মোট উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বেশি হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে আমাদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে, মার্কিন অর্থনীতি পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতায় কাজ করলে বেসামরিক খাতের ভোগের চেয়ে অন্য খাতে বেশি সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে, তবে একই সঙ্গে যাপিত জীবনের উচ্চমানও বজায় রাখা সম্ভব। পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি মাথায় রাখলেও ১৯৩৯-৪৪ সালের মধ্যে ব্যক্তিগত ভোগের খাতে মানুষের ব্যয় এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ বেড়েছে। যদিও এ সময় সরকারি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে, ১৯৩৯ সালের হিসাবে সেটা ৬০-৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার[৬]।

কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যাডভাইজার্সের চেয়ারম্যান কেইসারলিংকে এনএসসি-৬৮-এর একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা দিতে বলা হয়েছিল, যদিও

প্রতিবেদনটি প্রস্তুতে তাঁর প্রভূত ভূমিকা রয়েছে। তিনি ১৯৫০ সালের ৮ ডিসেম্বর তিনি একটি মেমো পাঠান। এতে তিনি দেখান, এনএসসি-৬৮ এ জাতীয় নিরাপত্তায় যে ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হয়েছে, সেটা অর্থনীতির সক্ষমতার চেয়ে অনেক কম। ১৯৫২ সালে এর পরিমাণ জাতীয় উৎপাদনের ২৫ শতাংশ হবে, যেখানে ১৯৪৪ সালে জাতীয় নিরাপত্তায় ব্যয়ের পরিমাণ ৪২ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ভোগে ব্যয়ের পরিমাণ কমানোর সম্ভাবনা সত্ত্বেও 'প্রস্তাবিত কর্মসূচির আওতায় সাধারণভাবে বেসামরিক লোকেদের ভোগের যে অবস্থা দাঁড়াবে, সেটাকে খুব বেশি বলা যাবে না'। অন্যদিকে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সাধারণভাবে বাড়বে[৭]।

এনএসসি-৬৮-এ শুধু সামরিক ব্যয় তিন গুণ বাড়ানোর কথাই বলা হয়নি। প্রতিবেদনে যে পুনঃশস্ত্রীকরণের কথা বলা হয়েছে, সেটা মূলত শীতল যুদ্ধের কথা মাথায় রেখেই করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের মার্চে ট্রুম্যানের তথাকথিত 'সংবরণ' নীতির সহায়তায় এটা করা হয়েছে। আর গৌণ বিবেচনাটা হচ্ছে অর্থনীতির[৮]। কিন্তু উভয় লক্ষ্যই এক জায়গায় এসে মিলে যায়। ১৯৫০ সালের কোরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাস দুয়েক আগে *বিজনেস উইক*-এ ঘোষণা করা হয়, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির আবেদনের দুটি কারণ রয়েছে, একটি হচ্ছে 'রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন' এবং আরেকটি হচ্ছে 'দেশে বেকারত্বের হার বৃদ্ধির আশঙ্কা'[৯]। এটাই হচ্ছে শীতল যুদ্ধের রাজনৈতিক অর্থনীতি। এ প্রসঙ্গে হ্যারি ম্যাগডফের ১৯৬৯ সালে লিখিত *এজ অব ইমপেরিয়ালিজম* গ্রন্থের শেষের একটি মন্তব্য স্মর্তব্য : 'কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালালে যেমন মুনাফা লাভ সহজ হয়, তেমনি মুনাফার খোঁজে নামলে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো সহজ হয়। এর চেয়ে ভালো জুটি আর কী হতে পারে?'[১০]

হ্যাঁ, এরপর এনএসসি-৬৮ পরিকল্পনা শিগগিরই বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কোরীয় যুদ্ধের কারণে নীতিগত অবস্থান সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির পক্ষে সরে আসায় এ যুদ্ধ মার্কিন অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে। এ যুদ্ধের শেষের দিকে সামরিক ব্যবস্থা আরও বড় আকার লাভ করে। আইসেনহাওয়ার যুদ্ধের পরে সামরিক ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা করলেও 'কোরীয় যুদ্ধ ও এনএসসি-৬৮ প্রতিবেদনের আগের চেয়ে সামরিক ব্যয় তিন গুণ বেড়ে যায়'[১১]। ১৯৫৭ সালে আইসেনহাওয়ার দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতা গ্রহণের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় ছিল দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনের ১০ ভাগ[১২]। এর মাধ্যমে যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৬৪ সালের *মান্থলি রিভিউ* পত্রিকায় স্কট নেয়ারিং বলেন, এ রাষ্ট্র 'যুদ্ধ ও যুদ্ধের হুমকিকে তার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান অস্ত্র হিসেবে গণ্য। এই যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের করণীয়ের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি, সুযোগ পেলেই এরা যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়'[১৩]।



কোরীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্র চারিত্রিকভাবে যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। আইসেনহাওয়ারের প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী চার্লস আরউইন উইলসন (জেনারেল মোটরসের সাবেক সভাপতি হিসেবে কখনো কখনো তাঁকে 'জেনারেল মোটরস উইলসন' নামেও ডাকা হতো। চার্লস ই. উইলসন আর তিনি যে এক ব্যক্তি নন, সেটা বোঝাতে তাঁকে এ নামে ডাকা হতো—নিচে দেখুন) কংগ্রেসের উদ্দেশে বলেন, সমরতন্ত্রকে একবার মাথায় তোলা হলে সেখান থেকে এটাকে নামানো একপ্রকার অসম্ভব : 'প্রতিরক্ষা ব্যবসার একটি গুরুতর ব্যাপার হলো অনেক মার্কিনের স্বার্থই এর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে—সম্পদ, ব্যবসা, চাকরি, কর্মসংস্থান, ভোট, পদোন্নতির সুযোগ, অগ্রগতি, বিজ্ঞানীদের মোটা অঙ্কের বেতন প্রভৃতি। এটা একটা সমস্যাজনক ব্যবসা...হঠাৎ করে পরিবর্তন আনতে গেলে আপনি বিপদে পড়বেন...পুরো ব্যবসাটা বন্ধ করে দিলে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যটি বিপদে পড়ে যাবে, কারণ বিমান নির্মাণ কারখানার একটি বড় অংশ এই রাজ্যে অবস্থিত'[১৪]। জেনারেল ইলেকট্রিকের সাবেক সভাপতি ও ওয়ার প্রডাকশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান চার্লস ই. উইলসন ১৯৪৪ সালের যে চিরস্থায়ী যুদ্ধ অর্থনীতির জন্য দেন-দরবার করেছেন, সেই রাষ্ট্র ও তার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে 'যুদ্ধের শিল্প ও গবেষণা সক্ষমতা' সম্পৃক্ত হয়ে গেছে[১৫]।

ফলে এই সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা অবগত ছিলেন। হার্ভার্ডের অর্থনীতিবিদ সামনার সিলচটার ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে একটি ব্যাংকিং সম্মেলনে বলেছিলেন, শীতল যুদ্ধে যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে, তাতে নতুন করে ব্যাপক মন্দা হওয়ায় আশঙ্কা কম। তিনি বলেন, সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি হলে পণ্যের চাহিদা বাড়ে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ধরে রাখা সম্ভব হয়, প্রাযুক্তিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয় এবং জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে। ১৯৫৪ সালে হাইড্রোজেন বোমার উদ্ভাবনের পর *ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট*-এ লেখা হয় : 'ব্যবসার ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বোমার তাৎপর্য কী? এই পণ্যটি ক্রয়ের বড় বড় আদেশ আসবে...দীর্ঘদিন ধরে। সামনের বছরগুলোতে এই নতুন বোমার কার্যকারিতা বাড়তেই থাকবে।' একজন ভাষ্যকারের মতে, 'হাইড্রোজেন বোমা মন্দার আশঙ্কা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছে'[১৬]।

বামদের মধ্যে পল এ. বারান ও পল এম. সুইজি ১৯৬৬ সালে লিখিত তাঁদের *মনোপলি ক্যাপিটাল* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই সমরবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতিতে যে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত তৈরি হচ্ছে, সে কারণেও এমনটা হচ্ছে—পুঁজিবাদী ভোগ ও বিনিয়োগের পরও বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে।

সরকার যে অন্য কোনো খাতে সে ব্যয় করবে, তারও উপায় নেই। শক্তিমান করপোরেট খাত সে ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে সরকারের বেসামরিক ক্রয় ও বিনিয়োগ মোট দেশজ উৎপাদনের ১৪ দশমিক ৫ শতাংশে পৌঁছায়—এ পরিসংখ্যানটা একপ্রকার ধ্রুব হয়ে গেছে। অন্যদিকে, বেসামরিক ব্যয় (ভোগ ও বিনিয়োগ) ২০১৩ সালে মোট দেশজ উৎপাদনের ১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। (এতে আবার 'সামাজিক উন্নয়নে' সরকারের ব্যয়ের পরিসংখ্যানের অতিরঞ্জন রয়েছে। কারণ, সরকারের বেসামরিক খাতে ব্যয়ের বেশির ভাগটাই চলে যায় কারাগার ও অভ্যন্তরীণ পুলিশিং কার্যক্রমে)। সে কারণে বেসামরিক খাতের ব্যয়ের চেয়ে সামরিক খাতে ব্যয় অধিকতর ভ্যারিয়েবল বলে প্রতীয়মান হয়। সেটা অর্থনীতির ফুলে ওঠার ক্ষেত্রেও ইন্ধনের মতো কাজ করে[১৭]।

বারান ও সুইজির মতে, এই সামরিক ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যও রয়েছে। এটা একেবারে মুক্ত ভ্যারিয়েবল নয়। কারণ, আর্থিক খাতের হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা চাইলেই এখানে কারসাজি করতে পারে না। প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে যুদ্ধ। মানে, দুই পরাশক্তির মধ্যকার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেকোনোভাবেই এড়াতে হতো। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রান্তস্থ অর্থনীতিগুলোই উন্মুক্ত যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'বৈশ্বিক সামরিক অস্ত্র নিয়ে এই সাম্রাজ্যের সুরক্ষায় নিয়োজিত' রয়েছে। ১৯৬০-এর মধ্য দশকেই সারা দুনিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের শতাধিক সামরিক ঘাঁটি ছিল, ফলে দেশটি চাইলেই যেকোনো সময় যেকোনো স্থানেই সেনা মোতায়েন করতে পারে।

বাস্তব কারণেই যুক্তরাষ্ট্রকে নানা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হতো। সেটা যেমন ভিয়েতনামের মতো প্রান্তিক দেশে হয়েছে, তেমনি মার্কিন জনগণের মধ্য থেকেও প্রতিরোধ এসেছে[১৮]। ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে ভিয়েতনামে মার্কিন স্থলসেনারা বিদ্রোহ করে বসে। ফলে সেনাবাহিনীও তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এরূপ আক্রমণ ও দখলের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে একটি পেশাদার সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয়[১৯]। তার আগে দুই দশক ধরে মার্কিন বাহিনী যে দখলদারি চালিয়েছে, সেটা যদি আইন করে বন্ধ করা হতো, তাহলে মার্কিন বাহিনীর কপালে অনেক দুঃখ ছিল।

পুরো দুনিয়াটা এভাবে পাহারা দেওয়ার জন্য দুটি বিষয় খুব জরুরি : প্রথমত ঢোল পিটিয়ে এটা জানান দেওয়া যে আমরা খুব উদার, গণতান্ত্রিক ও প্রয়োজনীয়; যেটা মার্কিনদের খুব সহজাত বৈশিষ্ট্য। ফলে আইনগত দিক দিয়ে এটা বৈধ। যেকোনো প্রচারণার একটি উল্টো দিকও আছে : জনপ্রিয় অজ্ঞতা। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ভালো শিক্ষা হয়, এরপর কোনো দেশের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধে লিপ্ত হলে জনরোষ সৃষ্টি করা যাবে



না'—প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারার ভাষ্যে এটাই নাকি এই যুদ্ধের 'মহত্তম অবদান'। ম্যাকনামারার মতে, এটা খুব দরকার ছিল, কারণ পরবর্তী ৫০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রকে এরূপ অনেক যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে[২০]। আর মার্কিন গণমাধ্যম কেরানির মতো সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সমর্থনে যুক্তি সৃষ্টি করেছে, মানুষের উপলব্ধিকে প্রতি পদক্ষেপে বাধাগ্রস্ত করেছে। দ্বিতীয়ত, এই প্রচারণাযজ্ঞ চালানোর জন্য হাতে বেত তো একটা ছিলই—প্রান্তিক দেশগুলোতে নগ্ন হস্তক্ষেপ ও দেশের ভেতরে নজরদারি ও নিপীড়ন।

## বিক্রয় প্রচেষ্টা

১৯৫০-এর দশকে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সফলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-ভিত্তিক বিক্রয় প্রচেষ্টা। অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত শুষে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা ছিল খুবই কার্যকর একটা মাধ্যম। পুঁজিবাদের বিলাসবহুলতার বাইরে এই বিক্রয় এক নতুন দিক উন্মোচন করে। বারান ও সুইজি এটাকে 'কর্তনের মাধ্যমে মুনাফা' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রমিকদের (বা এই শ্রেণির একটি সুবিধাপ্রাপ্ত অংশকে) বেশি বেতন দিয়ে তাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে প্রলুব্ধ করে বা তাদের অপব্যয়ী করে তোলার মাধ্যমে এই মুনাফা অর্জিত হয়েছে। পরিণামে উৎপাদন সম্পর্কের তুলনায় শ্রমিকদের জীবনমানের প্রকৃত উন্নতি না ঘটলেও তারা এই চাকরির গ্যাঁড়াকলে আটকা পড়ে[২১]। থর্সটেইন ভেবলেনের মতে, উৎপাদন ক্রমেই তার প্রকৃত ব্যবহারমূল্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'বিক্রয়যোগ্য পণ্যের' প্রস্তুতকরণে পর্যবসিত হয়েছে[২২]। যুদ্ধোত্তরকালে এক নতুন ভোক্তা পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। মার্টিন মেয়ারের মতে, 'এটি ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-ভিত্তিক এক ত্রিপক্ষীয় ব্যবসা। এর এক প্রান্তে রয়েছে উৎপাদক (যারা ব্র্যান্ডের পণ্য উৎপাদন করছে ও সেগুলোর প্রচারে ব্যয় করছে), এজেন্সি (যারা বিজ্ঞাপন বানায় ও সম্প্রচার করে) এবং গণমাধ্যম (সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, টিভি—এগুলো সবই একেকটা বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যম, এদের মাধ্যমে জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে যায়)'[২৩]। বিজ্ঞাপন ছাড়াও করপোরেট বিপণনের অন্যান্য ক্ষেত্রে হচ্ছে গ্রাহক নির্ধারণ, প্রণোদনাসংক্রান্ত গবেষণা, পণ্য ডিজাইন, বিক্রয়ে উৎসাহ দান ও সরাসরি বিপণন[২৪]।

১৯৫০-এর দশকে বিপণন-প্রক্রিয়া একটি সংগঠিত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। ভোক্তা নিরীক্ষা, প্রচারণা কার্যক্রম, জনগণের মনস্তাত্ত্বিক গড়নকে প্রভাবিত করা প্রভৃতি উপাদান যুক্ত হয়ে বিপণন এক কর্মযজ্ঞে রূপ নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশটির মানুষের সঞ্চয় স্থিতি ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এরপর ম্যাডিসন অ্যাভিনিউয়ের 'বিজ্ঞাপন মানবদের' কল্যাণে শ্রমিকেরা একেকজন ভোক্তায়

পরিণত হয়। এতে চাকরির ওপর তাদের নির্ভরতা বেড়ে যায় আর অর্থনীতিও ফুলে-ফেঁপে ওঠে। এভাবে বিক্রয়-প্রক্রিয়া একচেটিয়া পুঁজিবাদের এক অন্যতম সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গে পরিণত হয়[২৫]।

বিপণন ও বিজ্ঞাপন ব্যয় ১৯৫০-এর দশকে বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, ১৯২৯ সালে এর পরিমাণ ছিল বছরে তিন বিলিয়ন ডলার, ১৯৫৭ সালের তা এসে দাঁড়ায় ১২ বিলিয়ন ডলার। এতে অর্থনীতিতে কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি পায়, বাজারের সম্প্রসারণ হয়, কর্মসংস্থান বাড়ে। একই সঙ্গে নতুন নতুন পণ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। এ প্রক্রিয়ায় বহু পণ্য সেকেলে হয়ে যায়, আবার অনেক নতুন ও অপ্রয়োজনীয় পণ্য ভোক্তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই পুরো বিপণন-প্রক্রিয়া সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে[২৬]। ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক বিজ্ঞাপন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল সামরিক ব্যয়ের ২০-২৫ শতাংশ। বিজ্ঞাপন বিপণনের একটি অংশ মাত্র। আর বিজ্ঞাপন যেহেতু পুরো প্রক্রিয়ায়ই ছড়িয়ে রয়েছে, ফলে এ খাতে ঠিক কত ব্যয় হয়, সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ১৯৫০ ও ৬০-এর সেই 'স্বর্ণালি সময়ে' উদ্বৃত্ত শোষণে বিক্রয়-প্রক্রিয়া ও সামরিক ব্যয়ের মধ্যে এক দারুণ সামঞ্জস্য দেখা যায়[২৭]।

বিপণনের এই অভূতপূর্ব বিকাশের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজির সংহতকরণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মূল্য প্রতিযোগিতার আর কোনো বালাই থাকল না, ওলিগোপলিক বাজারের খেলোয়াড়েরা নিজেদের মধ্যে দফারফা করে পণ্যের দাম নির্ধারণ করে। এ প্রক্রিয়ায় পণ্যের দাম শুধু একদিকেই প্রবাহিত হয়, মানে শুধু বাড়তেই থাকে, কমার কোনো ব্যাপার আর থাকে না। এই ওলিগোপলিক বাজারের প্রতিযোগিতার নামকরণ হয় 'একচেটিয়া প্রতিযোগিতা', এখানে প্রতিযোগিতা হয় বাজারের দখল নেওয়ার জন্য, দাম কমানোর মাধ্যমে সেটা হয় না, হয় বিক্রয় প্রচেষ্টার ওপর ভর করে। কল্যাণমূলক অর্থনীতিবিদ টিবর স্কিটভস্কি বলেন : 'বিজ্ঞাপনের এই সেক্যুলার বাড়বাড়ন্তের অর্থ হচ্ছে, মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া—মূল্যের প্রতিযোগিতা লোপ পাওয়া।' বারান ও সুইজির বিশ্লেষণ অনুসারে, 'মূল্য প্রতিযোগিতা' নাই হয়ে গেছে 'জনগণের অভ্যাসে নাড়া দেওয়ার জন্য'। এর ফলে 'নতুন নতুন বিক্রয় কৌশলের (অপচয়মূলক) উদ্ভব হয়েছে : বিজ্ঞাপন, পণ্যের চেহারা ও মোড়কে ভিন্নতা, পরিকল্পিত বিলোপ, মডেল পরিবর্তন, ঋণ প্রকল্প ও আরও হরেক রকম'[২৮]।

১৯৫০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞাপনের পেছনে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করেছে জেনারেল মোটরস। এই কোম্পানি পণ্যে ভিন্নতা ও মডেল পরিবর্তনের ধারা প্রবর্তন করে। এরা গাড়ির মডেলের মধ্যে সেকেলে হয়ে যাওয়ার



ব্যাপারটি নিয়ে আসে, মানসিকতার মধ্যেও তারা এ ব্যাপারটি নিয়ে আসে। অন্য গাড়ি নির্মাতারা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ে, লুটের ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়।

জেনারেল মোটরসের পর যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক মোড়কজাত পণ্যের বিপণনকারী ও বিজ্ঞাপন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রোক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল। এদের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে রয়েছে আইভরি, টাইড, ক্যামেই, অক্সিডল, ক্যাসেকড, কোমেট, জয়, লাভা ও আরও অনেক। এরাই প্রথম সফল আধুনিক ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা প্রচলন করে, এর শুরু হয়েছিল নেইল ম্যাকেলরয়ের বিখ্যাত এক অভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক মেমোর মাধ্যমে। এই ব্যক্তি ক্যামেই সাবানের বাজারজাত করতে গিয়ে দেখলেন, এটি তাদের কোম্পানিরই আইভরি সাবানের সম্পূরক পণ্য হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। এতে তিনি আহত হয়ে প্রস্তাব করেন, কোম্পানির প্রতিটি ব্র্যান্ডের জন্য আলাদা আলাদা বিপণন দল রাখা হোক, প্রতিটি ব্র্যান্ডকে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে বাজারজাত করা হবে। প্রতিটি পণ্যের জন্য পৃথক ভোক্তাকুল সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীকালে, প্রোক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ম্যাকেলরয় বিপণনের জন্য সোপ অপেরার দ্বারস্থ হন। বিজ্ঞাপনের জন্য সহায়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন তিনি, বিজ্ঞাপনের গল্প ও পণ্যের গুণাগুণ বারবার পুনরুক্তি করে ভোক্তার মাথায় পণ্যটি একপ্রকার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ভোক্তা খুঁজে বের করার জন্য কোম্পানিটি বাজার গবেষণা শুরু করে। পাশাপাশি ম্যাকেলরয় বৃহৎ পরিসরে 'ব্লু স্কাই' বৈজ্ঞানিক গবেষণা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার গবেষকেরা গ্রাহকদের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে নতুন ধারণা সৃজন ও পণ্য তৈরিতে একরকম স্বাধীন ছিলেন[২৯]।

১৯৫০-এর দশকে প্রোক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল বেসরকারি সম্প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠানের সমন্বয় ঘটিয়ে যে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করে, সেটাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন গণমাধ্যমব্যবস্থায় বাণিজ্যের জয়জয়কার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। হার্ব স্কিলার তাঁর গ্রন্থ মাস *কমিউনিকেশন অ্যান্ড এম্পায়ার*-এ লিখেছেন, '১৯২০-এর দশকে রেডিও থেকে শুরু হয়ে ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে টেলিভিশনের প্রসারের মাধ্যমে এই বৈদ্যুতিন মাধ্যমটি ব্যবসার হাতে চলে যায়, মানে 'জাতীয় বিজ্ঞাপনদাতাদের' হাতে চলে যায়...যোগাযোগের উন্নত মাধ্যমের ব্যবহার ও অন্যান্য সহায়ক আয়োজন যেমন : সমীক্ষা, ভোক্তাদের নির্দেশনা, উপদেশ প্রভৃতি বিকশিত পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে যায়...সংস্কৃতির এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যা এই বাণিজ্যের আওতার বাইরে[৩০]। সরকার তড়িঘড়ি করে বিনা পয়সায় আকাশতরঙ্গ করপোরেশনগুলোর হাতে তুলে দেয়। সরকারের করপোরেশনের স্বার্থরক্ষাকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়, নিয়ন্ত্রক নয়[৩১]।

## সমরশিল্প কমপ্লেক্স এবং আরপানেট

প্রোক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলে নয় বছর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ম্যাকেলরয় আইসেনহাওয়ারের নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর মনোনীত প্রতিরক্ষামন্ত্রী অ্যালাবামার রেডস্টোন আর্সেনাল সফরে ছিলেন। এটা ছিল সেনাবাহিনীর রকেট কর্মসূচির সূতিকাগার, তিনি সেখানে জার্মান দেশত্যাগকারী বিজ্ঞানী ওয়ের্নহার ভন ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এই ব্যক্তিকে আধুনিক রকেটবিজ্ঞানের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়—সোভিয়েত ইউনিয়ন রকেট স্পুটনিক বানিয়েছে, এমন খবর আসার পর যুক্তরাষ্ট্রও রকেট বানানো শুরু করে। তার পাঁচ দিন পর ম্যাকেলরয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, সেদিন ওয়াশিংটনের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাযুক্তিক উৎকর্ষের খবর। এক মাস পর সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পুটনিক-২ উৎক্ষেপণ করলে আইসেনহাওয়ার প্রশাসন আরও চাপের মধ্যে পড়ে যায়। ম্যানহাটান প্রকল্পের অন্যতম প্রবক্তা আর্নেস্ট ও. লরেন্সের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও করপোরেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের নিয়ে অগ্রসর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দেন। ১৯৫৭ সালের ২০ নভেম্বর তিনি প্রথমবারের মতো ক্যাপিটাল হিলে যান। সেখানে তিনি প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত সব গবেষণার জন্য একজন 'একক ব্যবস্থাপকের' প্রস্তাব দেন। সংস্থাটির প্রাথমিক কাজ হবে দূরপাল্লার রকেট, স্যাটেলাইট, মহাশূন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করা। সংস্থাটি চুক্তি করার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে, আর এর গবেষণার ক্ষেত্র হবে অসীম। ১৯৫৮ সালের ৭ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এই অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সির (আরপা) তহবিল অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন। সংস্থাটির প্রথম পরিচালক হিসেবে ম্যাকেলরয় বেছে নেন জেনারেল ইলেকট্রিকের ভাইস প্রেসিডেন্ট রয় জনসনকে।

এই আরপা শুরুতেই তার লক্ষ্য ঠিক করে ফেলে: মহাশূন্যের সামরিকায়ন, সারা দুনিয়ায় নজরদারির জন্য স্যাটেলাইট, যোগাযোগ স্যাটেলাইট, কৌশলগত ও কক্ষপথসংক্রান্ত অস্ত্রব্যবস্থা ও চন্দ্রাভিযান। তবে ১৯৫৮ সালে ন্যাশনাল অ্যারোনটিক অ্যান্ড স্পেস এজেন্সি (নাসা) গঠনের পর আরপা মহাশূন্যসংক্রান্ত বেসামরিক গবেষণার এখতিয়ার হারায় এবং ১৯৫৯ সালের মধ্যে সংস্থাটি মহাশূন্যসংক্রান্ত সামরিক কর্মসূচিও হারায়। একই সঙ্গে সংস্থাটির তহবিলও চলে যায় আর জনসন ইস্তফা দেন। অন্যদিকে, ম্যাকেলরয় আরপা বিলোপ না করে এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্লু স্কাই টেকনোলজি পরিচালনা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন। সশস্ত্র বাহিনীর সব শাখাকে স্থলাভিষিক্ত করে এ কাজ করা



হয়। পরবর্তীকালে এর নামকরণ হয় ডারপা (ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি-১৯৭২)। সংস্থাটি ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী রকেট নির্মাণে কাজ করে। কক্ষপথসংক্রান্ত গবেষণায় এটা জিপিএস বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের পূর্বসূরি। শুরুর দিকে এটা সত্যি এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল। প্যাকেট সুইচিং ডিজিটাল যোগাযোগ-প্রযুক্তির সঙ্গে এটা সম্পর্কিত ছিল। এর পেছনে রয়েছে রান্ড করপোরেশনের প্রকৌশলী পল বারানের অন্তর্দৃষ্টি। ১৯৮০-এর দশকে ডারপা দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধের প্রস্তুতিতে তেল-জল জোগায়—এটা ছিল রোনাল্ড রিগ্যানের তারকা যুদ্ধ। ১৯৯০ ও ২০০০-এর শুরুর দিকে এনএসএর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডিজিটাল নজরদারির প্রযুক্তি বিকাশে গবেষণা করে সংস্থাটি, সামরিক ড্রোন প্রযুক্তি তৈরির কাজেও তারা এ সময় হাতে নেয়[৩২]।

১৯৬১ সালে জ্যাক পি. রুইনাকে আরপার তৃতীয় পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাঁর আমলেই প্রতিষ্ঠানটি কম্পিউটার গবেষণায় শীর্ষে উঠে আসে। রুইনা বিমানবাহিনীর কাছ থেকে একটি বিশাল কিউ-৩২ বিমান কেনেন, তার গবেষকেরা এটা নিয়ে সামরিক কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোলবিষয়ক গবেষণা শুরু করেন। রুইনা এমআইটির জে সি আর লিকলিদারকে আরপার কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল ও আচরণবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন। লিকলিদার সে দেশের সেরা কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করে নেটওয়ার্কভিত্তিক আন্তসম্পর্কিত কম্পিউটারের ধারণা প্রবর্তন করেন। এর ফল হিসেবে ১৯৭০-এর দশকে আরপানেটের উদ্ভব হয়, যেটা আজকের যুগের ইন্টারনেটের অগ্রদূত।

আরপা ছিল আইসেনহাওয়ার প্রশাসনের ফসল, এর পাশাপাশি ট্রুম্যান ও আইসেনহাওয়ারের জামানায় আরও অনেক প্রতিরক্ষা এজেন্সির সৃষ্টি হলেও এটা ছিল সেই বর্ধিষ্ণু সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স যুগের বৈজ্ঞানিক-প্রাযুক্তিক উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দু। ম্যাকেলরয়ের প্ররোচনায় ও আইসেনহাওয়ারের নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত-অধিকৃত মহাশূন্যে ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান পাঠায়, যদিও সোভিয়েতরা ১৯৬০ সালে এটা ভূপাতিত করে। একই সঙ্গে ইন্দোচীন ও অন্যান্য স্থানে পাল্টা গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু করে[৩৩]। আইসেনহাওয়ারের সামরিক নীতি ছিল সম্প্রসারণমূলক। তবুও ১৯৬১ সালের ১৭ জানুয়ারি আইসেনহাওয়ারের বিদায়ী ভাষণে তাঁর সৃষ্টিবিষয়ক দ্বিতীয় চিন্তা, অনিশ্চয়তা, দোদুল্যমানতা ও এমনকি ভয়ের আভাসও পাওয়া যায়। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বলেন, 'আমরা এক বিরাট ও স্থায়ী অস্ত্রশিল্প নির্মাণ করেছি...সে খাতে আমাদের বার্ষিক ব্যয় যুক্তরাষ্ট্রের করপোরেশনগুলোর ব্যয়ের চেয়ে বেশি।' তিনি তাড়া দিয়ে বলেন, 'সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স যাতে দেশের ভেতরে মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবশালী হয়ে না ওঠে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।' তাঁর কণ্ঠে শঙ্কার নিনাদ শোনা যায়, আমাদের

সমাজ 'বৈজ্ঞানিক-প্রাযুক্তিক অভিজাতদের দাসে পরিণত হতে পারে'। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে 'অর্থের সর্বময় ক্ষমতা' সবকিছুই গ্রাস করে নিয়েছে।

আইসেনহাওয়ারের এই সতর্কবার্তা সুচিন্তিতভাবেই ছিল ভাসা ভাসা। তিনি 'সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স' বিষয়টির কোনো সংজ্ঞা দেননি, শুধু তাঁর বক্তব্যে সেটা একবার উচ্চারণ করেছেন মাত্র। তার পরও তাঁর মন্তব্যে সামরিক-প্রাযুক্তিক-করপোরেট শিল্পবিষয়ক আভাস পাওয়া যায়, ১৯৪৬ সাল থেকে শুরু করে এ শিল্প নির্মাণে তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছেন। আর তাঁর আমলে এ শিল্পের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধন হয়েছে। ১৯৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরে যে বৈদ্যুতিন যন্ত্র কেনাবেচা হয়েছে, তার ৫৬ দশমিক ২ শতাংশের খরিদ্দার ছিল সামরিক খাত ও সংশ্লিষ্ট বেসামরিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান[৩৪]।

## ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ নজরদারি

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সবচেয়ে বেশি হারে ঘটেছে ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে, প্রায় শতভাগ কর্মসংস্থান হয়েছে এ সময়ে। আবার ভিয়েতনাম ও কোরীয় যুদ্ধও এ সময়েই যুগপৎভাবে সংঘটিত হয়েছে। 'কমিউনিজম ঠেকাও' এবং 'মুক্ত দুনিয়া রক্ষা'র নামে এসব যুদ্ধ হলেও এর আসল উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদ ও মার্কিন আধিপত্য বজায় রাখা। এই দুটোই সে সময় হুমকির মুখে পড়লে যুক্তরাষ্ট্র এ পথ বেছে নেয়। মূলত সাম্রাজ্যের ভূরাজনীতি ও শীতল যুদ্ধের কারণে এসব যুদ্ধ সংঘটিত হলেও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি এর অন্যতম কারণ, পুরো অর্থনীতিই এর ফলে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। প্রভাবশালী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তির যুপকাষ্ঠে সেটা বিনষ্ট হয়নি, বরং তা ক্ষমতালোভী অভিজাতদের হিসাবের খাতায় ঢুকে যায়।

এরূপ সামরিক-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজি আহরণের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শুধু বহিঃস্থ শত্রুই নয়, অনেক 'অভ্যন্তরীণ শত্রু'ও জুটে যায়। এদের মধ্যে পুঁজিবাদ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি যেমন রয়েছে, তেমনি সমাজের নানা রকম ধ্বংসাত্মক শক্তিও রয়েছে।

১৯৫০-এর দশকের শেষে ও ৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠে, পরবর্তীকালে যা ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে মোড় নেয়। ফলে রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর সামরিক ও আধা সামরিক (গোপন পুলিশ) নজরদারি ব্যাপক হারে বাড়ায়ুং। ১৯৭০-৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে 'আর্মি ফাইলস' কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়। জানা যায়, সেনাবাহিনী দেশটির লাখ লাখ মানুষের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে এবং এমনকি তাদের সম্পর্কিত বিশেষ তথ্যসারণিও প্রস্তুত করেছে। এসব নথি মেরিল্যান্ডে অবস্থিত হোলাবার্ড দুর্গে একটি ইস্পাত-নির্মিত



কক্ষে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, যেটাকে বলে ইনভেস্টিগেটিভ রেকর্ডস লাইব্রেরি। এটির উচ্চতা ছিল দোতলার সমান, লম্বায় অর্ধেক ব্লকের সমান। এসব নথির সঙ্গে স্যাটেলাইট ফাইল ও একটি 'বিরাট নাশকতামূলক ফাইল' ছিল সেখানে, এতে নাগরিক অধিকার ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের তথ্য ছিল। আরও সাধারণভাবে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও সেনাবাহিনীর মধ্যকার বিরোধিতাকারীদের তথ্য ছিল। সেনাবাহিনী ১৯৬৭ সালে একটি গোপন জাতীয় টেলিটাইপ সেবার নির্মাণকাজ সমাপ্ত করে, এর মাধ্যমে জনগণসংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য দ্রুত বিনিময় করা সম্ভব হয়।

কাউন্টার ইনটেলিজেন্স অ্যানালাইসিস ব্রাঞ্চের দায়িত্ব ছিল একটি বিশাল তথ্যবিবরণী তৈরি করার। নজরদারির ফাইল থেকে এতে তথ্য যুক্ত করা হয়; লক্ষ্য ছিল এসব তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করার। ১৯৬৮ সালের ওয়াশিংটন অভিমুখে গরিব মানুষের মিছিল হয়েছিল, এতে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নজরদারি করা হয়। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের কবরে যাওয়া মানুষ, কালো জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক সংগঠন কেউই এই নজরদারির বাইরে ছিল না। সেনাবাহিনীর এক হাজার ৫০০ সাদাপোশাকের গোয়েন্দা ছিল। তারা ৩০০ কার্যালয়ে বিন্যস্ত হয়ে কাজ করত[৩৫]।

সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা ফাইলবিষয়ক কংগ্রেসের তদন্তে সেনা কর্তৃপক্ষ বলেছে, নাশকতামূলক কাজের ফাইলসহ এসব ফাইল ধ্বংস করা হয়েছে। পরে দেখা গেল, এসব ফাইল আরপানেটের মাধ্যমে এনএসএকে সরবরাহ করা হয়েছে। এটি এক বিশেষ ধরনের নেটওয়ার্ক, এর মাধ্যমে ৫০টি সরকারি সংস্থা পরস্পর যুক্ত রয়েছে। এই নেটওয়ার্কের অর্থায়ন করেছে ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি (আরপা)...গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, এসব তথ্য মেরিল্যান্ডের ফোর্ট মিডে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির (এনএসএ) সদর দপ্তরে সংরক্ষিত রয়েছে। সেনা ফাইলগুলো ১৯৭২ সালে আরপানেটে স্থানান্তর করা হয়েছে, অর্থাৎ এসব ধ্বংস করার আদেশ দেওয়ার দুই বছর পর—এর সঙ্গে সেনাবাহিনীর ফোর্ট হোলাবার্ডের ব্যবস্থাপনায় যেসব তথ্য ছিল, সেগুলোও ধ্বংসের আদেশ দেওয়া হয়েছিল[৩৬]।

বহু মার্কিন এই প্রথমবারের মতো জানতে পারে যে আরপানেট বলে কিছু একটা আছে। ১৯৭০-এর দশকেই এনএসএ যুক্তরাষ্ট্রে নজরদারির অংশ হিসেবে প্রথম যুগের প্রোটো ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে বলে জানা যায়। এই উদ্ভাবনের হুলে বিদ্ধ হয়ে সিনেটর স্যাম আরভিন ১৯৭৫ সালে এমআইটিতে একটি ভাষণে বলেন, কম্পিউটারের কারণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন হুমকির মুখে পড়েছে, এই যন্ত্রে 'বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং বিদ্যুৎ-গতিতে তা নিয়ে নেওয়া

যায়'[৩৭]। সেনাবাহিনীর এই জনগণ ও ডেটাবেইসে নজরদারির ঘটনায় সিনেট যে তদন্ত করে, তাতে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক আর্থার আর. মিলার সাংবিধানিক অধিকারসংক্রান্ত সিনেট উপকমিটির সামনে ঘোষণা করেন, এতে সভাপতিত্ব করেন আরভিন :

যখন কোনো ব্যক্তি কর রিটার্ন দাখিল করে বা ক্রেডিট কার্ড ও জীবন বিমার আবেদন করে, সরকারি সেবাপ্রাপ্তি ও চাকরির আবেদন করে, তখন তার নামে একটি তথ্যসারণি খোলা হয়, তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। ব্যাপারটা এখন এমন পর্যায়ে গেছে যে, কোনো বিমান সংস্থার টিকিট কাটলে বা জাতীয় হোটেল চক্রের কোথাও ঘর ভাড়া করলে বা গাড়ি ভাড়া করলে সেই ব্যক্তির তথ্য কম্পিউটারে জমা হয়ে যায়। এসব তথ্য বিশ্লেষণ ও সারণি করলে সেই ব্যক্তির তৎপরতা, অভ্যাস ও সম্পৃক্ততা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব। খুব কম মানুষই আছে, যারা আধুনিক প্রযুক্তির এই নজরদারির ক্ষমতাবিষয়ক ধারণা রাখে। ফলে এমন ভীতির সম্ভাব্যতা মোটেও অমূলক নয় যে প্রত্যেক মার্কিনের ভ্রূণ থেকে কবর পর্যন্ত তথ্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হাতে রয়েছে।

মার্কিন নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যসংক্রান্ত হুমকি যতই বাড়ুক না কেন, অধিকাংশ মার্কিনই জানে না ফেডারেল সংস্থা ও বেসরকারি কোম্পানিগুলো কীভাবে এই কম্পিউটার ও মাইক্রোফিল্ম প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিকদের সম্পর্কে কী পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় করছে। এমন কোনো দিন নেই যে সেদিন একটি না একটি তথ্য ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এ বছরের শুরুতে জানা যায়, মার্কিন সেনাবাহিনী কিছু সময়ের জন্য আইন সিদ্ধ রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর ওপর সুনির্দিষ্টভাবে নজরদারি করছে [৩৮]।

১৯৭০-এর দশকে এফবিআই কীভাবে ব্যাপক নজরদারি চালিয়েছে ও আন্দোলন ধ্বংস করেছে সেটাও আমরা জানি, কইনটেলপ্রো (কাউন্টার ইনটেলিজেন্স প্রোগ্রামের আদ্যক্ষর)। জে. এডগার হুভারের নেতৃত্বে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এফবিআই ব্যাপক নজরদারি ও অবৈধ তৎপরতা চালিয়েছে—বলপূর্বক প্রবেশ, জালিয়াতি, উসকানিমূলক কাজ, অবৈধ গ্রেপ্তার ও সহিংসতা প্রভৃতি। ইতিপূর্বে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তারা যেভাবে লেগেছে, ঠিক সে কায়দায় তারা তখন ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠী, সমাজতান্ত্রিক সংগঠন, নাগরিক অধিকার নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও নিউ লেফট ওয়ার ক্রিটিকদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে। এফবিআইয়ের কাছে এসব ছিল 'যুক্তিসিদ্ধ', বিশেষ করে সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি কোনো নির্বাচনে প্রার্থী দিলে আর তিনি 'ক্যাস্ট্রোর কিউবা এবং...দক্ষিণের অন্তর্ভুক্তিকরণ'-এর সমর্থন দিলে এই নিপীড়ন বৈধতা পেয়ে যায়।



অন্যদিকে, নিউ লেফট গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে এই ভিত্তিতে যে তারা সাধারণভাবে বিপ্লব এবং 'ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতনের ডাক দেয়'[৩৯]।

'মিনারেত' সংকেত নামের অধীনে জনসন ও নিক্সন যুগে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধ সমালোচকদের বৈদ্যুতিন যোগাযোগে নজরদারি করা হতো, এদের মধ্যে এক হাজার ৬০০ নাগরিকও ছিল—এদের এনএসএর নজরদারির তালিকায় রাখা হয়েছিল। যে ব্যক্তিবর্গকে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল তাঁরা হলেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, হুইটনি ইয়ং, এলড্রিজ ক্লিভার, স্টোকলি কারমাইকেল, জেন ফন্ডা, টম হেইডেন ও মোহাম্মদ আলী। এর বাইরে এনএসএর নজরদারির তালিকায় ক্ষমতকাঠামোর বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ছিলেন, যেমন সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চ ও হাওয়ার্ড বেকার, *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর কলামিস্ট টম উইকার ও *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর কলামিস্ট আর্ট বুচওয়াল্ড। এনএসএর এই প্রজেক্ট 'মিনারেত' ও কইনটেলপ্রো ফাঁস হয়ে গেলে ফরেন ইনটেলিজেন্স সারভেলেন্স অ্যাক্ট, ১৯৭৮ প্রণয়ন করা হয়। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের জনগণের ওপর নজরদারি করার ক্ষমতা সীমিত করা হয়[৪০]।

১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে এনএসএ তার কোড নামের প্রকল্প একিলন ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে শুরু করে। এর লক্ষ্য ছিল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরিচালিত বেসামরিক টেলিযোগাযোগ নজরদারিতে রাখা। উইলিয়াম ব্লাম ২০০৫ সালে তাঁর *রগ স্টেট* গ্রন্থে বলেন, 'একিলন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ যোগাযোগ নজরদারির আওতায় আনা হয়, আর কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে তা চিহ্নিত করা হয়। এমনকি অপরিচিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় মেসেজও আহরণ করা হয় সেখান থেকে। এর মধ্যে ছিল দূতাবাসের আলাপচারিতা, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, যৌনালাপ, জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রভৃতি। মূল শব্দ দিয়ে এসব মেসেজ খোঁজ করা হয়েছে, তাদের কাছে যা প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছে।' ইংল্যান্ডে এনএসএর যে লিসেনিং বেস আছে তার পরিধি ৫৬০ একর। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও এনএসএ বিভিন্ন করপোরেশনের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করেছে, চুরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। ১৯৯৪ সালে সিআইএ ও এনএসএর কল্যাণে ইউরোপীয় এয়ারবাস শিল্প লাভজনক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হারায়, যা আবার দখল করে নেয় মার্কিন কোম্পানিগুলো।

## ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন, তথ্য মাইনিং ও সাইবার যুদ্ধ

ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর মার্কিন অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেয়। ফলে এক দীর্ঘমেয়াদি অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় সেখানে। প্রবৃদ্ধি কমে যায়, বেকারত্ব ও কর্মহীনতা বেড়ে যায়[৪২]। সামরিক ব্যয় ও ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-ভিত্তিক বিক্রয় প্রচেষ্টার কারণে

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে অর্থনীতিতে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত হজম করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে এসে তার সেই কার্যকারিতা কমে যায়, যদিও এ সময় ভোক্তা ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় (ক্রেডিট কার্ডসহ)। কৃত্রিমভাবে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়েও লাভ হয়নি বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রিগ্যান যে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তাতেও কাজ হয়নি। রিগ্যান কার্যত একটি সামরিক কেইনসবাদ চালু করেছিলেন। করপোরেশন ও ধনীদের কর কমিয়েছিলেন তিনি, আর সামরিক ব্যয় বাড়িয়েছিলেন। এর মধ্যে আছে তাঁর সেই ব্যয়বহুল ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী স্টার ওয়ার্স কর্মসূচি, এতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছে ডারপা। শ্রমিক ইউনিয়ন, মজুরি ও শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় কমানো হয়, দরিদ্রদের অবস্থা আরও খারাপ হয় আর চালু হয় নব্য উদারবাদের যুগ।

রিগ্যান যুগের যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের যুদ্ধ তৎপরতার পরিসর ও গোয়েন্দা তৎপরতার ওপর ক্ষণিকের জন্য আলো ফেলা হয়, ইরান-কন্ট্রা সম্পর্কের বিষয়টিও জনসমক্ষে চলে আসে। এর ফলে ১৯৯০ সালের ৭ আগস্ট রিগ্যান আমলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অ্যাডমিরাল জন পয়েনডেক্সটারকে পাঁচ দফা কংগ্রেসের কাছে মিথ্যা বলা ও ইরান-কন্ট্রা সম্পর্কবিষয়ক কংগ্রেস কমিটির তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে অবৈধভাবে ইরানের কাছে অস্ত্র বিক্রি। এর মাধ্যমে কন্ট্রা বিদ্রোহীরা নিকারাগুয়ার সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর অর্থ জোগাড় করত (এই রায় পরবর্তীকালে অবশ্য বদলে যায়)।

একই সঙ্গে এই পয়েনডেক্সটার আরেকটি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ধরা পড়েন। রিগ্যানের স্বাক্ষর করা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডেসিশন ডিরেকটিভ-১৪৫ (এনএসডিডি) প্রণয়ন করার কারণে তিনি আটক হন। এই এনএসডিডি-১৪৫-এর হাতে যুক্তরাষ্ট্রের সব ডেটাবেইসের নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা, এর মাধ্যমে তারা সে দেশের সব ব্যক্তিগত কম্পিউটারে তল্লাশি করে 'চাঞ্চল্যকর কিন্তু অশ্রেণিকৃত' তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে—এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ফলে এনএসএ কম্পিউটার জগতের সম্রাটে পরিণত হয়। বেসরকারি খাতের প্রতিবাদ ও ইরান-কন্ট্রাবিষয়ক বিতর্কের কারণে এই এনএসডিডি-১৪৫ প্রত্যাহার করা হয়। কিছু সময় পর সিনটেক নামের একটি বেসরকারি ফার্মে কাজ করে ২০০২ সালে পয়েনডেক্সটার আবারও দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন। তিনি ডারপার হেড অব দি ইনফরমেশন অ্যাওয়ারনেস অফিসের প্রধান হিসেবে কাজ শুরু করেন। এর কাজ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য টোটাল ইনফরমেশন অ্যাওয়ারনেসের (টিআইএ) প্রাযুক্তিক ভিত্তি নির্মাণ করা। এ কাজ করার দায়িত্ব ছিল এনএসএর। লক্ষ্য ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সব মানুষের ডিজিটাল যোগাযোগ জড়ো করে তা বিশ্লেষণ করা। খোদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাষ্যে, এটা 'ভার্চুয়াল সেন্ট্রালাইজড গ্র্যান্ড ডেটাবেইস, সব বৈদ্যুতিন



যোগাযোগের তথ্য এতে থাকবে। টিআইএ কর্মসূচির একটি বড় ঠিকাদার ছিল বুজ অ্যালেন হ্যামিল্টন, এটি একটি বৃহৎ প্রতিরক্ষা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। বুজ অ্যালেনের গোয়েন্দা ব্যবসার প্রধান মাইক ম্যাককনেল (জর্জ এইচ ডব্লু বুশের জামানার এনএসএ পরিচালক ও পরবর্তীকালে জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলে ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্সের পরিচালক) পয়েনডেক্সটারের একজন ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। কংগ্রেসে ২০০৩ সালে এ কর্মসূচিতে অর্থায়ন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এর নামকরণ করে টেররিজম ইনফরমেশন অ্যাওয়ারনেস। লক্ষ্য ছিল, এটা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ কর্মসূচির আওতায় একটি অনলাইনভিত্তিক ফিউচার ট্রেডিং শুরু হয়েছিল, যেখানে সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে অনুমান করা হয়েছিল আর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল পয়েনডেক্সটার ও টিআইএর[৪৩]।

যদিও রিগ্যান জামানার বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যাপার হচ্ছে নব্য উদারনীতিক ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন, এ প্রপঞ্চটি যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের তকমাও ছাপিয়ে ওঠে। উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের ভাষায় 'প্রকৃত অর্থনীতি' বিনিয়োগের জন্য ততটা লাভজনক না হওয়ায় বিপুল পরিমাণ পুঁজি ফিন্যান্সের আবছায়ার জগতে প্রবেশ করে। আর ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে বিদেশে এত পরিমাণ ডলার পড়ে ছিল যে তা থেকে মুনাফা করার সুযোগও ছিল অনেক কম। ফলে তাকে দেশের ভেতরেই নতুন কোনো বিনিয়োগ ক্ষেত্র তৈরি করতে হতো। পুঁজির এ ডাকে সাড়া দিল যুক্তরাষ্ট্রের ফিন্যান্স জগৎ, তারা নানা রকম ফিউচার, অপশন ও ডেরিভেটিভ তৈরি করল, যেখানে বিনিয়োগ করা ছিল অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো। তারপর মার্কিন ও বৈশ্বিক অর্থনীতি এক স্পেকুলেশনের খেলা দেখাল। ডেবট লিভারেজে পরিবর্তন দেখা গেল, ফিন্যান্সিয়াল করপোরেট ঋণ ধাই ধাই করে বাড়তে শুরু করল। ১৯৭০ সালে এর পরিমাণ ছিল মার্কিন জিডিপির ১০ শতাংশ, ১৯৯০ সালে তা দাঁড়াল ৪০ শতাংশে। তারপর এর পরিমাণ আরও বাড়ল[৪৪]। এটা শুধু নির্ধারিত বিনিয়োগে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগ হলো (মূলত ব্যবসায়িক কাঠামো ও কম্পিউটার) বা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলল না, এটা আর্থিক পরিসম্পদের যে সন্দেহজনক বাড়বাড়ন্ত ঘটাল, তাতে একটি শ্রেণি প্রকৃত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াই বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক বনে গেল। এর একটি বড় অংশ বিলাসপণ্য ক্রয়ে বিনিয়োগ হলো, ফলে উদ্বৃত্ত যেমন বিনিয়োগ হলো, তেমনি অর্থনীতিতেও তেজি ভাব দেখা গেল।

সেই ১৯৮৩ সালেই *মান্থলি রিভিউয়ে* 'প্রোডাকশন অ্যান্ড রিভিউ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে হ্যারি ম্যাগডফ ও পল এম. সুইজি এই অতিকায় পালবদলের কাহিনি বয়ান করেছেন। অর্থাৎ উৎপাদন থেকে আর্থিক খাতের ওপর অর্থনীতির নির্ভরশীলতা।

ফলাফল হচ্ছে, অর্থনীতি দৃশ্যত আর্থিক খাতে সৃষ্ট বুদবুদের ওপর চিরতরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই অর্থনীতি স্থিতিশীল নয়, আর এর প্রকৃতি পরজীবীর মতো। সব সময়ই ভয় থাকে, আর্থিক খাত ধসে পড়বে। আর তাকে এসে উদ্ধার করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এই ভঙ্গুর খাত জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করাতে হর-হামেশাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হয়। সুইজি পরবর্তীকালে এর নামকরণ করেন, 'পুঁজি সংগ্রহের প্রক্রিয়ার ফিন্যান্সিয়ালাইজেশন'[৪৫]।

অ্যালান গ্রিন্সপ্যান ১৯৮৭ সালে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর দুই দশক ধরে এই ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া তদারক করেন। তিনি বাজারও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন। এসব কারণে ওয়াশিংটনে ওয়াল স্ট্রিটের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সরকারের উচ্চ মহলে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে উৎপাদকেরা যে স্বাধীনতা ভোগ করেছেন, তার চেয়েও বেশি প্রতিপত্তি ছিল তাদের[৪৬]।

দ্রুতগতির কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কারণেও ফিন্যান্সিয়ালাইজেশনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। নব্য বিকশিত সন্দেহমূলক বাজারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় এই কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। এই প্রক্রিয়ার কারণে নজরদারি পুঁজিবাদের ধারণা আরও হৃষ্টপুষ্ট হয়। বিজ্ঞাপন ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য তারও তথ্যের চাহিদা ছিল অমিত। এর লাভজনক সম্প্রসারণের জন্য গৃহঋণের মর্টগেজের নিরাপত্তা, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য বিমা ও পেনশন তহবিলের বৃদ্ধি, ছাত্রঋণ ও ব্যক্তিক ফিন্যান্সের প্রসার প্রয়োজন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়। ক্রিস্টিয়ান প্যারেন্টি ১৯৯১ সালে লিখিত গ্রন্থ *দ্য সফট কেজ*-এ বলেছেন, এসব ফাইন্যান্স পণ্য বিক্রয়ের জন্য আমাদের জীবনের ডিজিটাল ফাইল তৈরি হয়, যার স্থান হয় করপোরেট তথ্য ভান্ডারে[৪৮]। ২০০০ সালে মাইকেল ডসন *দ্য কনজ্যুমার ট্র্যাপে* বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব বড় করপোরেশন বিশাল তথ্যভান্ডার তৈরি করেছে, এরা আবার মাইনিংয়ের সঙ্গেও জড়িত। 'সিমেট্রিক্যাল রিসার্চ উন্নত বিশ্লেষণাত্মক সমাধান দেওয়ার বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তারা তাদের করপোরেট গ্রাহকদের দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত তথ্য বিশ্লেষণ দলের মাধ্যমে সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তারা ৩৫ টেরাবাইট মাস্টার কার্ড তথ্যেও পরিসংখ্যানগত সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। টেরাবাইট হচ্ছে কম্পিউটারে সংরক্ষিত এক ট্রিলিয়ন ইউনিট কম্পিউটার তথ্য'[৪৯]।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বৃহৎ তথ্য ব্রোকার বিপণন জগতের মহিরুহ অ্যাক্সিকমের ২৩ হাজার কম্পিউটার সার্ভার রয়েছে, তারা বছরে ৫০ ট্রিলিয়ন তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে। তারা ২০ কোটি মার্কিনের ওপর গড়ে এক হাজার ৫০০ তথ্য পয়েন্ট



সংরক্ষণ করে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তারা একটি 'ডিজিটাল ডসিয়ার' সংরক্ষণ করে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ১৩ সংখ্যার একটি কোড তৈরি করেছে তারা। ফলে সেসব ব্যক্তি যেখানেই যাক না কেন, তারা তাদের অনুসরণ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংক্রান্ত অনলাইন ও অফলাইন তথ্যের মেলবন্ধন ঘটায় তারা। অধিকাংশ তথ্যই এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সংগৃহীত হয়, যেমন ফেসবুক। অ্যাক্সিকম এসব তথ্য গুছিয়ে 'প্রিমিয়াম প্রোপ্রাইটারি বিহেভিয়ারাল ইনসাইট' তৈরি করে। যাপিত জীবনের ধরনের ওপর ভিত্তি করে ৭০টি গুচ্ছ প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এর মধ্যে যেকোনো একটিতে ফেলা হয়। এটা করতে শ্রেণি, খরচের অভ্যাস, ভৌগোলিক অবস্থান-প্রভৃতি মানদণ্ড বিবেচনায় আনা হয়। অ্যাক্সিকম এসব তথ্য তার ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে। তার ক্রেতাদের তালিকায় আছে শীর্ষ ক্রেডিট কার্ড প্রদানকারী শীর্ষ ১৫টি কোম্পানির শীর্ষ ১২টি প্রতিষ্ঠান, শীর্ষ ১০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাতটি, শীর্ষ ১০টি বিমা কোম্পানির পাঁচটি, শীর্ষ ১০টি ব্রোকারেজ ফার্মের ছয়টি, শীর্ষ ১০টি মিডিয়া/টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানির আটটি, শীর্ষ ১০টি খুচরা বিক্রেতার সাতটি, শীর্ষ ১৪টি গাড়ি নির্মাতার ১১টি ও শীর্ষ ১০টি ওষুধ প্রস্তুতকারকদের তিনটি। এর ক্রেতাদের তালিকায় আরও আছে যুক্তরাষ্ট্রের ১০০টি শীর্ষ করপোরেশনের প্রায় অর্ধেক প্রতিষ্ঠান।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে অ্যাক্সিকম এফবিআই, পেন্টাগন ও হোমল্যান্ডের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করছে, তাদের সম্পর্ক বেশ নিবিড়। ২০০১ সালে অ্যাক্সিকম জেনারেল ওয়েসলি ক্লার্ককে তাদের পরিচালনা পর্ষদে নিয়োগ দেয়। এই ব্যক্তি ইউরোপে ন্যাটোর প্রধান কমান্ডার। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অ্যাক্সিকম তাঁকে আট লক্ষ ডলার দেয়। এই ক্লার্কের মাধ্যমে অ্যাক্সিকম পয়েনডেক্সটারের ডারপা-ভিত্তিক টিআইএর সঙ্গে কাজ শুরু করে, যার লক্ষ্য ছিল মার্কিন ও সারা দুনিয়ার জনগণের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য প্রাযুক্তিক ভিত তৈরি করা[৫০]।

সিবিএসের সিক্সটি মিনিটস ২০১৪ সালের মার্চে জানায়, *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর ওয়েবক্ষেত্রে ঢোকা মানে আরও ডজন খানেক তৃতীয় পক্ষকে নিজের গতিবিধি নজরদারি করার সুযোগ করে দেওয়া। যারা স্মার্টফোনে 'ব্রাইটেস্ট ফ্ল্যাশ লাইট' বিনা মূল্যে ডাইনলোড করে ব্যবহার করছে, তারা জানেই না যে এর মাধ্যমে ওই কোম্পানিকে তাদের গতিবিধি অনুসরণ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। আইফোনের অ্যাপ 'পাথ সোশ্যাল' ব্যবহারকারীদের ছবি বিনিময় করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি হলেও এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর সব তথ্য চুরি হচ্ছে। ডেটা ব্রোকার ফার্ম এপসিলনের কাছে বিপণন তথ্যসারণি আছে, যেখানে আট

বিলিয়নের অধিক ভোক্তা লেনদেনের তথ্য রয়েছে। অনুরূপ আরেকটি প্রতিষ্ঠান চয়েজপয়েন্টের কাছে ব্যবসা ও ব্যক্তির ১৭ বিলিয়ন রেকর্ড আছে, তারা এখন ডেটার মহিরুহ এলসেভিয়ারের অংশ। এসব তথ্য তারা ১০ হাজার ক্রেতার কাছে বিক্রি করেছে, তাদের মধ্যে সরকারি অনেক এজেন্সিও আছে[৫১]।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও এভাবে তথ্য বিক্রি করে থাকে। *ফোর্বস* ম্যাগাজিন ২০১৩ জানায়, 'কোম্পানি ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের জীবনের নানা দিকের তথ্য সংগ্রহ করে বিনা বাধায় সেগুলো যেকোনো কারও কাছে বিক্রি করতে পারে।' যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এরূপ তথ্য বিক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। তার পরও *ফোর্বস* জানিয়েছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ভোক্তাদের তথ্য নানাভাবে বিক্রি করে থাকে। এর মধ্যে অন্তত ২৭ শতাংশ ক্ষেত্রে আইনি নিয়ন্ত্রণের কোনো তোয়াক্কাই করা হয় না[৫২]।

ফিন্যান্সিয়ালাইজেশনের জন্য জীবনের সব ক্ষেত্রে অর্থের অনুপ্রবেশ দরকার। আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন, তথ্য নিয়ন্ত্রণও জরুরি। অর্থনীতি আর্থিক খাতের ওপর অধিক হারে নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় যেকোনো সময় তা ধসে পড়তে পারে। ফলে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকিও বেড়েছে আর তা হ্রাস করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তথ্য গোপন রাখা ও তার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে।

আজকের দুনিয়ায় জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক খাত ও সামরিক ব্যবস্থা। সাইবার যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্যবস্তুও হচ্ছে আর্থিক খাত। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিচালক ম্যাককনেল প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে বলেছিলেন, 'নাইন-ইলেভেনের হামলাকারীরা যদি এই বিমান হামলা না করে সে দেশের কোনো একটি ব্যাংককে লক্ষ্য করে সাইবার হামলা চালাত, তাহলে মার্কিন অর্থনীতির জন্য তা আরও বেশি ক্ষতিকর হতো।' যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব ট্রেজারি হেনরি পলসন তা স্বীকারও করেছিলেন। বুশ এতে এতটাই সতর্ক হয়ে যান যে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ন্যাশনাল সাইবার নিরাপত্তা পদক্ষেপ (২০০৮) গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ ইন্টারনেট ব্যবস্থার ওপর এনএসএর নজরদারির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ধারাবাহিকতায় ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে একটি ডেটা কেন্দ্র নির্মিত হয়[৫৩]। ওবামার প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিও পানেটা হুঁশিয়ারি করে দিয়েছেন, মার্কিন আর্থিক খাতে সাইবার হামলা চালানো হলে তা হবে 'পরবর্তী পার্ল হারবারের' শামিল। ২০১১ সালের জুলাই মাসে ওবামা এক নির্বাহী আদেশ জারি করেন, আন্তদেশীয় অপরাধী সংগঠনগুলো তাদের দেশের আর্থিক বাজারে ঢুকলে তা হবে জাতীয় জরুরি অবস্থার শামিল। সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান সিম্যানটেক ২০১০ সালে জানায়, জনগণকে আর্থিক তথ্য দেওয়ার জন্য যে তথ্য সংগ্রহ অভিযান



চালানো হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল আসলে আর্থিক খাত, ব্যক্তি নয়।

ব্যক্তি পর্যায়ের হ্যাকিং ছাড়াও পুরো ব্যবস্থার ওপর হামলারও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০১০ সালের ৬ মে স্টক বাজারের হঠাৎ পতনের পেছনেও এ রকম কিছু থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হ্যাকাররা ক্ষতিকর কোড ব্যবহার করে পুরো নেটওয়ার্ক ধসিয়ে দিতে পারে, তারা লাখো কম্পিউটারের বটনেট ও রোবটিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে। *ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট*-এর সম্পাদক মর্টিমার জাকারম্যান বলেছেন, ডিজিটাল ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক, যেকোনো সময় এর ওপর হামলা হতে পারে: 'গড়ে একটি ম্যালওয়্যারের (আক্রমণাত্মক) ১৭৫ লাইন কোড থাকে, সেগুলো পাঁচ থেকে ১০ মিলিয়ন কোড লাইন ব্যবহার করে প্রতিরক্ষা সফটওয়্যার আক্রমণ করতে পারে'। মার্কিন/ইসরায়েল নির্মিত 'স্টাটনেক্স' পোকাটি ইরানকে উদ্দেশ্য করে ছাড়া হয়েছিল, যেগুলো ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রাভিমুখী ব্যবস্থায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, সাইবার যুদ্ধ কত নিখুঁতভাবে চালানো যায়, এর ক্ষতির পরিমানই বা কত বড়[৫৫]।

## ইন্টারনেট ও একচেটিয়া পুঁজি

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিরক্ষা বাজেট পেত বা যাদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র ছিল, আরপানেট শুধু তাদের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। এর সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ ও ব্যক্তিগত শিল্প এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। এর ফলে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন কম্পিউটার সায়েন্স রিসার্চ নেটওয়ার্ক (সিএসএনইটি) তৈরি করে। এর মধ্যে ছিল আরপানেট, টেলিনেট ব্যবস্থা ও ফোননেট বা ই-মেইল। এর কিছুদিন পরেই ব্যক্তিগত ইন্টারনেট ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৮৫ সালে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন পাঁচটি সুপার কম্পিউটার তৈরি করে তা দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করে। এটি এনএসএফএনইটির বৃহত্তর মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যক্তি খাতে করপোরেশনগুলো একটি বিরাট ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসে, যার প্রটোকল ছিল অভিন্ন। এর ফলে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়, যারা ব্যক্তিগত কম্পিউটার দিয়ে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে ইন্টারনেটে ঢোকার সুযোগ পায়।

আরপানেটের কাজ বন্ধ হয়ে যায় ১৯৮৯ সালে। ১৯৯০-এর দশকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তৈরি হয়। এর ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিপুল হারে বেড়ে যায়, আর এর বাণিজ্যিকীকরণও ঘটে। এরপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে : ১. ১৯৯৫ সালে এনএসএফএনইটি ব্যক্তিগত খাতে চলে যায়,[৫৬] ২. ১৯৯৬

সালের টেলিকমিউনিকেশন আইনের ফলে এ খাত ও গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়, এতে এ খাতে পুঁজি বিনিয়োগের দ্বার উন্মুক্ত হয়[৫৭], ৩. বর্ধিষ্ণু আর্থিক খাতের আরও বাড়বাড়ন্ত ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস মর্ডানাইজেশন অ্যাক্ট করা হয়[৫৮]। এ তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় একীভবন ঘটে, যেটা ডট কম বা নতুন অর্থনীতি বুদ্‌বুদ নামে পরিচিত। প্রযুক্তি ও আর্থিক খাতে বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করে, যা প্রকারান্তরে একচেটিয়া ক্ষমতা আরও সংহত করেছে।

এই ডট কম বুদ্‌বুদ ২০০০ সালে এসে ফেটে যায়। যদিও সে সময়ের মধ্যে ইন্টারনেটের বাজারে একটি কার্টেল গড়ে উঠেছে, আর বিল গেটস ও অন্যরা 'দ্বন্দ্ববিহীন পুঁজিবাদের' অনেক কাহিনি শুনিয়েছেন আমাদের[৫৯]। সেই দশকের শেষ ভাগে এসে পুঁজি আহরণের প্রক্রিয়ায় ইন্টারনেট একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। এর মানে এই নয় যে এই ফার্মগুলো তাদের সম্পদের শতভাগই বিক্রি করেছে; বরং দেখা গেছে তারা পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশই বিক্রি করে। প্রতিযোগিতার পরিসর ঠিক করার ক্ষেত্রেও এটা জরুরি ছিল। (এমনকি জন ডি. রকফেলারের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল মনোপলিও তার ভরা যৌবনে বাজারের ৮০ শতাংশের মতো নিয়ন্ত্রণ করেছে) আর আজ ২০১৪ সালে এসে প্রযুক্তি দুনিয়ার তিনটি প্রধান করপোরেশন ইন্টারনেট জগতের একচেটিয়া প্রভু হয়ে উঠেছে: অ্যাপল, মাইক্রোসফট ও গুগল। এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ৩০টি করপোরেশনের ১২টিই গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট বড় প্রতিষ্ঠান বা ইন্টারনেট জগতের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান : ভেরিজোন, আমাজন, ডিজনি, কমকাস্ট, ইনটেল, ফেসবুক, কুয়ালকোম ও ওরাকল। এই ফার্মগুলো নেটওয়ার্ক, প্রাযুক্তিক মান, মেধাস্বত্ব আইন ও পুরোনো দিনের কায়দায় বাজারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের বাজারের শক্তিতে পরিণত করেছে। একচেটিয়া হওয়ার হাতিয়ার ব্যবহার করে তাদের ডিজিটাল সাম্রাজ্য আরও বড় করেছে। এই অর্থনৈতিক সফলতার সঙ্গে তারা ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষমতাও লাভ করে। তাদের রোখার মতো কোনো আইনই হয়নি। এমনকি ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পারলে তাদের জন্য ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী তৈরি করে দেয়[৬০]।

ইন্টারনেট ও মালিকানা স্বত্বের মাধ্যমে টাকা কামানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে জনগণের ওপর পরিচালিত নজরদারি। এর ফলে হাতে গোনা কয়েকটি ফার্ম মার্কিন অর্থনীতিতে বিক্রয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত বিপুল পরিমাণ মুনাফার সিংহভাগই গ্রাস করার সুযোগ পায়। নজরদারি ডিজিটাল হয়ে যাওয়ায় বিজ্ঞাপনের খোলনলচে বদলে গেছে। আগের দিনের মতো বিজ্ঞাপনের জায়গা বা সময় কেনা সেকেলে হয়ে গেছে, এ ব্যবস্থায় সংবাদ বা বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান দেখা বা পড়ার



সময় ব্যবহারকারীদের তা চোখে পড়ে যেতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতাদের এখন আর সাংবাদিকতায় ভর্তুকি দেওয়ার প্রয়োজন নেই, গণমাধ্যমের আধেয় তৈরি করার দরকার নেই, তারা এখন অন্যভাবেও ভোক্তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। ব্যাপক নজরদারির মাধ্যমে তারা এখন চাইলে তাদের ভোক্তাদের অনলাইনে চিহ্নিত করতে পারে, তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাদের অবস্থান নির্ণয় করে কাউকে জানিয়ে দিতে পারে। এমনকি তাদের শারীরিকভাবেও চিহ্নিত করতে পারে। এ ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে, এখানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কোনো বালাই নেই। ফলে সাংবাদিকতার মতো গণমাধ্যমভিত্তিক আধেয় তৈরির সংস্কৃতি প্রায় অচল হওয়ার পথে। একে প্রতিস্থাপন করার মতো কিছু নেই।

এই একচেটিয়া করপোরেট/বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের দমনমূলক অঙ্গগুলো, অর্থাৎ এর সামরিক, গোয়েন্দা ও পুলিশি কার্যক্রমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। ফলাফল হচ্ছে, এতে জাতীয় গোপন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে শক্তিশালী হয়, যা পুরোপুরি সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত এডওয়ার্ড স্নোডেন, অন্যান্য তথ্য ফাঁসের সঙ্গে, এনএসএর প্রিজম ব্যবস্থার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দৈত্যাকার কম্পিউটারভিত্তিক করপোরেশন/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর শক্তিশালী যোগাযোগের চিত্র তুলে ধরেছেন। যার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় 'সামরিক-ডিজিটাল কমপ্লেক্স'[৬১]। সরকারি জবাবদিহি পরিকল্পনার কার্যনির্বাহী পরিচালক বিয়েট্রিস এডওয়ার্ডস বলেছেন, যা বেরিয়ে এসেছে, তা আসলে 'সরকারি করপোরেট/বাণিজ্যিক নজরদারির এক জটিল অন্তর্জাল'[৬২]।

এটা বিস্তৃত বেসরকারি নেটওয়ার্কের প্রচলিত সীমানার গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রধান ইন্টারনেট এবং টেলিকম কোম্পানিগুলোর সঙ্গে 'গোপন আঁতাতে' জড়িয়ে পড়ে[৬৩]। এই তথ্য বিনিময়ের আংশিক সহযোগিতামূলক ও আংশিক জোরপূর্বক ঘটনার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এরূপ :

*২০০৯ সালে একজন এনএসএর মহাপরিদর্শকের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এনএসএ '১০০-এর বেশি কোম্পানির সঙ্গে' সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে[৬৪]।

*মাইক্রোসফট এনএসএকে তাদের জনপ্রিয় ই-মেইল পোর্টাল আউটলুক ডট কম-এর স্কাইপের ইন্টারনেট ফোনকল (এর ৬৬৩ মিলিয়ন ব্যবহারকারীসহ), এমনকি স্কাইড্রাইভ, মাইক্রোসফট ক্লাউডের সংরক্ষণব্যবস্থা (যার ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৫০ মিলিয়ন) সংগুপ্ত হওয়ার আগেই গোপন প্রবেশাধিকার দিয়েছে। স্নোডেনের নথিপত্রে দেখা যায়, মাইক্রোসফট সক্রিয়ভাবেই এনএসএকে সহযোগিতা করেছে। গ্লেন গ্রিনওয়াল্ড লিখেছেন, 'মাইক্রোসফট বহু মাস ধরে চেষ্টা করে সরকারকে সহজে ওই [স্কাইড্রাইভ] তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

স্কাইপের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে, আউটলুক ডট কমের ক্ষেত্রে সরকারের কয়েক মাস লেগে যায়, এর জন্য মাইক্রোসফট ও এনএসএ যৌথভাবে কাজ করেছে, যাতে এই তথ্যভান্ডারে সরকারের পূর্ণাঙ্গ প্রবেশ নিশ্চিত করা যায়[৬৫]।

*এনএসএ সংগুপ্ত পণ্যসমূহ অবৈধভাবে পাওয়ার জন্য আরএসএ নামক কম্পিউটার নিরাপত্তা কোম্পানিকে ১০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। এনএসএ সংগুপ্তকরণের জন্য একটি এলোমেলো সূত্র তৈরি করে, আরএসএ তাদের বিসেফ নামক সফটওয়্যারে তা প্রয়োগ করে, এই বিসেফ বানানো হয়েছিল ব্যক্তিগত কম্পিউটার আর অন্যান্য ডিজিটাল পণ্যের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য[৬৬]।

* এটি অ্যান্ড টিসিআইয়ের পাল্টা সন্ত্রাসবাদের তদন্তের নামে নিজেই সিআইয়ের কাছে এক বছরে ফোনকলের মেটাডেটা বিক্রি করে দেয় ১০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি দামে[৬৭]।

* ভেরিজোন (এটিঅ্যান্ডটি ও স্প্রিন্টও) তাদের সংরক্ষণে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরের এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সব ফোনকলের মেটাডাটা এনএসএকে সরবরাহ করে । বুশ আর ওবামা উভয় সরকারের আমলেই এ রকম মেটাডাটা এনএসএর কাছে সরবরাহ করা হয়েছে[৬৮]।

* মাইক্রোসফট, গুগল, ইয়াহু আর ফেসবুক তাদের হাজার হাজার স্বতন্ত্র অ্যাকাউন্টের সব তথ্য প্রতি ছয় মাসে এনএসএ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার কাছে তুলে দিয়েছে। সরকারের গোপন অংশের কাছে এরূপ তথ্য তুলে দেওয়ার প্রবণতাও ক্রমেই বাড়ছে[৬৯]।

২০১২ সালে ডারপার পরিচালক রেজিনা ডুগান গুগলে যোগ দেওয়ার জন্য পদত্যাগ করেন। তাঁর সময়ে ডারপা ড্রোন গবেষণায় সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। এরাই ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে এর প্রথম মডেল নমুনার উৎপাদন করে। যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ আণবিক বৈমানিক শিকারি ড্রোন হিসেবে এর ব্যবহার ১৯৯০-এর শেষের দিকে কসোভো যুদ্ধের আগে হয়নি, যেখানে ক্লার্ক ছিলেন যৌথ বাহিনীর প্রধান কমান্ডার। বৈশ্বিকভাবে ভূখণ্ডের বাইরে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে এ রকম ড্রোনের ব্যবহার, যা এখন ওবামার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধপদ্ধতির একটি মুখ্য হাতিয়ার, শুরু হয় ২০০২ সালে[৭০]। এই শতকের শুরুর বছরগুলোয় ডারপা তাদের গবেষণার পরিসর বাড়াতে থাকে, যাতে করে এসব ড্রোন দূরবর্তী ওয়াই-ফাই সংযোগের মাধ্যমে কাজে লাগানো যায়। ডুগান যখন গুগলে চলে আসেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি তদন্ত চলছিল। অভিযোগ ছিল, তিনি তড়িঘড়ি করে ডারপার অনেক কাজ রেডেক্সেকে দিয়েছেন। এটি একটি বোমা খুঁজে বের করা প্রতিষ্ঠান, সেখানে তাঁর মালিকানা ছিল। এটা গুগলের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, যাতে অনেক উচ্চতায় ওয়াই-ফাই পদ্ধতিতে ড্রোন



চলতে পারে। ২০১৪ সালে গুগল ঘোষণা দেয়, তারা টাইটান মহাকাশ কোম্পানি কিনে নেবে। লক্ষ্য হচ্ছে, এমন ড্রোন বানানো যা বায়ুমণ্ডলের ঠিক সীমানা দিয়ে উড়ে বেড়াতে পারে। এরই মধ্যে ফেসবুক যুক্তরাজ্যভিত্তিক কোম্পানি এসেন্টা কিনে নেয়, যারা অধিক উচ্চতায় ওড়ার ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার ড্রোন বানাতে পারদর্শী। এ রকম ড্রোন নতুন নতুন স্থানে ইন্টারনেট-সুবিধা পৌঁছে দিতে কাজ করবে। লক্ষ্য ছিল, নতুন সামরিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা আর বৈশ্বিক ইন্টারনেট-ব্যবস্থায় একচেটিয়া প্রভাব সৃষ্টি করা, একই সঙ্গে সামরিক ডিজিটাল কমপ্লেক্সের জাল বিস্তার করা[৭১]। ২০০৫-০৭ সালের আনুমানিক হিসাবে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র বিপণনে ব্যয় করেছে (খুব সূক্ষ্ম হিসাবে) প্রতিবছরে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার; প্রকৃত সামরিক বার্ষিক ব্যয় (স্বীকৃত/অস্বীকৃত উভয় মিলেই) প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার আর এফআইআরই (বিনিয়োগ, বিমা আর স্থাবর সম্পত্তি) ব্যয় হলো প্রায় ২ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার[৭২]। এই ডিজিটাল যুগে, রাজনৈতিক অর্থনীতির এই তিনটি খাতের প্রতিটিই পরগাছার মতো বেড়ে উঠেছে অর্থনীতির উৎপাদনশীল ভিতের ওপর, আর এগুলো প্রযুক্তি আর তথ্য আদান-প্রদানের জালে জড়িয়ে আছে। সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি চলে গেছে বেসরকারি খাতে। এই খাতসংশ্লিষ্ট অনেকেই যুক্ত ছিলেন যুদ্ধ অর্থনীতির সঙ্গে, যেমন ডিএআরপিএর ডুগান। অবস্থানগত কারণেই তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান সহজেই তিনি বেসরকারি খাতে কাজে লাগাতে পেরেছেন। তিনি অনায়াসে নিরাপত্তা আর নজরদারির এক ব্যবস্থা থেকে অন্যটিতে পৌঁছাতে পেরেছেন।

ডিজিটাল নজরদারির এই যুগে 'সুরক্ষাকরণের' নামে একধরনের ভাষাবিদ্যার অভিসরণ—একচেটিয়া বিনিয়োগ পুঁজির কেন্দ্রীভূত কাঠামোকে প্রতিফলিত করে—সারা দুনিয়ায় প্রভুত্ব করছে : ১. অর্থ আহরণভিত্তিক বাণিজ্য, ২. সরকারি আর ব্যক্তি খাত নজরদারি নেটওয়ার্ক, ৩. নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির সামরিকীকরণ এবং ৪. কার্যকরী নাগরিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচারিক পদ্ধতির দূরীকরণ[৭৩]।

## পূর্ণাঙ্গ তথ্য সচেতনতা, প্রিজম আর স্নোডেন

মার্কিন সাম্রাজ্যের গভীর পর্যবেক্ষকদের মতে, পয়েনডেক্সটারের টিআইএ কর্মসূচি কংগ্রেস কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা কেবল আংশিকভাবে সফল হয়েছে। কংগ্রেসের বাধার মুখে পরে ডিআরপিএ ও এনএসএ এই কর্মসূচি বেসরকারি খাতে বাস্তবায়ন শুরু করে। সেখানে গোপনীয়তার ব্যাপার আরও কড়া, কারণ সরকারের জবাবদিহি আরও কম। চামার্স জনসন ২০১০ সালে তাঁর *ডিসম্যান্টলিং দ্য এম্পায়ার* গ্রন্থে বলেছেন :

কংগ্রেসের তৎপরতার কারণে 'পূর্ণাঙ্গ তথ্য সচেতনতা' কর্মসূচি বন্ধ হয়ে

যায়নি। জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা একে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চালু রেখেছে। কংগ্রেস যাকে আমেরিকান জনগণের গোপনীয়তার অধিকারের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছে, তাকে এনএসএ সহজেই এসএআইসি [বিজ্ঞান ব্যবহারের আন্তর্জাতিক সংস্থা] ও বুজ অ্যালেন হ্যামিল্টনের মাধ্যমে রাজি করিয়ে করে চলেছে—একটা নির্দিষ্ট মূল্যের জন্য। আমরা যতদূর জানি, অ্যাডমিরাল পয়েনডেক্সটারের 'সমগ্র তথ্য সচেতনতা কর্মসূচি' আজকের দিনেও খুব জোরালোভাবেই এগিয়ে চলেছে[৭৪]।

এমন স্থানান্তর খুব সহজেই সম্পন্ন হয়েছে। কারণ, বুজ অ্যালেনের পরিচালক ম্যাককনেল এই পূর্ণাঙ্গ তথ্য সচেতনতা কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে পয়েনডেক্সটারের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। যেখানে কর্মসূচির ডিজাইন, প্রযুক্তি আর বিনিয়োগ খুব সহজেই সরকারি খাত থেকে সরিয়ে সামরিক প্রতিষ্ঠানের অস্বচ্ছ জগতে নেওয়া হয়েছে। এটা এখনো এনএসএর সঙ্গে যুক্ত আছে আর এর নাইন-ইলেভেনের পরের আমেরিকানদের ওপর অভ্যন্তরীণ চরম গোপন নজরদারি এখনো বহাল আছে, যা দাপ্তরিক নথিপত্রে 'প্রেসিডেন্টের নজরদারি কর্মসূচি' নামে পরিচিত আর ভেতরের লোকেদের কাছে কেবল 'কর্মসূচি' নামে পরিচিত। এটা চলছিল ২০০৫ পর্যন্ত এনএসএর পরিচালক মাইকেল ভি হ্যাডেনের তদারকিতে, যিনি পরে সিআইএর পরিচালক হন। হ্যাডেনের পরিবর্তে আসেন একরোখা জেনারেল কেইথ অ্যালেকজান্ডার, যার লক্ষ্য ছিল 'সবকিছু সংগ্রহ করো'। স্নোডেনের তথ্য ফাঁসের পর ২০১৪ সালে অ্যালেকজান্ডার এনএসএর পরিচালকের পদ থেকে সরে আসেন আর তার স্থানে বসানো হয় অ্যাডমিরাল মাইক রজার্সকে[৭৫]।

গোয়েন্দা সংস্থা আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক হলো একটি চক্রাকার দরজা। বুশের এনএসএর পরিচালক ম্যাককনেল ফের বুজ অ্যালেনের উপচেয়ারম্যান হলেন; যখন ওবামার জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক জেমস ক্ল্যাপার ছিলেন বুজ অ্যালেনের সাবেক কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা। বুজ অ্যালেনের প্রধান মালিকানা কারলাইল গ্রুপের হাতে, এরা বেসরকারি নিরপেক্ষ বিনিয়োগ আর সামরিক ঠিকাদারি মালিকানায় পারদর্শী। এ ক্ষেত্রে কারলাইল গ্রুপ বেশ কিছু অধিক লাভপ্রত্যাশী কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত মুনাফা আর অনেক দিন ধরেই বুশ পরিবারের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান[৭৬]।

স্নোডেনের নথিপত্র থেকে দেখা যায়, ডিএআরপিএর মধ্যে পয়েনডেক্সটারের টিআইএ কর্মসূচির তহবিল কংগ্রেস বাতিল করেছিল, কংগ্রেস তখন ছিল খুব ক্রুদ্ধ। ততক্ষণে এনএসএ নিজেদের প্রাসঙ্গিক গোপন কর্মসূচি শুরু করে দিয়েছে, প্রেসিডেন্টের নজরদারি কর্মসূচির অংশ হিসেবে। আর নাইন-ইলেভেনের



কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় সীমাহীন খবরদারি, টেলিফোন আর ই-মেইল উভয় ক্ষেত্রেই। প্রিজম পর্যন্ত যেতে অনেক দিন লেগে যায়, যার (পয়েনডেক্সটারের টিআইএর মতো) লক্ষ্য ছিল ইন্টারনেটের ওপর পূর্ণাঙ্গ নজরদারি চালানো। কারণ, এর জন্য যেমন দরকার ছিল নতুন প্রযুক্তির, তেমনি প্রধান ইন্টারনেট সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে দরকার ছিল সহযোগিতামূলক সম্পর্কের। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আর প্রকৃত নজরদারির অনেকটাই ক্রমবর্ধমান হারে কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছিল বুজ অ্যালেন আর অন্যান্য বেসরকারি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে। যদিও এনএসএর নিজস্ব ৩০ হাজার লোক আছে, একে নির্ভর করতে হয় ৬০ হাজার মানুষের বিশাল লোকবলের ওপর। যাদের নিয়োগ দিয়েছে বেসরকারি ঠিকাদারি[৭৭]।

২০১৩ সালের মে মাসে বুজ অ্যালেন হ্যামিলটনের একজন মধ্যম মানের যন্ত্রবিদ এডওয়ার্ড স্নোডেন তাঁর কাছে থাকা ১ দশমিক ৭ থেকে ১ দশমিক ৮ মিলিয়ন নথি কয়েকটি ছোট আকারের ড্রাইভে নিয়ে দেশ ছেড়ে হংকং পালিয়ে যান। সেখান থেকে তিনি সাহসের সঙ্গে মার্কিন ও সারা পৃথিবীর মানুষের ওপর চলমান এনএসএর বিস্তর গোয়েন্দাগিরির ফিরিস্তি ফাঁস করে দেন[৭৮]। তিনি দালিলিক প্রমাণসহ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় দেখিয়ে দেন, এনএসএ কোনো ধরনের মধ্যস্থতা ছাড়াই মার্কিন মুলুকে ইন্টারনেট জগতের সব তথ্যে 'সরাসরি প্রবেশাধিকার' অর্জন করেছে। কয়েক শ মিলিয়ন আমেরিকান ও বিদেশি জনগণের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনেরও সব তথ্যও তার হাতে এসেছে। এনএসএর একটি স্লাইড থেকে জানা যায়, নয়টি প্রযুক্তি কোম্পানি (মাইক্রোসফট, অ্যাপেল, গুগল, ইয়াহু, ফেসবুক, ইউটিউব, প্যালটক, স্কাইপে, এওল), সবাই প্রিজমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, একভাবে বলতে গেলে বাণিজ্যিক অংশীদারে পরিণত হয়েছে। স্লাইড অনুযায়ী, এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে 'সরাসরি এসব সেবা প্রদানকারী মার্কিন সংস্থার সার্ভার থেকে'[৭৯]। স্নোডেনের ফাঁস করা একটি নথির তথ্যানুসারে, এনএসএর অধিগ্রহণ পরিচালক ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই পেছন দরজার সুবিধা এনএসএকে শ শ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। হংকং থেকে স্নোডেন নিজেই বলেছেন :

মার্কিন সরকার নিজের পছন্দমতো কয়েকটি করপোরেট শক্তি বেছে নিজের কাছে এনেছে। গুগল, ফেসবুক, অ্যাপেল আর মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানিগুলো এনএসএর সঙ্গে একত্রে কাজ করছে । তারা এনএসএকে আপনার ব্যবহৃত যেকোনো যোগাযোগমাধ্যমে সরাসরি ঢোকার অনুমতি দিয়ে রেখেছে, যেখানে আপনি তথ্য সংরক্ষণ করেন, ক্লাউডে কোনো কিছু রাখেন, আর যার মাধ্যমে জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাঠান বা যেখানে আপনি জীবনের রেকর্ড

রাখেন। তারা এনএসকে সবকিছুতে সরাসরি প্রবেশের সুযোগ দিয়েছে যাতে তাদের নিজেদের আর তদারকি করতে না হয়। ফলে এর দায়ও আর তাদের ওপর বর্তাবে না[৮০]।

স্নোডেন বুঝিয়েছেন, তার মতো বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত একজন মধ্যম মানের যন্ত্রবিদও যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো ব্যক্তিমানুষের ওপর নজরদারি করতে বিদেশি সরকার বা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তিকে যখন তারা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, তখন তারা সেই ব্যক্তির যোগাযোগের রেকর্ড সংগ্রহ করে। যেকোনো বিশ্লেষক যখন-তখন যাকে খুশি তাকেই লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারেন। যেকোনো জায়গার যে-কাউকে নির্বাচন করতে পারেন। এই যোগাযোগগুলোকে বেছে নেওয়ার ব্যাপার নির্ভর করে সেন্সর নেটওয়ার্ক বিশ্লেষকের ক্ষমতার ওপর। অবশ্য সব বিশ্লেষকের যাকে-তাকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু আমি আমার ডেস্কে বসে নিশ্চিতভাবে চাইলেই কাউকে ট্যাপ করতে পারতাম; আপনাকে দিয়ে শুরু করে আপনার হিসাবও আমার নজরদারির মধ্যে ছিল, তা হোন আপনি একজন ফৌজদারি বিচারক, এমনকি খোদ প্রেসিডেন্টও আমার আওতার বাইরে ছিল না, যদি তার একটা ব্যক্তিগত ই-মেইল [ঠিকানা] থাকে[৮১]।

স্নোডেনের দলিলগুলো থেকে দেখা যায় যে এনএসএর এখন আর প্রধান প্রধান ইন্টারনেট ও টেলিকম কোম্পানিগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা দরকার হচ্ছে না, তারা সরাসরি এদের সিস্টেমে ঢুকে নজরদারি করতে পারছে। ২০১০ সাল নাগাদ তাদের বুলরান আর এডগেহিল কর্মসূচির মাধ্যমে এনএসএ প্রায় সব ধরনের গুপ্ত কোড ভাঙার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করে, সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে তারা অ্যালগরিদম ভাঙতে সক্ষম হয়। এই অ্যালগরিদম দিয়েই সব গুপ্ত কোড নির্মাণ করা হয়, এটা ভাঙার সক্ষমতা অর্জন করায় তারা প্রায় সব মেইলই হ্যাক করতে সক্ষম হয়। উপরন্তু, দলিলগুলো থেকে আরও দেখা যায়, এনএসএ জাতীয় মান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা সাইবারস্পেস নিরাপত্তা বলয়ের ভেতরে সিঁধ কেটে ঢুকেছে। এনএসএ দাবি করেছে, এর ফলে এতে বাণিজ্যিক গুপ্ত কোডের ক্ষেত্রে 'রূপান্তর' আনা গেছে, যাতে দেখে মনে হয় নিরাপত্তাবেষ্টনী অটুট আছে, যদিও এনএসএর অনুপ্রবেশের জন্য এটা উন্মুক্তই থাকে[৮২]। ফলস্বরূপ *ওয়াশিংটন পোস্ট* ব্যাখ্যা করেছে, এনএসএ কোনো সার্ভারের তথ্যভান্ডারে ঢুকতে পারেনি। তারা 'উড়ে উড়ে তথ্য' ধরেছে। এনএসএ আর জিসিএইচকিউ [ব্রিটেন সরকারের যোগাযোগ কেন্দ্র] ইয়াহু আর গুগলের কম্পিউটারে সংরক্ষিত অ্যাকাউন্টগুলোয় সরাসরি ঢুকতে পরে না। ফাইবার অপটিক কেব্‌লের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ই তারা তথ্য সংগ্রহ করে। এনএসএ ইয়াহু আর গুগলে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত



ক্লাউডগুলোয় প্রবেশের জন্য তাদের ব্রিটিশ পরিপূরক জিসিএইচকিউ-এর সঙ্গে কাজ করছে, এসব ক্লাউড তথ্যের সুরক্ষার জন্য গণ-ইন্টারনেটের বাইরে বিকল্প ফাইবার অপটিক ব্যবহার করে[৮৩]।

এনএসএ ৮০ শতাংশেরও বেশি আন্তর্জাতিক টেলিফোন কলে ঢুকতে পারে, যার জন্য তারা মার্কিন একচেটিয়া টেলিকম ব্যবসায়ীদের প্রতিবছর শত শত মিলিয়ন ডলার দেয়। আর এটা বিদেশের ইন্টারনেট তথ্যের ভেতরেও ঢুকে পড়েছে[৮৪]। এভাবে তারা তাদের বন্ধুরাষ্ট্রের প্রধানদের ওপরেও গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে।

সরকার আর করপোরেট গণমাধ্যম স্নোডেনকে একজন দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দিতে ব্যস্ত। দুজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব গণমাধ্যমে স্নোডেনের মুন্ডুপাত করতে ব্যস্ত, যার একজন হচ্ছেন ক্লার্ক, যিনি অপরিবর্তনীয়ভাবেই নজরদারির পুঁজিবাদ থেকে নিজেকে আলাদা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন (যিনি অ্যাক্সিকম ছেড়ে এখন টিভেসেরা সাইবার-গোয়েন্দা সংস্থার উপদেষ্টা পরিষদে আছেন) এবং ম্যাককনেল (যিনি অনবরত বদলের দরজায় অবস্থান করছেন, যেটা তাঁকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ আর বুজ অ্যালেনের মধ্যে যাওয়া-আসা করার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে)। উভয়েই দাবি করছেন, স্নোডেন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংকটাপন্ন করে তুলেছেন। স্নোডেন দেশের আর বিশ্বের জনগণকে এটা জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ কী পরিমাণে নজরদারির মধ্যে আছে[৮৫]।

স্নোডেনের তথ্য ফাঁস মার্কিন জনগণের একটি অংশকে হতভম্ব করে দেয়। এসব মানুষ আগে থেকেই তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অসংখ্য অনধিকার অনুপ্রবেশ আর সর্বব্যাপী নজরদারির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ভিন্নমতাবলম্বী হ্যাকাররা যুক্ত হচ্ছে উইকিলিকস ও অজ্ঞাতনামা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। স্নোডেন ও ম্যানিংয়ের মতো তরুণ তুর্কিরা হাজারে হাজারে শ্রেণীকৃত দলিল ফাঁস করে দিচ্ছে। তারা গোপন সরকার-করপোরেট নিরাপত্তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে[৮৬]। অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এই নজরদারি পুঁজিবাদের মধ্যে লড়ে যাচ্ছে বাক্‌স্বাধীনতা আর গোপনীয়তার অধিকারের জন্য[৮৭]। যদিও সামগ্রিকভাবে জনগণ এখনো বুঝতে পারছে না 'ডলারতন্ত্রের' রাজনীতির বিপদটা ঠিক কোন জায়গায়। যে রাজনীতি সামরিক-অর্থনৈতিক-ডিজিটাল কমপ্লেক্সের মুখোমুখি হয়েছে, যার পরিধি আমাদের কাছে অবিশ্বাস্যই মনে হবে। যারা ইতিমধ্যে এসব নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার চেষ্টা করছে[৮৮]।

এখন পর্যন্ত অভিজাতরাই স্নোডেনের তথ্য ফাঁসের ঘটনায় মূলত ঝামেলায় পড়েছে। এতে এটা পরিষ্কার, একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারকারী করপোরেট সংস্থা, বিশেষ করে গোয়েন্দারা সমাজের যেকোনো অংশের গভীরতম গোপনীয়তার মধ্যে

কীভাবে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম। এনএসএর হয়ে কাজ করা কিছু করপোরেট সংস্থার কর্মীরা প্রায় সব করপোরেট সংস্থারই তথ্যের ভান্ডার হ্যাক করে ঢুকতে পারে। যার সবচেয়ে সম্ভাব্য ফলাফল হচ্ছে বৃহৎ অর্থে জনগণের পয়সা খরচ করে সরকারের নিরাপত্তা বিধানের যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়ে বিশালাকার ফার্মগুলোর একত্র হওয়া।

এর মধ্যে সাইবার যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়ছে, সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন। খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যই হুমকির মুখে পড়েছে। হাস্যকরভাবে, খোদ সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোই নিরাপত্তা হুমকি বাড়িয়ে তুলছে। (আর আবশ্যিকভাবেই সাইবার যুদ্ধের হুমকি ব্যবহার করা হবে ব্যক্তিমানুষের অধিকার হ্রাস করা ও অবাণিজ্যিক মূল্যবোধকে দমিয়ে রাখার যৌক্তিকতা হিসেবে।) বৈশ্বিক শ্রম সালিসির মাধ্যমে চিপসসহ অন্যান্য কম্পিউটার যন্ত্রাংশ এখন প্রধানত বিদেশে বানানো হচ্ছে, প্রধানত এশিয়ায়। এর সুবিধা নেয় মূলত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলো[৮৯]। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এখন হ্যাকিংয়ের ভীতিতে রয়েছে। এতে তার আর্থিক ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার পদ্ধতি উদ্ভাবনে ডিএআরপিএ নয়টি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে[৯০]।

তদুপরি আজকের এই অতি-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় এরূপ দুর্বলতা কাটানো একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। একচেটিয়া ফাইন্যান্স ক্যাপিটালের গর্ভ থেকে যার জন্ম হয়েছে। সারা বিশ্বের মানুষের, এমনকি নিজেদের জনগণের ওপরে চালানো অর্থনৈতিক শোষণের কারণে মার্কিন সাম্রাজ্য নানা আক্রমণের মুখে পড়েছে। আর সাম্রাজ্য নিজেকে রক্ষা করতে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। এটা এক মৃত্যুপথযাত্রী সাম্রাজ্যের লক্ষণ। সমগ্র মানবতার আর বৈশ্বিক বিপর্যয় রক্ষা করতে হলে জনগণের কথা আরও একবার শোনা খুব জরুরি, আর সাম্রাজ্যের সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যও এটা দরকার। ডিজিটাল বিপ্লব অবশ্যই বেসামরিকীকরণ করতে হবে। এর পুরো ব্যাপারটিই গণতান্ত্রিক মূল্যায়ন ও শাসনের আওতায় আনতে হবে, যার প্রয়োজনীয়তা সে নিজেই তৈরি করেছে। এর আর বিকল্প কোনো পথ নেই।

অনুবাদ : **প্রতীক বর্ধন**

**তথ্যসূত্র**


1. Richard B. DuBoff, *Accumulation and Power* (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1989), 91.
2. William H. Branson, "Trends in United States International Trade and Investment Since World War II," in Martin Feldstein, ed., *The American Economy in Transition* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), 183.
3. Dean Acheson, quoted in William Appleman Williams, *The Tragedy of American Diplomacy* (New York: Dell, 1962), 235–36.
4. General Dwight D. Eisenhower, "Memorandum for Directors and Chiefs of War Department General and Special Staff Divisions and Bureaus and the Commanding Generals of the Major Commands; Subject: Scientific and Technological Resources as Military Assets," April 1946. Published as Appendix A in Seymour Melman, *Pentagon Capitalism* (New York: McGraw Hill, 1971), 231–34.
5. "'No Such Agency' Spies on the Communications of the World," *Washington Post*, June 6, 2013, http://washingtonpost.com.
6. U.S. State Department, *Foreign Relations of the United States, 1950. National Security Affairs; Foreign Economic Policy*, vol. 1, http://digital.library.wisc.edu, 258–61, 284–86.
7. S. Nelson Drew, ed., *NSC-68: Forging the Strategy of Containment; With Analyses by Paul H. Nitze* (Washington, DC: National Defense University, 1994), 117; "The Narcissism of NSC-68," November 12, 2009, http://econospeak.blogspot.com.
8. Dean Acheson, *Present at the Creation* (New York: W.W. Norton, 1987), 377; Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis, *Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1949–50* (New York: Columbia University Press, 1978), chapter 7; Institute for Economic Democracy, "NSC-68, Master Plan for the Cold War," http://ied.info; Fred Block, "Economic Instability and Military Strength: The Paradoxes of the Rearmament Decision," *Politics and Society* 10, no. 35 (1980): 35–58.
9. *Business Week*, April 15, 1950, 15, quoted in Harold G. Vatter, *The U.S. Economy in the 1950s* (New York: W.W. Norton, 1963), 72.
10. Harry Magdoff, *The Age of Imperialism* (New York: Monthly Review Press, 1969), 200–201.
11. Lynn Turgeon, *Bastard Keynesianism: The Evolution of Economic Thinking and Policymaking Since World War II* (Westport, CT: Greenwood Press, 1996), 13; Noam Chomsky, *Necessary Illusions* (Boston: South End Press, 1989), 183.
12. Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, *Monopoly Capital* (New York: Monthly Review Press, 1966), 152.
13. Scott Nearing, "World Events," *Monthly Review* 16, no. 2 (June

1964): 122.

14. Quoted in Fred J. Cook, *The Warfare State* (New York: Macmillan, 1962):165–66.
15. "WPB Aide Urges U.S. to Keep War Set-Up," *New York Times*, January 20, 1944; Charles E. Wilson, "For the Common Defense," *Army Ordnance* 26, no. 143 (March–April 1944): 285–88.
16. Slichter and *U.S. News and World Report*, quoted in Cook, *The Warfare State*, 171.
17. Bureau of Economic Analysis, "National Income and Product Accounts," Table 1.1.5 (Gross Domestic Product), and Table 3.9.5 (Government Consumption Expenditures and Gross Investment), http://bea.gov; Baran and Sweezy, *Monopoly Capital*, 161, 207–13; John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, "A New New Deal under Obama?" *Monthly Review*, 60, no. 9 (February 2009): 1–11; Hannah Holleman, Robert W. McChesney, John Bellamy Foster, and R. Jamil Jonna, "The Penal State in an Age of Crisis," *Monthly Review* 61, no. 2 (June 2009): 1–17.
18. Baran and Sweezy, *Monopoly Capital*, 191, 206, 213–17.
19. For an excellent discussion of this, see Andrew J. Bacevich, *Breach of Trust: How Americans Failed Their Soldiers and Their Country* (New York: Metropolitan Books, 2013), 48–79.
20. Barbara W. Tuchman, *The March of Folly: From Troy to Vietnam* (New York: Random House, 1984), 326.
21. See Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, "Some Theoretical Implications," *Monthly Review* 64, no. 3 (July–August 2012): 45–58; John Bellamy Foster, *The Theory of Monopoly Capitalism*, new edition (New York: Monthly Review Press, 2014), xiv–xviii.
22. Thorstein Veblen, *Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times* (New York: Augustus M. Kelley, 1964), 300.
23. Martin Mayer, *Madison Avenue* (New York: Harper, 1958), 13–14.
24. See Michael Dawson, *The Consumer Trap* (Urbana: University of Illinois Press, 2005).
25. On the concept of the cultural apparatus, see John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, "The Cultural Apparatus of Monopoly Capital," *Monthly Review* 65, no. 3 (July–August 2013): 1–33.
26. Baran and Sweezy, *Monopoly Capital*, 118–28.
27. Advertising spending, as noted above, was $10 billion in 1957, while annual military spending in the Eisenhower administration was $40–$50 billion. On the latter figure see Turgeon, *Bastard Keynesianism*, 13.
28. Baran and Sweezy, *Monopoly Capital,* 115–17.
29. Dennis Daye, "Great Moments in Branding: Neil McElroy Memo," June 12, 2009, http://brandingstrategyinsider.com; Mayer, *Madison Avenue*, 26; Editors of *Advertising Age*, *The House that Ivory Built* (Lincoln, IL: National Textbook Co., 1988), 20–21, 158; Katie Hafner and Matthew Lyon, *Where Wizards Stay Up Late* (New York: Simon and Schuster, 1996), 14.
30. Herbert I. Schiller, *Mass Communications and American Empire* (Boulder: Westview Press, 1992), 8–9.
31. See the detailed critique of the Federal Communications Commission in this respect in *Monthly Review* in the late 1950s: Leo Huberman and Paul M. Sweezy, "Behind the FCC Scandal," *Monthly Review* 9, no. 12 (April 1958): 401–11.
32. Hafner and Lyon, *Where Wizards Stay Up Late*, 14–21, 255; L. Parker Temple III, *Shades of Gray: National Security and the Evolution of Space Reconnaissance* (Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2005), 132–33, 142, 146, 192–200, 208–18, 233, 242.
33. Bury, *Eisenhower and the Cold War Arms Race* (New York: I.B. Tauris, 2014), 205; William Conrad Gibbons, *The U.S. Government and the Vietnam War: Executive and Legislative Roles and Relationships; Part IV: July 1965–January 1968* (Princeton: Princeton University Press, 1995), 3–4.
34. President Dwight D. Eisenhower, "President Eisenhower's Farewell to the Nation." Published as Appendix B in Melman, *Pentagon Capitalism*, 235-39; Charles E. Nathanson, "The Militarization of the American Economy," in David Horowitz, ed., *Corporations and the Cold War* (New York: Monthly Review Press, 1969), 209.
35. Christopher H. Pyle, *Military Surveillance of Civilian Politics, 1967–1970* (New York: Garland Publishing, 1986), 69–81, "Military Intelligence Overkill," in Sam J. Ervin, et. al., *Uncle Sam is Watching You: Highlights from the Hearings of the Senate Subcommittee on Constitutional Rights* (Washington, DC: Public Affairs Press, 1971), 74–147; Christopher H. Pyle, "Be Afraid, Be Very Afraid, of Spying by U.S. Army," December 5, 2002, http://bintjbeil.com; Seth F. Kreimer, "Watching the Watchers:

Surveillance, Transparency, and Political Freedom in the War on Terror," *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 133 (September 2004): 138–44; Frank J. Donner, *The Age of Surveillance* (New York: Alfred A. Knopf, 1980), 287–320.

36. "Computers Carried Army Files; MIT Investigation Underway," *The Tech*, April 11, 1975, http://tech.mit.edu; Hafner and Lyon, *Where Wizards Stay Up Late*, 231; Gibbons, *The U.S. Government and the Vietnam War*, 854.
37. "Ervin Discusses Privacy," *The Tech*, April 11, 1975, http://tech.mit.edu.
38. Arthur R. Miller, "The Surveillance Society," in Ervin, et. al., *Uncle Sam is Watching You*, 25–26.
39. FBI COINTELPRO documents quoted (and displayed) in Noam Chomsky, "Introduction," in Nelson Blackstock, ed., *COINTELPRO: The FBI's Secret War on Political Freedom* (New York: Pathfinder, 1988), 15–16, 25–33.
40. Matthew M. Aid and William Burr, "Secret Cold War Documents Reveal NSA Spied on Senators," *Foreign Policy*, September 25, 2013, http://foreignpolicy.com.
41. William Blum, *Rogue State* (Monroe, ME: Common Courage, 2005), 271–74, and "Anti-Empire Report #118," June 26, 2013, http://williamblum.org.
42. See John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, *The Endless Crisis* (New York: Monthly Review Press, 2012).
43. William Safire, "You Are a Suspect," *New York Times*, November 14, 2002, http://nytimes.com; Shane Harris, *The Watchers: The Rise of America's Surveillance State* (New York: Penguin, 2010), 194–235, and "Total Recall," *Foreign Policy,* June 19, 2013, http://foreignpolicy.com; "Threats and Responses," *New York Times*, July 29, 2003, http://nytimes.com; "Pentagon Prepares a Future Market on Terror Attacks," *New York Times*, July 29, 2003; Whitfield Diffie and Saul Landau, *Privacy on the Line* (Cambridge, MA: The MIT Press, 1998), 66–67; "Chief Takes Over New Agency to Thwart Attacks on U.S.," *New York Times*, February 13, 2002; White House, National Security Decision Directive Number 145, "National Policy on Telecommunications and Automated Information Security Systems," September 17, 1984, http://fas.org; Chalmers Johnson, *Dismantling the Empire* (New York: Henry Holt, 2010), 104–5.
44. Fred Magdoff and John Bellamy Foster, "Stagnation and Financialization: The Nature of the Contradiction," *Monthly Review* 66, no. 1 (May 2014): 9.
45. Harry Magdoff and Paul M. Sweezy, "Production and Finance," *Monthly Review* 35, no. 1 (May 1983): 1–13; Paul M. Sweezy, "More (or Less) on Globalization," *Monthly Review* 49, no. 4 (September 1997): 1–4.
46. See Nomi Prins, *All The Presidents' Bankers: The Hidden Alliances that Drive American Power* (New York: Nation Books, 2014).
47. See Michael Lewis, *Flash Boys* (New York: W.W. Norton, 2014).
48. Christian Parenti, *The Soft Cage: Surveillance in America* (New York: Basic Books, 2003), 91–92,96.
49. Dawson, *The Consumer Trap*, 51.
50. *CBS 60 Minutes*, "The Data Brokers: Selling Your Personal Information," March 9, 2014, http://cbsnews.com; "Never Heard of Acxiom?," *Fortune*, February 23, 2004, http://money.cnn.com.
51. *CBS 60 Minutes*, "The Data Brokers"; "Never Heard of Acxiom?"; Lois Beckett, "Everything We Want to Know About What Data Brokers Know About You," *Propublica*, September 13, 2013, https://propublica.org; U.S Senate, Staff Report for Chairman [Jay] Rockefeller, Office of Oversight and Investigations Majority Staff, Committee on Commerce, Science, and Transportation, "A Review of the Data Broker Industry," December 18, 2013, 29; http://commerce.senate.gov; Alice E. Marwick, "How Your Data Are Being Deeply Mined," *New York Review of Books*, January 9, 2014, http://nybooks.com.
52. "What Chase and Other Banks Won't Tell You About Selling Your Data," *Forbes*, October 17, 2013, http://forbes.com.
53. Harris, *The Watchers*, 322–29.
54. "Financial Terrorism: The War on Terabytes," *Economist*, December 31, 2011, http://economist.com.
55. Ibid; Mortimer Zuckerman, "How to Fight and Win the Cyberwar," *Wall Street Journal*, December 6, 2010, http://online.wsj.com.; James Bamford, "The Secret War," *Wired*, June 12, 2013, http://wired.com.
56. Haftner and Lyon, *Where Wizards Stay Up Late*, 242–56; Robert W. McChesney, *Digital Disconnect* (New York: New Press, 2013),

102–4.

57. On the Telecommunications Act of 1996, see Robert W. McChesney, *The Problem of the Media* (New York: Monthly Review Press, 2004), 51–56.
58. John Bellamy Foster and Hannah Holleman, "The Financial Power Elite," *Monthly Review* 62, no. 1 (May 2010): 1–19.
59. Bill Gates, *The Road Ahead* (New York: Viking, 1995), 171, 241–42, and "Keynote Address," in O'Reilly Associates, ed., *The Internet and Society* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), 32; Michael Dawson and John Bellamy Foster, "Virtual Capitalism," in Robert W. McChesney, Ellen Meiksins Wood, and John Bellamy Foster, eds., *Capitalism and the Information Age* (New York: Monthly Review Press, 1998), 51–67.
60. McChesney, *Digital Disconnect*, 103–37.
61. McChesney, *Digital Disconnect*, 158.
62. Beatrice Edwards, *The Rise of the American Corporate Security State* (San Francisco: Berrett-Koehler, 2014), 41 (reprinted in this issue, 54); Mark Karlin, "Six Reasons to Be Afraid of the Private Sector/Government Security State" (interview with Beatrice Edwards), *Truthout*, May 16, 2014, http://truth-out.org.
63. Glenn Greenwald, *No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State* (New York: Henry Holt, 2014), 114.
64. Luke Harding, *The Snowden Files* (New York: Vintage, 2014), 202.
65. "Revealed: The NSA's Secret Campaign to Crack, Undermine Internet Security," *ProPublica*/*New York Times*, September 5, 2013, http://propublica.org; "Microsoft Handed the NSA Access to Encrypted Messages," *Guardian*, July 11, 2013, http://theguardan.com; Greenwald, *No Place to Hide*, 112–15.
66. "Exclusive: Secret Contract Tied NSA and Security Industry Pioneer," *Reuters*, December 20, 2013, http://reuters.com.
67. "C.I.A. Is Said to Pay AT&T for Call Data," *New York Times*, November 7, 2013, http://nytimes.com.
68. Glenn Greenwald, "NSA Collecting Phone Records of Millions of Verizon Customers Daily," *Guardian*, June 6, 2013, http://theguardian.com; "CIA is Said to Pay AT&T for Call Data," *New York Times*, November 7, 2013, http://nytimes.com; Electronic Frontier Foundation, "NSA Spying on Americans," https://eff.org.
69. "Microsoft, Facebook, Google, and Yahoo Release US Surveillance Requests," *Guardian*, February 3, 2014, http://theguardian.com.
70. Larry Greenemeir, "The Drone Wars," *Scientific American*, September 2, 2011, http://scientificamerican.com.
71. "Why Facebook and Google Are Buying Into Drones," *Guardian*, April 20, 2014, http://theguardian.com; Denise Young, "The Edge of Possibility: Regina Dugan," *Virginia Tech Magazine* 35, no. 4, Summer 2013, http://vtmag.vt.edu; Alan McDuffie, "Darpa Turns Aging Surveillance Drones Into Wi-Fi Hotspots," *Wired*, April 14, 2014, http://wired.com.
72. "U.S. Marketing Spending Exceeded $1 Trillion in 2005," *Metrics 2*.0, June 26, 2006, http://metrics2.com; John Bellamy Foster, Hannah Holleman, and Robert W. McChesney, "The U.S. Imperial Triangle and Military Spending," *Monthly Review* 60, no. 5 (October 2008): 1–19; U.S. Bureau of Economic Analysis, *Survey of Current Business*, May 2008, 43, http://bea.gov.
73. Max Haiven, "Financialization and the Cultural Politics of Securitization," *Cultural Politics* 9, no. 3 (2013): 239–62.
74. Johnson, *Dismantling the Empire*, 104–5.
75. *Frontline*, "United States of Secrets," May 13, 2014, http://pbs.org; Ryan Lizza, "State of Deception," *New Yorker*, December 16, 2013, http://newyorker.com; Greenwald, *No Place to Hide*, 95–97; Electronic Frontier Foundation, "How the NSA's Domestic Spying Program Works," https://eff.org.
76. "Booz Allen, the World's Most Profitable Spy Organization," *Bloomberg Business Week*, June 20, 2013, http://businessweek.com; "Booz Allen Executive Leadership: John M. (Mike) McConnell, Vice Chairman," accessed May 30, 2014, https://boozallen.com.
77. Greenwald, *No Place to Hide*, 101; Glenn Greenwald and Ewen MacAskill, "Boundless Informant," *Guardian*, June 11, 2013, http://theguardian.com.
78. Greenwald, *No Place to Hide*, 48; "Ex-NSA Chief Details Snowden's Hiring at Agency, Booz Allen," *Wall Street Journal*, February 4, 2014, http://online.wsj.com.
79. Greenwald, *No Place to Hide*, 108.
80. Harding, *The Snowden Files*, 197–99.

81. Harding, *The Snowden Files*, 204.
82. Harding, *The Snowden Files*, 208–14.
83. "How We Know the NSA had Access to Internal Google and Yahoo Cloud Data," November 4, 2013, http://washingtonpost.com; Electronic Frontier Foundation, "How the NSA's Domestic Spying Program Works."
84. Harding, *The Snowden Files*, 203.
85. James Ridgeway, "Wesley Clark Remains Cagey on the Stump," *Village Voice*, January 13, 2004, http://villagevoice.com; "Tiversa Advisory Board: General Wesley Clark," accessed May 30, 2014, http://tiversa.com; "Ex-NSA Chief Details Snowden's Hiring at Agency, Booz Allen."
86. "Similarities Seen in Leaks by Snowden, Manning," *Baltimore Sun*, June 10, 2013, http://articles.baltimoresun.com.
87. On such groups see Heidi Boghosian, *Spying on Democracy* (San Francisco: City Light Books, 2013), 265–89.
88. John Nichols and Robert W. McChesney, *Dollarocracy* (New York: Nation Books, 2013).
89. On the global labor arbitrage see Foster and McChesney, *The Endless Crisis*, 137–54.
90. Adam Rawnsley, "Can Darpa Fix the Cybersecurity Problem from Hell?," *Wired*, August 5, 2011, http://wired.com. 2014, Volume 66, Issue 03 (July-August).



প্রতিচিন্তা

সমাজ ও নারী

# স্বামীর প্রবাসকালে গ্রামীণ বাংলার নারী : ক্ষমতা, শক্তি ও অধীনতার ধারণার পুনর্ব্যাখ্যা

**সৈয়দা রোযানা রশীদ**

**সারসংক্ষেপ**

নিম্নমুখী কৃষি খাত, বিশাল জনসংখ্যা, কর্মসংস্থানের অভাব এবং ব্যাপক দরিদ্রতার কারণে বিদেশে শ্রম অভিবাসন ক্রমে বাংলাদেশিদের জন্য একটি বিকল্প জীবিকায় পরিণত হয়েছে। অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ কাজের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর কয়েক লাখ পুরুষ তাঁদের স্ত্রী, সন্তান ও পরিজনকে গ্রামে রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রম অভিবাসন করেন। শ্রম অভিবাসী স্বামীর অভিবাসনকালে বাংলাদেশি গ্রামীণ নারীর অভিজ্ঞতার বিষয়টি নিয়েই এ প্রবন্ধ। বাংলাদেশের দুটি অভিবাসন-বহুল গ্রামের শ্রম অভিবাসীর স্ত্রীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, সাংসারিক দায়দায়িত্ব এবং প্রাধান্য-বিস্তারকারী জেন্ডার রীতিনীতি ও মূল্যবোধের প্রতি আচরণ ইত্যাদি গভীরভাবে অবলোকনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এখানে পর্যালোচনা করা হয়েছে। নারীর 'ক্ষমতা' ও 'ইচ্ছেশক্তি'র অর্থ এবং তাৎপর্যকে তাঁদের একক, যৌথ বা মা-বাবার পরিবারে অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে আমি দেখিয়েছি যে এসব নারীর ক্ষমতা, শক্তি, অধীনতা এবং ইপ্সিত জীবন উদার নারীবাদের 'নারী জাগরণ' ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' মডেলের ঊর্ধ্বে উঠে পুনর্ব্যাখ্যা দাবি করে।

**মুখ্য শব্দগুচ্ছ**

শ্রম অভিবাসন, বাংলাদেশি নারী, ক্ষমতা, ইচ্ছেশক্তি, জেন্ডার রীতিনীতি, প্রবাসীর স্ত্রী।

## ভূমিকা

বিগত কয়েক দশক যাবৎ দক্ষিণ এশিয়া এবং অন্যান্য স্থানে অভিবাসনবিষয়ক গবেষণায় জেন্ডারভিত্তিক বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। পূর্বে এ জাতীয় গবেষণায় নারীর স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন এবং জাগরণ বা মুক্তির বিষয় প্রাধান্য

পেলেও বিশ্লেষণের মাধ্যম হিসেবে জেন্ডার আলোচনায় বর্তমানে বিশেষত্ব, স্থানের বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন, নারী ও পুরুষের অভিবাসন অভিজ্ঞতায় পার্থক্য ইত্যাদির ওপর ক্রমাগত জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় এ প্রবন্ধ অভিবাসী পুরুষের অনুপস্থিতিতে নারীর জীবনযাপন ও অভিজ্ঞতাকে তাত্ত্বিক আলোচনার ভেতর দিয়ে উপস্থাপন করেছে। অভিবাসী স্বামীর অনুপস্থিতিতে একক, যৌথ এবং মা-বাবার পরিবারে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশির স্ত্রীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা অনুসরণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে এ আলোচনা উঠে এসেছে। উদার নারীবাদ বা উন্নয়নবিদ্যার মতো এ প্রবন্ধে নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক/জেন্ডার নিয়মকানুনগুলো নির্মূল করার কথা বলা হয়নি, বরং সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারীর বিশেষ ভূমিকা পালন বা বিরোধিতা করতে গিয়ে নারী যে বিভিন্ন প্রকার 'শক্তি' ও 'ক্ষমতা' ব্যবহার করে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো থেকে পুরুষ অভিবাসনের ফলে নারীর কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, তা নিয়ে সৃষ্ট তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকেই এ লেখার আগ্রহ তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে লীলা গুলাতির বেশ আগের একটি কাজের উদাহরণ দেওয়া যাক। ভারতের কেরালা রাজ্য থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী পুরুষ শ্রম অভিবাসীদের দেশে রেখে যাওয়া নারীর ওপর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে পুরুষের অভিবাসন নারীর সামাজিক নীরবতা বা বিচ্ছিন্নতা ভাঙতে সাহায্য করে এবং বাড়ির বাইরে বৃহত্তর গণ্ডির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও চলাফেরা বাড়িয়ে তোলে।[১] অন্যদিকে মাহারজান ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণায় উঠে এসেছে যে প্রত্যন্ত নেপালি গ্রাম থেকে পুরুষেরা যখন কাজের উদ্দেশে অন্যত্র যায়, গ্রামে রয়ে যাওয়া নারীর সঙ্গে তার সমাজের সম্পৃক্ততা স্বাভাবিকভাবেই তখন বেড়ে যায়।[২] সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া, সংসারের খরচ জোগানো, অভিবাসনের মাধ্যমে সম্পদ বাড়ানো ইত্যাদিতে নারীর সম্পৃক্ততা তার ক্ষমতায়ন এবং ক্ষমতারোহণ—দু-ই করে থাকে। একই ধরনের এক গবেষণায় দত্ত ও মিশ্র দেখিয়েছেন যে বিহারে নারীর কাজের ভার, চলাফেরা এবং পরিবারের ভেতরে ও বাইরের গণ্ডির সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, যখন তাঁদের স্বামীরা কাজের জন্য অন্য গ্রাম বা শহরে যান।[৩] এ ক্ষেত্রে অবশ্য লেখকদ্বয় দাবি করেন যে এ পরিবর্তন নারীর জীবন চালানোর পেছনে দুই বিশেষ বিষয়—পুরুষ গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (patriarchy) বা বর্ণপ্রথা, কোনোটাই বাতিল করতে পারেনি। দেশাই ও ব্যানার্জি বলেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে নারীর জীবন কীভাবে প্রভাবিত হবে, তার একটা মুখ্য নিয়ামক হলো সংসারের গঠন। বৃহত্তর পরিসরে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে গবেষণাকারীরা দেশে অবস্থানরত প্রবাসী শ্রমিকের স্ত্রীদের সামাজিক



মুক্তির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং দেখান, যেসব নারী স্বামীর অবর্তমানে একান্নবর্তী পরিবারে থাকে না, তারা অন্যদের চেয়ে অধিক কাজের দায়িত্ব ও চাপ মোকাবিলা করেন, আবার একই সঙ্গে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন।[৪] একান্নবর্তী পরিবারে রেখে যাওয়া নারীর এই চাপ বা স্বাধীনতা কোনোটিই নেই।

এ বিষয়ে বাংলাদেশি নারীর ওপরও গবেষণা হয়েছে। লন্ডনে সিলেটি অভিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর গার্ডনারের গবেষণায় বেরিয়ে আসে যে পুরুষের অভিবাসনের ফলে নারীর সাংসারিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষমতার প্রয়োগ বাড়ে।[৫] ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে যাদের স্বামী ব্রিটেনে ছিল, এমন কিছু অভিবাসী নারীর ওপর গবেষণায় গার্ডনার দেখান যে এই নারীরা তাদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যে সম্পর্ক তৈরি করেছিল, সেই নেটওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে সিলেট এলাকা থেকে আরও অভিবাসন হয়েছে।[৬] মধ্যপ্রাচ্যে শ্রম অভিবাসনে যাওয়া পুরুষের রেখে যাওয়া স্ত্রীদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জীবনযাপনের মান এবং সামাজিক অবস্থার ওপর আরেক গবেষণায় আকরাম ও করিম দেখান যে পুরুষ অভিবাসনে নারীর 'মুক্তি' ও 'ক্ষমতায়ন' হয়।[৭] তবে তাঁরা এও দেখান যে স্বামীর অবর্তমানে দেশে থাকা নারীর ওপর পুরুষ ও তার পরিবারের নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা বাড়ে। বাংলাদেশের চারটি জেলার ১০০টি পরিবারের ওপর পরিচালিত এ গবেষণায় লেখকেরা দেখিয়েছেন যে স্বামীর অভিবাসনে নারীর ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে : নারীর আত্মবিশ্বাস ও নিজে চলার শক্তি বাড়ে, একক পরিবারে থাকা নারীদের অনেকেই সংসার পরিচালনার ভার নেন, জমিজমা, সন্তানের লেখাপড়া, দেনা পরিশোধ এবং বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করতে গিয়ে নারী তা অর্জন করেন।[৮]

ওপরে আলোচিত গবেষণাগুলো পুরুষ শ্রম অভিবাসনে নারীর ওপর প্রভাব, যেমন : অতিরিক্ত কাজের চাপ, দায়িত্ব, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, আত্মবিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান তথ্য উপস্থাপন করলেও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। প্রথমত, নারীর অভিজ্ঞতাকে মুক্তি ও ক্ষমতায়নের কাঠামোতে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বেশির ভাগ গবেষণাই উন্নয়নবিদ্যার মতোই বাংলাদেশি এবং অন্যান্য অনুন্নত দেশের নারীদের 'নিপীড়িত', 'অসহায়' ও 'অক্ষম' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[৯] 'মুক্তি' ও 'ক্ষমতায়ন'-এর কাঠামোতে শ্রম অভিবাসীদের রেখে যাওয়া নারীর খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি যখন গবেষণা করা হয়, তখন অনেকাংশেই তাদের ইচ্ছে ও শক্তি, ঈপ্সিত জীবন এবং প্রতিনিয়ত পুরুষ গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজের নিয়মনীতির সঙ্গে বোঝাপড়া বা খাপ খাওয়ানোর বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে, বহিরাঙ্গনে নারীর অবাধ পদচারণ দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নকে বিচার

করা যায় না।[১০] তদুপরি, আলোচিত গবেষণার প্রায় সব কটিতেই যদিও বলা হয়েছে যে অভিবাসনের ফলে সংসারের অভ্যন্তরে ক্ষমতার সম্পর্কে, ব্যবহারে ও চর্চায় পরিবর্তন আসে, পুরুষ অভিবাসী দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সেগুলো কতটা বহাল থাকে বা পরিবর্তিত হয়, সে ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করা হয়নি।

বাস্তবে, নারীর ওপর পুরুষ অভিবাসনের প্রভাব ও ফলাফল এতই জটিল একটি বিষয় যে তাকে কেবল 'ক্ষমতায়ন' দিয়ে বিচার করলে তা ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় না। পুরুষের শ্রম অভিবাসনকে নারী কীভাবে মোকাবিলা করে তা বুঝতে হলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা জরুরি : স্বামী বিদেশে চলে যাওয়ার পর স্ত্রী নিজের কর্তব্য বা ভূমিকা সম্পর্কে কী ভাবেন? আপাত স্থানিক দূরত্ব পুরুষকে বিদ্যমান জেন্ডার নিয়ম ও নীতিগুলো নারীর ওপর প্রয়োগ করার সুযোগকে বাড়িয়ে তোলে, নাকি নারী তার পুরুষের শ্রম অভিবাসনের কারণে প্রচলিত কর্তৃত্বকারী জেন্ডার নিয়মনীতিকে অবজ্ঞা করার সুযোগ পায়? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য এ প্রবন্ধে আমি 'ক্ষমতায়নের' ধারণাগত কাঠামোতে আবদ্ধ না থেকে জোর দিয়েছি 'আমিত্ব' (selfhood), 'ইচ্ছাশক্তি' (agency) এবং 'ক্ষমতা'র (power) মতো ধারণার ওপর, যার গুরুত্ব দেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশি শ্রম অভিবাসীর স্ত্রীর প্রাত্যহিক জীবনকৌশল অনুধাবনের জন্য অপরিসীম।

## ধারণাগত কাঠামো

আগেই বলেছি যে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত কয়েকটি ধারণার ওপর এ প্রবন্ধের মূল আলোচনা নির্ভর করছে। এগুলো হলো: অধীনতা (subordination), ইচ্ছেশক্তি (agency) ও ক্ষমতা (power)। নারীবাদী তত্ত্বে 'অধীনতা'র ধারণা অনেক আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যেখানে দাবি করা হয় যে বিশ্বজনীন নারী পুরুষ গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের অধীন এবং এ 'অধীনতা' থেকে নারীর 'মুক্তি' প্রয়োজন। তবে, ১৯৭০-এর দশক থেকে চলে আসা 'তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদ', যা অধীনতার কাঠামোর ভেতরে মানবিক ইচ্ছের ওপর জোর দিয়ে আসছে এবং তাদের মতে নারীর স্বার্থ, আগ্রহ ও ইচ্ছেগুলো শ্রেণি, গোত্র, জাতি বা স্থানভেদে ভিন্ন হতে পারে।[১১] ভিন্নতার এ তত্ত্বই বলে দেয় যে 'অধীনতা'র ধারণা ততটা সরল নয়, যা বর্তমান প্রবন্ধেও প্রমাণিত হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জাগরণবিষয়ক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা বুঝতে হলে 'ক্ষমতা'র যে ধারণাগুলো গত কয়েক দশকে জন্মলাভ করেছে, তা আলোচনা করা প্রয়োজন। লিউকের মতে, প্রতিষ্ঠান ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণই কেবল ক্ষমতা নয়, বরং



অন্যের বিষয় ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়েই 'ক্ষমতা' বিকশিত হয়।[১২] উত্তর-কাঠামোবাদীগণ (post-structuralists) এ ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যেমন ফুকো (Foucault) ক্ষমতাকে দেখেছেন কোনো বিষয়ের ওপর প্রভাব খাটানোর চেয়ে বেশি কিছু হিসেবে। তাঁর কাছে 'ক্ষমতা' হলো বুদ্ধি ও কৌশলে নতুন নতুন ধারণা, ইচ্ছে, সম্পর্ক ও জ্ঞান (discourse) সৃষ্টির শক্তি।[১৩] তাঁর মতে, 'ক্ষমতা' এমন কোনো বিষয় নয়, যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ধারণ করবে, বরং এটি সমাজের ভেতর দিয়ে প্রবহমান, পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক।[১৪] জনগণের নিত্য ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক আদান-প্রদানের বা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা অবস্থান করে। স্বামীর অবর্তমানে বাংলাদেশি নারীদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে 'ক্ষমতা'র এ ধারণাই আমি ব্যবহার করব।

নারীর 'ইচ্ছেশক্তি' (agency) প্রসঙ্গে আমার প্রধান সংলাপী হলেন নৃতাত্ত্বিক সাবা মাহমুদ। 'ইচ্ছেশক্তি'কে যাঁরা 'প্রতিরোধ'দের (resistance) সমতুল্য মনে করেন, তাঁদের বিপরীতে এই লেখক দাবি করেন যে—

> ইচ্ছেশক্তির অর্থ ও ভাব আগে থেকে নির্দিষ্ট করা যায় না; তা বেরিয়ে আসে সুনির্দিষ্ট অবস্থিতি, দায়িত্ব ও কার্যকারিতা আছে এমন কিছু ধারণার বিশেষ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। সেদিক থেকে দেখলে, অগ্রগামিতার ধারণায় যাকে শোচনীয় নিষ্ক্রিয়তা বা অপ্রতিরোধ্যতা (deplorable passivity) এবং বাধ্যতা (docility) বলে মনে হয়, তা আসলে একধরনের 'ইচ্ছেশক্তি'। কিন্তু তাকে বুঝতে হলে সেই প্রচলিত ধারণা (discourse) বা অধীনতার কাঠামোর ভেতরেই তাকে খুঁজতে হবে, কেননা সেটাই এই 'ইচ্ছেশক্তি' ধারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। সেই অর্থে 'ইচ্ছেশক্তি'র ক্ষমতা কেবল প্রচলিত নিয়মকে প্রতিহত বা অবজ্ঞা করার মধ্যেই নয়, বরং তা প্রচলিত নিয়মের মধ্যে বসবাস ও সেগুলোকে নানাভাবে আত্মস্থ করার মধ্যে নিহিত আছে।[১৫]

'ইচ্ছেশক্তি'র এ ধারণাটিই আমার প্রবন্ধের মূল। 'শক্তি'র দুই রকম অর্থ, 'প্রতিহত করা' ও 'আত্মস্থ করা'কে ব্যবহার করে এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের পুরুষ কর্তৃত্বকারী গ্রামীণ সমাজের সাংস্কৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে অভিবাসীদের রেখে যাওয়া নারীদের কখনো আনত, কখনো গতিশীল নারীবাদী সচেতনতাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারী ও জেন্ডারবিষয়ক সাহিত্য সাধারণত পরিবারে, সমাজে ও অর্থনীতিতে নারীর মান ও অবস্থানকে পুরুষ গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও নির্ভরশীলতার নিরিখে বিচার করে।[১৬] মাহমুদ অবশ্য দেখিয়েছেন যে নারীর অধস্তন অবস্থান কখনো কখনো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং নারীর 'ইচ্ছেশক্তি' এবং নারীবাদী সচেতনতার এক গুরুত্বপূর্ণ রূপ। ক্ষমতা ও ইচ্ছেশক্তি ও উত্তর-কাঠামোবাদী ধারণার ওপর ভিত্তি করে এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে সত্যিকার অর্থে স্বামীর অনুপস্থিতিতে একজন 'ভালো স্ত্রী', একজন 'ভালো পুত্রবধূ', 'একজন সফল গৃহকর্ত্রী' অথবা 'একজন ভালো কর্মজীবী নারী' হতে চাওয়া বাংলাদেশিদের

বাস্তবতায় ভিন্নতা ও বৈপরীত্য আছে। এ বাস্তবতা অধীনতা ও ক্ষমতায়িত হওয়ার ব্যাপারে নারীর প্রতি যে মূল্যায়ন তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

### গবেষণাপদ্ধতির ওপর কিছু কথা

২০০৪-০৮ সালে মনপুর ও ঝুমপুর—বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার দুটো অভিবাসনবহুল গ্রামে পরিচালিত আমার উচ্চতর শিক্ষা (পিএইচডি) গবেষণা থেকে এই প্রবন্ধের উৎপত্তি।[১৭] প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গ্রামে একজন জাতিতাত্ত্বিক গবেষক (Ethnographer) হিসেবে আমার উপস্থিতি এবং জনগণের সঙ্গে মেলামেশায় শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হওয়া এবং ইউরোপে উচ্চশিক্ষারত একজন নারী হিসেবে আমার পরিচয় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১৮] উপরন্তু, গ্রামগুলোর সঙ্গে আমার ছিল বৈবাহিক সূত্রে পূর্ব আত্মীয়তার সম্পর্ক, যা আমাকে মানুষের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে। কিন্তু একই সঙ্গে আমার শহুরে এবং বিদেশে থাকার অভিজ্ঞতা আমাকে তাদের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। এ থেকে একদিকে যেমন আমি একজন বিদেশি জাতিতাত্ত্বিক গবেষকের মতোই গবেষণার সমাজকে একজন 'বহিরাগত'র দৃষ্টি থেকে দেখতে পেয়েছি, অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশি জাতীয়তা ও এলাকার 'পুত্রবধূ' হিসেবে পরিচয় আমাকে গবেষণা এলাকায় 'নিজের লোক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। আঞ্চলিক জাতিতাত্ত্বিক গবেষক সম্পর্কে নারায়ণের সেই উক্তি এখানে উল্লেখ্য: 'আমরা যারা নিজেদের সমাজ নিয়ে গবেষণা করি, তারা ধারণাগত উপাদানগুলোকে জেনে তারপর মাঠপর্যায়ে তা কতটা প্রযোজ্য তা দেখার বদলে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণের উপাদানগুলোকে পুনর্নামকরণ ও পুনর্গঠন করে থাকি।'[১৯] সত্যি বলতে কি, অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও সমাজ বিশ্লেষণের ভাষা আমাকে সাহায্য করেছে মনপুর ও ঝুমপুরের নারী ও পুরুষের জীবনকাহিনির এক নতুন অর্থ উদ্‌ঘাটন করতে। এ প্রবন্ধে প্রবাসী শ্রমিকের স্ত্রীর জীবন আলোচনা করতে গিয়ে এমন অনেক কাহিনি আমি ব্যবহার করেছি।

এ গবেষণাটি করার জন্য গ্রাম দুটি থেকে বাছাই করা ১১০টি অভিবাসী পরিবারের কাছ থেকে উপর্যুপরি গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয় নিরীক্ষা, অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার এবং কেস স্টাডি সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। ২০১০-১১ সালে গ্রাম দুটি আমি পুনঃপরিদর্শন করি এবং তথ্যগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো বোঝার চেষ্টা করি। এ সময় আমি দেখি যে কোনো কোনো নারী তার স্বামী বিদেশে যাওয়ার কারণে বা বিদেশ থেকে



ফিরে আসার পর বাসস্থান বদলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়ি বা বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এসেছে। নিজে নারী হওয়ার কারণে গ্রামের পুরুষদের তুলনায় সব বয়সী নারীদের সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও আমি নারী ও পুরুষ সবার জীবনের কাহিনিই সতর্কতার সঙ্গে রেকর্ড করি এবং তাদের গল্পের বিষয়বস্তু ও উদাহরণে পার্থক্য দেখতে পাই। নারীরা যেখানে সাংসারিক বিষয় যেমন: সন্তানের দেখভাল, সাংসারিক আয়-ব্যয়, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথনে বেশি আগ্রহী ছিল, পুরুষেরা তাদের অভিবাসন অভিজ্ঞতা বর্ণনাতেই অধিক সময় ব্যয় করেন।

আলোচনার সুবিধার্থে প্রবন্ধের বাকি অংশটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এবং গবেষণার গ্রামগুলোর আর্থসামাজিক অবস্থা। অভিবাসী স্বামীর অবর্তমানে নিজের ও স্বামীর একক পরিবারে, স্বামীর যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারে বা নিজের মা-বাবা, ভাইবোনের সঙ্গে বসবাসরত নারীদের জীবনকে কেন্দ্র করে মাঠপর্যায়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে দ্বিতীয় অংশে। শেষাংশে তথ্যগুলোকে ক্ষমতা, ইচ্ছেশক্তি এবং নারীর অধীনতার তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী নারীবাদী সচেতনতা বোঝার জন্য ক্ষমতা, ইচ্ছেশক্তি ও অধীনতার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলেও এ ব্যাপারে আমার মতামত হলো, এ ধারণাগুলো সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ওপর নির্ভর করে।

### শ্রম অভিবাসন ও গ্রামীণ বাংলাদেশ

বাংলাদেশকে কর্মসংস্থানের দিক থেকে প্রায়ই অভিহিত করা হয় দ্বৈত অর্থনীতি হিসেবে, যার একটি ছোট শিল্প খাত এবং অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী একটি কৃষি খাত রয়েছে।[২০] ১৬ দশমিক ৫ কোটি মানুষের ৭০ ভাগের বেশি যেখানে কৃষির ওপর নির্ভরশীল, সেখানে কৃষি খাত জিডিপির মাত্র ১৫ শতাংশ।[২১] নিম্নমুখী কৃষি খাত, বিশাল জনসংখ্যা, কর্মসংস্থানের অভাব এবং ব্যাপক দরিদ্রতার কারণে বিদেশে শ্রম অভিবাসন ক্রমশ বাংলাদেশিদের জন্য একটি বিকল্প জীবিকায় পরিণত হয়েছে।

### বাংলাদেশ থেকে বিদেশে শ্রম অভিবাসন

সরকারি মতে, ১৯৭৬ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৮ দশমিক ৭ মিলিয়ন বাংলাদেশি স্বল্পমেয়াদি শ্রম চুক্তিতে বিদেশে গেছেন। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি যান সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার,

ইরাক, লিবিয়া, বাহরাইন, লেবানন ও দক্ষিণ কোরিয়ায়।[২২] পরিসংখ্যানগতভাবে, শতকরা ৭৩ ভাগ বাংলাদেশি বিদেশে স্বল্প দক্ষ কাজে নিয়োজিত আছে। মাত্র ২৭ ভাগ বাংলাদেশি পোশাক বা অন্যান্য প্রস্তুতকারী শিল্প, গাড়িচালক, মেশিন অপারেটর, কাঠমিস্ত্রি, দরজি, রাজমিস্ত্রি বা এ জাতীয় পেশায় আছে। পেশাজীবী অর্থাৎ চিকিৎসক, নার্স, প্রকৌশলী ও শিক্ষক বিদেশে কর্মরত শ্রমশক্তির মাত্র শূন্য দশমিক ১৩ শতাংশ।[২৩] মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তুলনায় ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় কর্ম ভিসায় অবস্থিত বাংলাদেশির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

আমার গবেষণা এলাকায় জুলাই ২০০৮ সালে ১১০টি পরিবার ছিল, যেখান থেকে শ্রম অভিবাসন হয়েছে। দুই গ্রামের ৩১৫টি পরিবারের মধ্যে মনপুরে ৪৩টি এবং ঝুমপুরে ৬৭টি অভিবাসী পরিবার ছিল। এ এলাকা থেকে অভিবাসন আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে গবেষণার সময় পর্যন্ত ১১০টি পরিবার থেকে ১৯১টি যাত্রা আমি রেকর্ড করি, যার অর্থ হলো কোনো কোনো পরিবার থেকে এক ব্যক্তি একাধিকবার অথবা একই পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তি অভিবাসন করেছে। এই ১৯১টি যাত্রার শতকরা ৬০ ভাগ ছিল মধ্যপ্রাচ্যে, ৩৫ ভাগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং ৫ ভাগ অন্যান্য এলাকায়। জাতীয় চিত্র অনুযায়ী এই সংখ্যাগুলো যথাক্রমে শতকরা ৮২, ১৪ ও ৪ ভাগ।

বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসীর ৯৫ ভাগ পুরুষ। নিম্ন মজুরি, স্বল্পমেয়াদি চাকরি এবং শ্রম গ্রহণকারী দেশে অভিবাসীদের ওপর নির্ভরশীলদের (ডিপেনডেন্ট) আনা ও রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় নিম্ন আয়ের অদক্ষ, স্বল্প দক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকেরা তাঁদের পরিবারকে সাধারণত দেশে রেখে যান। সুতরাং অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ কাজের জন্য পুরুষ বিদেশে যায় এবং নারী গ্রামে থেকে সংসারের দেখাশোনা করে, সাধারণভাবে এটাই গ্রামীণ বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসনের জেন্ডার চিত্র।

## ঝুমপুর ও মনপুর—বাংলাদেশি দুই গ্রাম

ঢাকা থেকে সড়কপথে মাত্র ৫২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় অবস্থিত পাশাপাশি দুটি গ্রাম—মনপুর ও ঝুমপুর। সবচেয়ে কাছাকাছি বাজারটি আধা কিলোমিটার দূরে আর সবচেয়ে কাছের শহরটি পাঁচ কিলোমিটার। ঝুমপুরের নিজস্ব প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও মনপুরের শিশুদের শিক্ষার জন্য যেতে হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলগুলোতে। একটু বড় বাচ্চারা কাছাকাছি কিংবা দূরের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যায়। কাছের এক গ্রামেই আছে মেয়েদের জন্য মাদ্রাসা। গ্রামের আধা কিলোমিটারের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র



আছে। জরুরি বা জটিল চিকিৎসা বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এলাকাবাসী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায় স্বাস্থ্যসেবার জন্য।

গ্রাম দুটির পরিবারের গড় জনসংখ্যা ৫ দশমিক ৬ এবং গড় ব্যয় মাসে পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা। গ্রামে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের বাস, যেমন: কৃষক, কৃষিশ্রমিক, পরিবহনশ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার, বেতনভোগী কর্মচারী এবং বিদেশে কর্মরত শ্রমিক। জীবিকায় বৈচিত্র্য থাকলেও প্রায় সব পরিবারই কৃষি মৌসুমে নিজস্ব অথবা ধারে নেওয়া (বর্গা বা কট) জমি চাষ করে থাকে। মেঘনার অববাহিকায় অবস্থিত বলে ছয় থেকে আট মাসের বেশি এ অঞ্চলে চাষবাস করা যায় না। ৩১৫টি পরিবারের মধ্যে ২৭ শতাংশ ভূমিহীন এবং মাত্র ৭ শতাংশ লোকের চার একরের চেয়ে বেশি জমি আছে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৬ জন ইসলাম ধর্মের অনুসারী।

গ্রামীণ বাংলাদেশের সামাজিক গঠন বুঝতে হলে গুষ্টি (পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার একক) এবং পরিবারকে জানাটা জরুরি। একটি গ্রামে সাধারণত কয়েকটি গোষ্ঠী থাকে। ঝুমপুর এবং মনপুরে যথাক্রমে এ রকম ২৬ ও ১৯টি গোষ্ঠী আছে। প্রতিটি গোষ্ঠী আবার একাধিক পরিবারে বিভক্ত। একটি আদর্শ পরিবার একজন পুরুষ, তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে গঠিত। তবে, বাংলাদেশের অন্য অনেক জায়গার মতোই মনপুর ও ঝুমপুরে স্ত্রী ও সন্তানকে পুরুষের একান্ত পরিবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাপক অর্থে পরিবার বলতে একজন ব্যক্তির মা-বাবা, মা-বাবার মা-বাবা এবং বিবাহিত বা অবিবাহিত ভাইবোন যারা একই সংসারে, উঠানে, ভিটায় বা গ্রামে বসবাস করে বা করে না—এদের সবাইকে বোঝায়। বাংলাদেশে পরিবার প্যাট্রিলোকাল এবং প্যাট্রিলিনিয়াল। প্রচলিত প্রথায় মেয়েরা বিয়ের পর মা-বাবার সংসার ছেড়ে স্বামীর সংসারে স্থানান্তরিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেরা বিয়ের পর মা-বাবার সংসার থেকে ভিন্ন হয়ে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আলাদা সংসার গড়ে তোলে।

বাংলাদেশে নারীর জীবন অনেকাংশে পর্দাপ্রথা দিয়ে পরিচালিত হয়। তবে, মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ইসলামি দেশের মতো নারীর ওপর পর্দা এ দেশে বাধ্যতামূলক নয়। গ্রামে যেমনটা দেখেছি, উন্নত রাস্তাঘাট, পরিবহনব্যবস্থা এবং স্থানীয় বাজার প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নারীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত বেড়েছে বহুগুণ। মেয়েরা গৃহে পরিসীমায় আবদ্ধ থাকবে, এমনটি আজকাল আর আশা করা হয় না। তবে, সমাজ তাদের কাছ থেকে আশা করে যে তারা যেভাবেই হোক, নির্দিষ্ট মাত্রায় নিজেদের পর্দা মেনে চলবে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এ নিয়ে আরও আলোচনা রয়েছে। মূলত, এ প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশি নারীর ভূমিকা ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক আবর্তিত হয়।

## অভিবাসী স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর জীবন

আমার জাতিতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখেছি যে পুরুষ অভিবাসনের ক্ষেত্রে নারীর জন্য সাধারণত তিন ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়: ক. অভিবাসীর স্ত্রী তার সন্তানদের নিয়ে স্বামীর গ্রামেই নিজস্ব একক পরিবারে থাকে, খ. স্ত্রী তার সন্তানদের নিয়ে গ্রামে বা শহরে স্বামীর যৌথ পরিবারে থাকে এবং গ. সে তার সন্তানদের নিয়ে নিজের বাবার বাড়িতে চলে যায়। এই তিন ক্ষেত্রেই নারীদের দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে বিশদ তথ্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে নিচে তুলে ধরা হলো যে পুরুষের অনুপস্থিতিতে নারী কীভাবে তার চারপাশের জগৎ রচনা করে।

### ক. 'সংসারপ্রধান' নারী

প্রতিদিন ফজরের ওয়াক্তে[২৪] আমার ঘুম ভাঙে। নামাজ পড়ার পর ঘর পরিষ্কার করি। রাতের অধোয়া থালাবাসন নিয়ে পুকুরপাড়ে যাই। এরপর সকালের নাশতা তৈরি করি। সকাল নয়টার মধ্যে ছোটটা (দুই বছর বয়স) ছাড়া আমার সব বাচ্চা স্কুলে চলে যায়। তারা নিজেরাই চলে যায়। দুইটার আগে তারা ফেরত আসে না। সংসারের কাজ, যেমন: উঠান ঝাঁট দেওয়া, লাকড়ি আনা, মুড়ি তৈরি করা, ধান শুকানো, দুপুরের খাবার বানানো ইত্যাদির জন্য আমি যথেষ্ট সময় পাই।...

... গত বছর আমরা সারা বছরের খোরাকি চালানোর জন্য ধান, আলু—এসব চাষ করে ঘরে তুলেছিলাম (সংগ্রহ করেছিলাম)। কিন্তু তেল, পেঁয়াজ, মরিচ—এসব তো প্রতি মাসেই কিনতে হয়। মাছ, মাংস বা শাকসবজি রাখার জন্য আমার কোনো ফ্রিজ নেই, প্রায় প্রতিদিনই এগুলো কেনা লাগে। বাজার করার জন্য সব সময় লোক পাই না। আমার বড় ছেলে (১২ বছর বয়স) যা পারে করে, মাঝেমধ্যে বাসার সামনে দিয়ে প্রতিবেশীরা বাজারে গেলে তাকে বলে প্রয়োজনীয় জিনিস আনিয়ে নিই। বোঝেন তো, আমাদের মতো নারীরা বাজার গেলে ভালো দেখায় না।...

বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে খাওয়াদাওয়া করতে করতে বেলা দুইটা। কিন্তু বিকেল তিনটা-চারটার আগে আমার কাজই শেষ হয় না। খাওয়াদাওয়ার পর বিকেলে একটু বিশ্রাম নিই। নিজস্ব সময় বলতে আমার এটাই। মাঝেমধ্যে আশপাশের বাসার আত্মীয়-পরিজন মেয়েরা আসে, একসঙ্গে বসে টেলিভিশন দেখি, গল্প করি।...সন্ধ্যার পর বাচ্চাদের লেখাপড়া দেখি। একটু না দেখলে পড়তে চায় না।...আমি সাধারণত রাতের রান্নাও দিনে করে ফেলি। রাতে রান্নাঘরের কাজ তেমন রাখি না।...

আমাদের আড়াই বিঘার (.৭৫ একর) মতো জমি আছে। আমার স্বামী দেশে থাকতে আমরা নিজেরাই সেটা চাষবাস করতাম। নিজে খাটতে পারলে নিজের জমি চাষ করে লাভ আছে। তা ছাড়া নিজের জমি চাষ করাটা লাভজনক হয় না। স্বামী বিদেশে যাওয়ার পর আমি বদলি-মুনি (কৃষিশ্রমিক) দিয়ে চাষ করানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখা যায় তাদের ভাড়া করতেই অনেক খরচ। আবার ফসল তুলতেও একার জন্য অনেক পরিশ্রম হয়ে যায়। তাই কয়েক বছর ধরে আমি জমিটা বর্গা (ভাড়া) দিয়ে দিই আর এর বদলে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক আমি পাই। প্রতিবছর অবশ্য এক নিয়মে হয় না। কখনো কখনো টাকার বিনিময়ে জমি কট (দীর্ঘমেয়াদি ভাড়া) দিয়ে দিই। তখন আর ফসলের ভাগ পাই না।...



আমার স্বামী তিন মাস অন্তর বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়। সংসারের খরচ চালানোর জন্য আমি প্রতি মাসে ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা ওঠাই। দাউদকান্দি সদরে (জেলা শহর) জনতা ব্যাংকে আমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে, এখান থেকে বেশি দূরে না, পাঁচ কিলোমিটার হবে। আমার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েই আমার স্বামী ফোন করে। তখন আমি গিয়ে টাকা উঠিয়ে নিয়ে আসি। মাঝেমধ্যে টাকা শেষ হয়ে গেলে আশেপাশে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার করি। বিদেশ থেকে টাকা এলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই ঋণ শোধ করে দিই।[২৫]

স্বামীর অবর্তমানে একক সংসারের প্রধান মরিয়ম (৩৫) তার জীবনচিত্র এভাবেই আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন। মরিয়মের মতো অনেক নারীই অভিবাসী স্বামীর অবর্তমানে তাঁদের দায়িত্ব অতিরিক্ত ও ভারবহুল মনে করেন। পারুল (৩০) নামে আরেক গৃহবধূ আমাকে বলেছিলেন, 'বিদেশ করবে জানলে আমার মা-বাবা কখনোই আমাকে এই লোকের (বর্তমান স্বামী) সঙ্গে আমার বিয়ে দিত না। বিদেশে যাওয়ার আগে আমাদের বলা হয়েছিল যে গ্রামে তার ছোটখাটো ব্যবসা আছে।' একক অভিবাসী পরিবারের প্রধান কয়েকজন নারী আমাকে বলেছেন যে তাঁরা কখনো অভিবাসীর কাছে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দেবেন না, কারণ তাঁরা জানেন, 'অভিবাসী স্বামীর ঘর করতে কেমন লাগে।' অন্য ভাষায়, পুরুষ গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের 'অধীনে' থাকার চেয়ে 'মুক্তি' ও 'স্বাধীনতা' যে সব সময় নারী বেশি চায়, তা নয়। এসব নারীর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে যে তাঁদের স্বামীর উপস্থিতিতেই তাঁরা নিজেদের অধিক 'ক্ষমতাবান' মনে করেন।

গবেষণায় দেখেছি যে বেশির ভাগ অভিবাসীই নিয়মিত দেশে আসেন এবং জমিজমা বর্গা/কট দেওয়া/নেওয়া এবং বাচ্চাদের লেখাপড়া বা বিয়েসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেশে থাকা অবস্থায় সুরাহা করে যান। পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় যেমন মেয়ের বিয়ে বা ছেলের বিদেশে যাওয়া ইত্যাদিতে বিদেশে অবস্থানের কারণে স্বামীর মতামত পাওয়া কঠিন হয়ে পড়লে স্ত্রী সাধারণত তার নিজের বা স্বামীর বড় ভাই বা অন্য কোনো বয়স্ক আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ নেন। খুব কম নারীই আমি দেখেছি, যাঁরা তাঁদের স্বামী, ভাই, ছেলে বা শ্বশুরবাড়ির সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

### খ. যৌথ পরিবারে রেখে যাওয়া নারী

আমি যখন মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করছিলাম গবেষণার গ্রামে, তখন অভিবাসীর স্ত্রীদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শ্বশুরালয়ে যৌথ পরিবারে অবস্থান করছিল। তাদের একজন নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন:

'তারা (দেশে থাকা পরিবারের পুরুষ) বাজার আনে আর আমাদের (বউরা) কাজ হলো সবার জন্য রান্না করা।' সত্যিকার অর্থে, যৌথ পরিবারের নারীরা অপেক্ষাকৃত বড় পরিবারের সবার অন্ন নিশ্চিত করার জন্য অর্ধেকের বেশি সময় রান্নাঘরে কাটান, যা একক পরিবারের 'সংসারপ্রধান' নারীর তুলনায় অনেক গুণ বেশি। তাঁদের অন্য কাজের মধ্যে অন্যতম হলো বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখভাল করা, শিশুদের যত্ন নেওয়া ও মেহমান, বিশেষ করে স্বামীর বিবাহিত বোন ও তার স্বামীদের আপ্যায়ন করা। নারীপ্রধান পরিবারের চেয়ে পুরুষ লোকবল বেশি থাকায় যৌথ পরিবারগুলো খোরাকি (সারা বছরের খাদ্য) নিশ্চিত করার জন্য কৃষিকাজ করে থাকে। ফসল উৎপাদনের মৌসুমে ফসল তোলার কষ্টসাধ্য কাজ থাকে বলে যৌথ পরিবারে থাকা স্ত্রীদের পরিশ্রম বেড়ে যায় অনেক গুণ। এত কিছু সত্ত্বেও নারীপ্রধান একক পরিবারের চেয়ে যৌথ পরিবারের নারীর কর্মভার কম, কেননা যৌথ পরিবারে নারী তাঁর কর্মভার অন্য নারী ও পুরুষের সঙ্গে ভাগ করে নেন। একক পরিবারে যেখানে নারী নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে থাকেন, যৌথ পরিবারে সাধারণত পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নারীকে (শাশুড়ি বা বড় ছেলের বউ) কে কী কাজ করবে তা ভাগ করে দেন। অপেক্ষাকৃত নববিবাহিতদের ক্ষেত্রে তাঁদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করতে হয়। কিন্তু এ অবস্থাকে 'ক্ষমতাহীন করা' (disempowerment) বলে মূল্যায়ন করা ঠিক নয়। এসব নারীর ক্ষমতা ও শক্তিকে দেখতে হবে গ্রামীণ বাংলাদেশের অধস্তনতা/অধীনতার যে ধারণা (discourse) এবং কাঠামো নারীকে একজন 'ভালো পুত্রবধূ', 'ভালো মা' বা 'ভালো স্ত্রী' হিসেবে দেখতে চায়, তার নিরিখে।

গ্রামে অন্তত ১৩টি পরিবার আমি পেয়েছি, যেখানে অভিবাসী ব্যক্তির মা তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে বসবাস করছিলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিধবা মা তাঁর প্রবাসী ছেলের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে বসবাস করছেন, বিশেষ করে নববিবাহিত পুত্রবধূর সঙ্গে অথবা প্রবাসীরা যখন শিশুসন্তান দেশে রেখে যান। সাধারণভাবে সমাজ ধরে নেয় যে অল্প বয়সী বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়ের একা থাকা উচিত নয়, তারা সহজেই পুরুষের যৌন আক্রমণের শিকার হতে পারে। এ ধরনের বদনাম থেকে দূরে থাকার জন্য প্রবাসীরা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে মায়েদের থাকাটা শ্রেয় মনে করে। তবে একই গৃহে বসবাসকারী পুত্রবধূ ও শাশুড়ির মধ্যে সংসার পরিচালনায় কে দায়িত্ব নেবে, সেটা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন : ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, বয়স ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখেছি শাশুড়ি অতিরিক্ত বৃদ্ধ ও সংসারের দায়িত্ব নিতে অপারগ হওয়ায় প্রবাসীর স্ত্রীই শাশুড়িকে দেখাশোনাসহ সংসারের সব ভার নিয়েছেন। যা-ই হোক না কেন, সংসারে



শাশুড়ির উপস্থিতি নারীর জন্য প্রবাসীর স্ত্রীর সামাজিক সম্মানকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

গ্রামে প্রবাসীদের অনেক মা আছেন, যাঁরা স্বামীকে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে হারিয়ে খুব কঠিন হাতে সন্তানকে মানুষ করেছেন। অল্প বয়সে বিধবা হওয়া এসব নারীর অনেকেই নিশ্চিত কোনো আয়ের উৎস ছিল না। প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশে মা-বাবা, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন বা গ্রামের অবস্থাপন্নদের সাহায্য নিয়ে অনেক কষ্ট করে তাঁরা তাদের সন্তানদের মানুষ করেন এবং বিদেশে পাঠান। মা-ছেলের একসঙ্গে জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা ছেলেকে মায়ের সংসার চালানোয় বিচক্ষণতা ও বিদেশ থেকে পাঠানো টাকার সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে আস্থা তৈরি করতে সাহায্য করেছে। বিধবা মায়ের ক্ষমতার তুলনায় স্ত্রীদের সংসার পরিচালনায় নিতান্তই অদক্ষ ধরা হয়। কুয়েতফেরত কালামের (৩৭) ভাষ্যে তা স্পষ্টই ধরা পড়ে। তিনি বলেছিলেন : 'আমি আমার স্ত্রীকে এক টাকা পাঠালে সে দুই টাকা খরচ করে; আর মাকে এক টাকা পাঠালে আট আনা (.৫০ টাকা) খরচ করে আর আট আনা রাখেন ভবিষ্যতের জন্য।' সংঘাত এড়ানোর জন্য বেশির ভাগ পুত্রবধূ শ্বাশুড়ি যত দিন চান, তত দিনই সংসার চালানোর বিষয়টি মেনে নেন।

একক সংসারে নারীরা যেমন জমি বর্গা দেওয়া, ঋণ পরিশোধসহ বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা কীভাবে খরচ করা হবে ইত্যাদি সব আর্থিক ব্যাপারগুলো সামলান, যৌথ পরিবারে প্রবাসীর স্ত্রীদের তা করতে হয় না; যেহেতু পরিবারের পুরুষেরা এ দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। যে পরিবারে প্রবাসীর বিধবা মা সংসারের দায়িত্বে, সেখানেও প্রবাসীর স্ত্রীরা কোনো আর্থিক বিষয় দেখেন না। এ কথা সত্যি, বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা যেসব যৌথ বা মাপ্রধান পরিবারে একধরনের বিমা এবং আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে কাজ করে, সেখানে নারী তাঁর জীবিকা ও অর্থনৈতিকভাবে ভালো থাকার জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজনের ওপর নির্ভর করেন।[২৬]

অবশ্য, অনেক যৌথ পরিবারে প্রবাসীর স্ত্রী ও প্রবাসীর মা-বাবার মধ্যে বিদেশ থেকে প্রেরিত টাকা গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংকট সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক রীতিতে সংসারের বয়োজ্যেষ্ঠ সক্ষম পুরুষেরাই এই ভূমিকা পালন করার কথা। দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় তখনই, যখন প্রবাসী তাঁর নিজের নামে জমি কেনার জন্য অথবা সঞ্চয়ের লক্ষ্যে তাঁর স্ত্রীর কাছে সরাসরি টাকা পাঠান। এসব ক্ষেত্রে প্রবাসীর স্ত্রীকে সাধারণত দোষারোপ করা হয় তাঁর স্বামীর ওপর অতিরিক্ত 'প্রভাব' বিস্তার করার জন্য আর স্বামীকে বলা হয় যে তিনি তাঁর মা-বাবার প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছেন না। তবে, সামজিক অবস্থান, অথনৈতিক নিরাপত্তা, স্বামীর সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্য শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা যেখানে

খুবই জরুরি, প্রবাসীর স্ত্রীরা এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করেন। ফিরোজার (৩৫) কেসটাই ধরা যাক :

> বিদেশ যাওয়ার পর আমার স্বামী সব সময় আমার কাছেই টাকা পাঠাত। আর আমি সেখান থেকে নিজের খরচের টাকাটুকু রেখে বাকিটা আমার শ্বশুরকে দিতাম। একদিন আমার শ্বশুর বললেন যে ছেলের কামাই পুত্রবধূর কাছ থেকে নিতে তাঁর খারাপ লাগে। ছেলেকে টেলিফোনে জানালেন যে তার কাছ থেকে সরাসরি টাকা না পাওয়ায় তিনি অসম্মানবোধ করছেন। পরদিন আমি তাঁকে ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে একটা হিসাব খুলে দিলাম এবং আমার স্বামীকে বললাম সে যেন আমার হাতখরচ ও সংসার খরচের টাকা আলাদাভাবে যথাক্রমে আমার ও তার বাবার অ্যাকাউন্টে পাঠায়।[২৭]

বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে টানাপোড়েন এড়িয়ে স্ত্রীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রবাসীরা কখনো কখনো যৌথ পরিবারে রেখে আসা স্ত্রীদের জন্য গোপনে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অথবা বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় মারফত অর্থ পাঠান। মোবাইল ফোনে স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রবাসীরা এটি করতে পারেন। বাংলাদেশের বিস্তৃত গ্রামীণ অঞ্চল এখন বেসরকারি মোবাইল ফোন কোম্পানি যেমন : গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক ইত্যাদির নেটওয়ার্কের আওতাধীন। নারীপ্রধান প্রবাসী একক পরিবারগুলোতে নারীরা যখন মোবাইলে তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে কথা বলেন, তখন টাকাপয়সাসংক্রান্ত বিষয়ই বেশি প্রাধান্য পায়।

### গ. মা-বাবার সংসারে প্রবাসীর স্ত্রী

মাঠপর্যায়ে কাজ করার সময় আমার সঙ্গে ঝুমপুর ও মনপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যাঁরা স্বামী বিদেশে যাওয়ার কারণে তখন বাবার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এ রকম একজন হলেন রেবেকা (২২), যিনি আমাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন বাবার বাড়িতে থাকার কারণ :

> নিজের গ্রামে থাকার সুবিধা অনেক। গ্রামের সবাই আমাকে চেনেন, হয় তারা আমার আত্মীয়-পরিজন অথবা প্রতিবেশী। আমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারি। কেউ আমার নামে বদনাম করবে না। সত্যি বলতে কি, আমার শ্বশুরবাড়িতে কখনোই বিয়ের পর সেভাবে থাকা হয়নি। আমার স্বামী বিদেশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে ঢাকায় থাকতাম। সে যাওয়ার পরও কিছুদিন আমার শাশুড়িকে নিয়ে সেখানে থেকেছি। শাশুড়ি মারা যাওয়াতেই আমাকে এখানে আসতে হলো। আমার স্বামীর বড় দুই ভাই আছেন, যাঁরা আমার স্বামীর গ্রামে থাকেন। সেখানে আমি যেতে পারতাম, কিন্তু স্বামী ছাড়া সেখানে গিয়ে থাকতে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। কে কীভাবে চিন্তা করে তা তো বলা যায় না। আমাদের দেশে (কুমিল্লা অঞ্চলে) মানুষ বাড়ির বউ কী করে না করে সবকিছু খেয়াল করে। আমি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করি। বাচ্চার লেখাপড়ার দিকটাও তো দেখতে হবে...এই সবকিছুই আমি তাকে (স্বামীকে) বুঝিয়ে বলেছি। সে আমাকে এখানে (মা-বাবার সঙ্গে) এসে থাকতে বলেছে। আমি আর আমার মেয়ে আমার দাদির সঙ্গে এই রুমে থাকি। কিছুদিন আগে বাবার স্ট্রোক হয়েছে...তিনি এখন আমাকে ছাড়া কিছুই বোঝেন না। মা-বাবার জন্য কিছু করার এটা একটা সুযোগ। কিন্তু আমি থাকায় তাদের ওপর বাড়তি চাপ পড়ুক, সেটাও আমি চাই না। তাদের আর্থিক অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। স্বামী টাকা পাঠালে তার কিছু অংশ আমি প্রতি মাসেই তাদের দেওয়ার চেষ্টা করি।[২৮]

বেশির ভাগই একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন বা শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যুর কারণেই প্রবাসীর স্ত্রীরা তাঁদের মা-বাবার সঙ্গে থাকতে বাধ্য হন। কোনো কোনো মা-বাবা অবশ্য জোর করেই জামাইয়ের অবর্তমানে মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। অর্থনৈতিক অবস্থা যে রকমই হোক না কেন, বিবাহিত মেয়েরা বাবার বাড়িতে সব সময়ই সমাদৃত। ঘরের বউদের মতো, বাড়ির বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়েদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি বা সাংসারিক কাজে তেমন সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। বরং সন্তান প্রতিপালনে বিবাহিত মেয়েরা মা-বাবা, ভাইবোনের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা ও সহমর্মিতা পেয়ে থাকেন।

বিগত কয়েক দশকে এই গ্রামগুলোতে একই গ্রামের দুই পরিবারের মধ্যে বিয়ের প্রবণতা লক্ষ করা যায়, অভিবাসনের সঙ্গে যার একটা সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের বিয়ে হওয়া পুরুষ বিদেশে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রীকে তাঁর গ্রামেই রেখে যেতে পারেন, কারণ স্ত্রীও একই গ্রামের মেয়ে। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতোই, ঝুমপুর ও মনপুর গ্রামের যেসব মেয়ের একই গ্রামের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই অন্য গ্রামে বিয়ে হওয়া মেয়েদের তুলনায় নিজের বাবার বাড়ির সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বরং প্রবাসীর স্ত্রীকে দুই পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের (নিজের ও স্বামীর মা-বাবা) দেখভাল করার দ্বৈত দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বামীর পরিবারের সঙ্গে একাত্মতা ও নিজের বাবার পরিবারের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক—এই দুয়ের মিশ্রণে নারীর 'মেয়ে' ও 'বধূ' হিসেবে ভিন্ন যে পরিচয়, তা অনেক সময় ম্লান হয়ে যায়। বিষয়টি নারীপ্রধান প্রবাসী পরিবারের জন্য বেশি সত্যি, কেননা সেখানে মেয়েদের নিজের প্রয়োজনেই বাবার বাড়ির নিয়মিত সাহায্য দরকার হয়।[২৯] বাংলাদেশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, বিবাহিত মেয়েরা কেবল বিশেষ অনুষ্ঠানে বা মাঝেমধ্যে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে। স্বামী বিদেশে থাকার কারণে গ্রামীণ এ নিয়মে যথেষ্ট ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়।

### ঘ. প্রবাসীর কর্মজীবী স্ত্রী

> কিন্ডারগার্টেন স্কুলে আমি পড়ানো আরম্ভ করি মাত্র এক বছর আগে, কিন্তু ছোট বাচ্চাদের আমি বাসায় পড়াই বেশ কবছর ধরেই। গতবার হাফিজ (তার স্বামী) যখন বিদেশে যায়, আমাদের

পরিবারের অবস্থা ভালোই ছিল। তার চাকরিটা ভালো ছিল এবং প্রতি মাসেই টাকা পাঠাতে পারত। সে সময় আমার চাকরি করা এতটা জরুরি হয়ে ওঠেনি। এবার (স্বামীর দ্বিতীয়বার অভিবাসন) সে নিয়মিত টাকা পাঠাতে পারছে না। সৌদি আরবে গিয়ে এবার সে প্রায় আট মাসের মতো বেকার ছিল। ধারদেনা করে সব মিলিয়ে দেশে মাত্র ৩০ হাজার টাকার মতো পাঠাতে পেরেছে। দুর্ভাগ্যবশত এবার সে বিদেশ যাওয়ার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে আমাদের অনেক টাকা ঋণ হয়েছে। হাফিজের পাঠানো টাকার ৮০ ভাগ ঋণ পরিশোধ করতে গেছে। বাকি টাকা দিয়ে আমরা কীভাবে চলব? এটা কি সম্ভব?

...আমার শ্বশুর বাজারে একটা সিগারেটের দোকান চালান। বেশি হলে প্রতিদিন ১০০ টাকার মতো তিনি ঘরে আনতে পারেন, যেটা দিয়ে ঘরের কাঁচাবাজারটা কোনোরকম হয়। কিন্তু সংসারে আরও তো অনেক রকম খরচ থাকে: আমার তিন বছরের বাচ্চার দুধ, যক্ষ্মায় আক্রান্ত শাশুড়ির চিকিৎসা, ক্লাস নাইনে পড়া দেবরের পড়াশোনার খরচ, বিবাহযোগ্য এক ননদ, তার খরচ।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে আমি স্নাতক প্রথম বর্ষে পড়ার জন্য স্থানীয় এক কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হলো। বাধ্য হয়েই এই চাকরিটা নিয়েছি। স্কুল কর্তৃপক্ষ মাসে আমাকে মাত্র ৯০০ টাকা দেয়। এটা দিয়ে কী হয়? তা-ও আমি চালিয়ে যাচ্ছি, কারণ স্কুলের অনেক বাচ্চা আবার আমার কাছে প্রাইভেট পড়তে আসে। তাতে কিছু বাড়তি আয় হয়।[৩০]

ঝুমপুর গ্রামের মেয়ে এবং বউ শাপলা (২৫) এভাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন চাকরিতে যোগ দেওয়ার কারণগুলো। গ্রামে কোনো মধ্যবিত্ত ঘরের নারী বাইরে চাকরি করা মানে তাঁর স্বামী তাঁকে ঠিকমতো ভরণপোষণ দিতে অপারগ। সারা বাংলাদেশের মতোই গবেষণার গ্রামগুলোতেও দেখেছি যে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি এড়ানো ও তা দীর্ঘতর করার চেয়ে চাকরি করে অর্থ উপার্জন করাটা নারীর কাছে বেশি জরুরি নয়। তবে শাপলার ক্ষেত্রে যেমনটা দেখা গেছে যে অভিবাসনের প্রাথমিক বছরগুলোতে বিদেশ থেকে সংসারের প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট টাকা না এলে, স্বামী বা তাঁর পরিবারের প্রয়োজনেই বউয়ের চাকরি করাটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অন্য অনেক প্রবাসীর স্ত্রী যেখানে অর্থনৈতিকভাবে তাঁর স্বামী বা বাবার পরিবারের ওপর নির্ভরশীল, প্রবাসীদের কর্মজীবী নারী নিজের শিক্ষা ও দক্ষতাকে জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। অবশ্য এ জন্য তাঁদের অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়, যেহেতু বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থা পুরুষকে প্রধান উপার্জনকারী এবং নারীকে সংসার দেখাশোনার কর্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করে।

এ অবস্থায় কোনো কোনো নারী স্বামীর অসম্মানের বিষয়টি বিবেচনা করে ঘরে বসে উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ নাজমার কথা বলতে পারি। মনপুর গ্রামের নাজমা (৩৬) বড় একটা গরুর ফার্ম চালান। ছয় বছর আগে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে তিনি এই ফার্মটি চালু করেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের



সময় এই ফার্ম থেকে নাজমার নিট লাভ ছিল প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা, সংসারের খরচ চালানোর জন্য যা যথেষ্ট। স্বামী মালয়েশিয়া থেকে অনিয়মিতভাবে কিছু টাকা পাঠালেও এই ফার্মের সুবাদে নাজমাই আসলে হয়ে উঠেছেন সংসারপ্রধান, যদিও নিজেকে সেভাবে জাহির করার কোনো চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখিনি। শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির লোকজনকে বিদেশে পাঠানোর পেছনেও তাঁর আর্থিক অনেক অবদান রয়েছে।

মনপুর ও ঝুমপুরে কোনো কোনো পেশা মেয়েদের জন্য বেশি প্রযোজ্য। যেমন: স্কুলের শিক্ষক, বেসরকারি সংস্থার কর্মী, বিমা কোম্পানির প্রতিনিধি ইত্যাদি যেখানে মূলত নারী ও শিশুদের নিয়েই কাজ করতে হয়। নারীদের আকৃষ্ট করার জন্য কোনো কোনো স্কুলে নারী শিক্ষকদের জন্য বোরকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যেন তাঁর সামাজিক রীতিনীতি অক্ষুণ্ন রেখেই বাইরে কাজ করতে পারেন। বেতন পুরুষ শিক্ষকের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক নারী বাইরে কাজ করার এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করছেন।

## আলোচনা ও বিশ্লেষণ

ওপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে মনপুর ও ঝুমপুরে নারীর দৈনন্দিন জীবন পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য ও কৌশলে ভরপুর। নিচে চারটি ভিন্ন পরিস্থিতিকে বসবাসরত নারীর প্রাত্যহিক জীবনে চলার কৌশল ও বৈশিষ্ট্যগুলো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হলো:

### একক পরিবারে থাকা নারীর ক্ষমতা ও শক্তি

এ প্রবন্ধে উল্লিখিত একক পরিবারের প্রতিনিধি মরিয়ম যে 'ক্ষমতায়ন' ও 'নারী জাগরণ'-এর সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে নারীর জীবনে ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার অন্য রকম বহিঃপ্রকাশও ঘটে। নারীপ্রধান পরিবার বলতে সাধারণভাবে সেসব পরিবারকে বোঝানো হয়, যেখানে 'নারী হচ্ছেন প্রধান ভরণপোষণকারী, রক্ষাকর্ত্রী, ধারক-বাহক এবং সিদ্ধান্তপ্রণেতা।'[৩১] বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদি শ্রম অভিবাসী পরিবারের নারীপ্রাধান্য অবশ্য আমাদের সামনে অন্য একটি চিত্র উপস্থাপন করে, যেখানে নারী প্রধান ভরণপোষণকারীও নন, আবার প্রধান সিদ্ধান্তপ্রণেতাও নন। শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বিদেশে কর্মরত স্বামী হলেন প্রধান উপার্জনকারী এবং টেলিফোন যোগাযোগ থাকায় সর্বক্ষণই তিনি সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। কেবল তা-ই নয়, এমন অনেক স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, যাঁরা সংসারের হাল ধরা সত্ত্বেও স্বামীর

কাছ থেকে সংসার চালানোর জন্য মূল অর্থটুকুই কেবল পেয়ে থাকেন। সুতরাং 'স্বামী বিদেশে আছেন' বললেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংসারের সব ক্ষমতা স্ত্রীর হাতে চলে এসেছে—এ কথাটি বলা যায় না। ক্ষমতায়নের যে তত্ত্ব পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভেতরেও পরিবারপ্রধান নারীকে পুরুষের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে, আমার নৃতাত্ত্বিক এ গবেষণা তাকে সমর্থন করে না। বরং মরিয়মের ক্ষেত্রে যেমনটা দেখা গেছে, 'সংসারের পূর্ণ দায়িত্বভার নেওয়া' এবং 'সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া'র কাজটি একক পরিবারে নারীপ্রধানদের দায়বদ্ধতা এবং তাঁদের স্বামী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সুযোগকে বাড়িয়ে তোলে, যা যৌথ পরিবারে রেখে যাওয়া নারীর ক্ষেত্রে ঘটে না।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্বামী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর নারীর পারিবারিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনকি স্বল্প সময়ের জন্য ছুটিতে এলেও অভিবাসী স্বামী সংসারপ্রধানের ভূমিকা পালন করে। স্বামীর উপস্থিতিতে নারীর সাংসারিক কর্মভার হয়তো বেড়ে যায় বা অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু জমিজমা, ঋণ, নিত্য বাজার-হাট ইত্যাদির দায়দায়িত্ব স্বামী নেওয়াতে নারী মানসিকভাবে অনেক ভারমুক্ত হন।

উদার নারীবাদী ভাবনায় সংসারের বাইরের বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে বলে দাবি করা হলেও আমার গবেষণায় বিষয়টিকে এতটা সহজ মনে হয়নি, তা অনেকটাই জটিল। মরিয়ম এবং আরও কয়েকজন প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার 'ক্ষমতা', 'স্বাধীনতা', 'মুক্তি'—এ বিষয়গুলো নারী সব সময় উপভোগ করেন না। এ ক্ষেত্রে আসলে অর্থ, সম্পদ, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি (প্রবাসীর স্ত্রী) বা গোষ্ঠীর (পরিবার) কাছে থাকা কোনো বস্তুর ওপর নিয়ন্ত্রণকে ক্ষমতা বলা যাবে না।[৩২] ক্ষমতা হচ্ছে সমাজে বহমান ধারণা, ধারা ও নিয়মনীতির ওপর কৌশলগত সম্পর্ক আরোপ করার শক্তি।[৩৩] বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর সে বিবাহিত বা অবিবাহিত হোক, একাকী থাকাটা স্বীকৃত নয়। কিন্তু গ্রামে এই নিয়মের ভেতরেই যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গ্রামের অনেক একক পরিবার থেকে পুরুষপ্রধানেরা শ্রম অভিবাসী হওয়ার কারণে তাঁদের স্ত্রীর একা থাকতেই হচ্ছে। সমাজের শক্তিশালী যে জেন্ডার ধারণা নারীকে সংসার লালনকারী হিসেবে দেখে, সে সমাজই এখন অভিবাসী পরিবারের নারীর একক অবস্থান ও স্বামীর অবর্তমানে বহিরাঙ্গনের কাজ করাকে স্বীকার করে নিচ্ছে। সুতরাং, মরিয়মের ক্ষমতা স্বামীর অবর্তমানে সংসার পরিচালনায় ততটা নয়, যতটা রয়েছে সমাজ নারীকে যেভাবে দেখতে চায় সে ধারণা ও নিয়মের ভেতরে পরিবর্তন নিয়ে আসাতে, তা যত কম বা বেশিই হোক।



## যৌথ পরিবারে নারীর ক্ষমতা ও শক্তি

স্বামীর পরিবারে রেখে যাওয়া নারীদের ক্ষমতা ও শক্তির আরেক রকম অর্থ আমরা খুঁজে পাই। আকরাম ও করিম তাঁদের এক গবেষণায় দেখিয়েছিলেন যে স্বামীর অভিবাসনে তাঁর স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জীবনযাপনের মান এবং সামাজিক অবস্থান বাড়লেও স্ত্রীর ওপর তাঁর স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়দের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণও সেই সঙ্গে বাড়তে পারে।[৩৪] কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে নারীর 'নাজুক' অবস্থায় থাকার চিত্রটি আমার গবেষণায় দেখা যায়নি, বরং আমার কাছে মনে হয়েছে যে স্বামীর অবর্তমানে শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান করায় নারী শারীরিকভাবে নিরাপদ, অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল এবং সামাজিকভাবে সম্মানজনক বলে মনে করছেন, বিশেষ করে যাঁরা একক পরিবারে থাকেন, সেসব নারীর তুলনায়।

এসব নারীর ঈপ্সিত 'স্বাধীনতা' বা 'মুক্তি'র বিষয়টি গ্রামীণ বাংলাদেশে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশি গ্রামীণ সংস্কৃতিতে তিনিই একজন 'ভালো মেয়ে বা গুণী নারী' এবং 'ভালো বউ', যে তাঁর স্বামীর পরিবারের প্রতি সব সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন। দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে একজন নারীর জীবনে বিয়ে অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিয়ের পরে কেবল তাঁর ঠিকানা নয়, তাঁর আনুগত্য স্বামী ও তাঁর পরিবারের দিকে নিয়ে যেতে হয়। পূর্বাপর গবেষণায় পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে ভালো বউ হওয়ার সবচেয়ে বড় গুণ হলো নিজেকে স্বামীর পরিবারে নিবেদন করা।[৩৫] একক পরিবারে একজন গৃহিণীকে যখন বিচার করা হচ্ছে সংসার পরিচালনা ও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার ব্যাপারে তিনি কতটা বুদ্ধি, দক্ষতা ও বিবেচনার পরিচয় দিচ্ছেন, যৌথ পরিবারে একজন 'ভালো বউ'কে পরিমাপ করা হয় স্বামীর পরিবারের সদস্যদের প্রতি তাঁর 'ভদ্রতা', 'দায়িত্ববোধ' এবং 'পরিচর্যা'র ওপর। নারীত্বের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের অনেক নারীই জীবনের লক্ষ্য নিয়মনীতি মেনে একজন 'আদর্শ বউ' হওয়া। প্রগ্রেসিভ নারীবাদে যে 'মুক্তি' ও 'স্বাধীনতার' কথা বলা হয়, তা হয়তো এই নারীদের জীবনে নেই, কিন্তু নারী এর মধ্যেই তাঁর বিশেষ জায়গাটি খুঁজে পান।[৩৬] 'বাড়ির ভালো বা আদর্শ বউ' হওয়ার ওপর জড়িত নারীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্পর্ক। যৌথ পরিবারে একজন পুরুষের সুনাম এবং সম্মান অনেকটাই প্রভাবিত হয় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মা-বাবা ও পরিবারের অন্যদের সম্পর্ক কেমন, তার দ্বারা। অভিবাসী স্বামীর দেওয়া আর্থসামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক অবস্থানের বিপরীতে যৌথ পরিবারে অবস্থানকারী স্ত্রী তাঁর স্বামীকে দিতে চান একটি নির্ঝঞ্ঝাট দাম্পত্য জীবন, যার পূর্বশর্ত হলো স্বামীর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মানিয়ে চলা এবং একজন 'আদর্শ বউ' হওয়া। সব নারী যে এতে সফল হন,

তা নয়। যাঁরা ব্যর্থ হন, তাঁরা শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা হয়ে নিজে সংসার গড়েন অথবা তাঁর মা-বাবার পরিবারে স্থানান্তরিত হতে হয়।

মিসরীয় নারীদের মসজিদভিত্তিক ইসলামি আন্দোলনের ওপর লেখা মাহমুদের নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন যে নারী মৌলবাদ, নারীর অধস্তনতা, সামাজিক রক্ষণশীলতা ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা ইত্যাদিকে ব্যবহার (invoke) করে কীভাবে পুরুষনিয়ন্ত্রিত উপাসনালয়, মসজিদে ধর্মীয় আন্দোলন পরিচালনা করছেন। সেসব মিসরীয় নারীর সঙ্গে স্বামীর যৌথ পরিবারে রেখে যাওয়া বাংলাদেশি শ্রম অভিবাসীর স্ত্রীদের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুই ক্ষেত্রেই নিয়মনীতিকে প্রত্যাখ্যান বা প্রতিহত করছে, এ রকম সুনির্দিষ্ট কোনো 'নারীবাদী ইচ্ছেশক্তি' কোনো বহিঃপ্রকাশ এখানে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।[৩৭] বরং তাঁদের অনেক কর্মকাণ্ডে মনে হয় 'নারীর শোষণের হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন বিষয়গুলোকে যেন নারীরা অবলম্বন করছেন।[৩৮] দুই দেশের ক্ষেত্রেই উদার নারীবাদীরা হয়তো এসব নারীর ব্যবহারে পুরুষ শাসন নস্যাৎ করার উদ্যোগ আছে, এমন কোনো বহিঃপ্রকাশ বা উপাদান খুঁজে পাবেন না। তবে মাহমুদের মতো আমিও বলতে চাই যে যৌথ পরিবারে রেখে যাওয়া প্রবাসীর স্ত্রীদের 'ক্ষমতা' ও 'ইচ্ছেশক্তি'কে সে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ম ও রীতির মধ্যে খুঁজতে হবে, যেখানে বাংলাদেশি নারী তাঁর ক্ষমতা পান একজন 'আদর্শ স্ত্রী' বা 'ভালো বউ' হওয়ার মধ্যে। উপরন্তু, মাহমুদ দেখিয়েছেন যে মিসরীয় নারীদের ধর্মচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো 'নিয়ম আত্মস্থ করা বা নিয়মের মধ্যে বসবাস'।[৩৯] মিসরীয় নারীরা যে ইসলামি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তা সাধারণত 'নারীমুক্তি'র পক্ষে ক্ষতিকর বলেই বিবেচনা করা হয়। একইভাবে, বাংলাদেশি নারীরা যেভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিয়মগুলোকে পালন করতে পছন্দ করেন, তাতে আপাতদৃষ্টিতে তাদের 'অধস্তনতাই' প্রকাশ পায়। অথচ সত্যি বিষয়টি হলো, এ দুই ক্ষেত্রেই নারীরা 'বাধ্য' হওয়ার মধ্য দিয়েই পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। সুতরাং, নারীর 'নমনীয়তা' দিয়ে কখনোই তাঁর 'জাগরণ বা মুক্তি'র প্রয়োজনীয়তাকে পরিমাপ করা যায় না।

যৌথ পরিবারে প্রবাসীর মা যে ভূমিকা পালন করেন, সেটি নিয়েও আলোচনার অবকাশ আছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে নারীর জীবন, তাঁদের জেন্ডার ভূমিকা এবং পারিবারিক সম্পর্ক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়। নারীত্ব সম্পর্কে যে আদর্শ তা নারীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং 'মেয়ে', 'স্ত্রী', 'মা' ইত্যাদি হিসেবে ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। নৃতত্ত্ববিদ ল্যাম্বের মতে, নারী তাঁর জীবনের বিভিন্ন দশায় কর্তৃত্বকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক ও জেন্ডার নিয়মগুলোকে সমালোচনা ও প্রতিরোধ করে থাকেন এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম



ব্যাখ্যা দিতে পারেন।[৪০] এটা সত্যি যে বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে নারীর অবস্থান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তবে তাতে যে নারী পরিবারের ভেতরে খুব 'ক্ষমতাধর শাসক'-এ পরিণত হন, তা বলা যাবে না।[৪১] মনপুর ও ঝুমপুরের ক্ষেত্রে বরং দেখেছি যে পরিবারের পুরুষ আত্মীয়দের ওপরে নির্ভরশীলতা বয়স্ক নারীর ক্ষমতাকে অনেকাংশে খর্ব করে। প্রবাসীর বিধবা মায়েদের দেখেছি সারা বছরের খাবার কেনা, জমি ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদির জন্য তাঁদের বাবার বাড়ির সাহায্য নিতে। তবে পুত্রবধূর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সব সময়ই পুরুষ শাসকদের সঙ্গে তাঁদের নির্ভরশীলদের মতোই অসমান।

## বাবার বাড়িতে বসবাসকারী শ্রম অভিবাসীর স্ত্রীর ক্ষমতা ও শক্তি

স্বামীর একক বা যৌথ পরিবারে বসবাসরত স্ত্রীদের তুলনায় বাবার বাড়িতে অবস্থানকারী শ্রম অভিবাসী স্ত্রীরা তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য অধিকতর যৌক্তিক ও কৌশল বৃদ্ধির সুযোগ পান। স্বামীর অবর্তমানে কোথায় বসবাস করবেন, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং অন্যকে করানোর মধ্যেই এসব নারীর ক্ষমতা ও শক্তির উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। 'গ্রামের মেয়ে' (গ্রামে জন্ম, বড় হওয়া বা মা-বাবার সূত্রে গ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত) হিসেবে সামাজিক ভাবমূর্তি এবং বিবাহপূর্ব জীবনে প্রতিবেশীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গ্রামে মেয়েদের চলাফেরা ও জীবনযাপনে স্বাধীনতা দেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাবার বাড়িতে থাকা নারী, স্বামীর যৌথ পরিবারে থাকা নারীর তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ও সমর্থন পেয়ে থাকেন। গ্রোভারের মতে, 'বাবার বাড়ির সমর্থন কোনো নারীর জন্য অর্থ উপার্জনের ক্ষমতার চেয়েও বড় দর-কষাকষির অস্ত্র, কেননা নারীকে এটি এমন একটি পরিবেশে বসবাসের গ্যারান্টি দেয়, যেখানে নারীর একা থাকাটা সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়।[৪২] ইতিপূর্বে আলোচিত রেবেকা বা পারুলের জীবন অনেক কঠিন হতো, যদি তাঁদের বাবার বাড়ির সমর্থন ও সাহায্য না থাকত। বাবার বাড়ির আশ্রয় ও সাহায্য প্রবাসী স্বামীর স্ত্রীদের জন্য এক পরম প্রাপ্তি। এ সাহায্য পাওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করাতেই এসব নারীর ক্ষমতা ও শক্তি নিহিত। মাহমুদের ভাষায়, 'স্বনির্ধারিত লক্ষ্য ও পছন্দ তৈরি ও গ্রহণ করানোর জন্য নারীর অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর মুক্তির পথ প্রণয়নেই' এসব নারীর ক্ষমতা।[৪৩]

## প্রবাসীর কর্মজীবী স্ত্রীদের ক্ষমতা ও শক্তি

প্রবাসীর কর্মজীবী স্ত্রীদের যে কেসগুলো আলোচনা করা হয়েছে, তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে নারী সব সময় পুরুষের কর্তৃত্বের কাছে আনত হন না। পুরুষশাসিত সমাজের নিয়মনীতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং তাকে প্রতিহত করার

(counterveiling) কৌশল অবলম্বন—এ দুয়ের মধ্য দিয়েই নারী অবস্থা মোকাবিলা করে থাকেন। ঝুমপুর গ্রামে রেখে যাওয়া প্রবাসী হাফিজের স্ত্রী শাপলা নামের যে মেয়েটির কাহিনি এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে নারীর প্রতিদিনের জীবন কঠিন বাস্তবতায় ভরা, যেখানে পরস্পরবিরোধী ধারণা/জ্ঞান (discourse) বা নিয়মনীতির চর্চা করা হয়। যে সমাজ নারীদের বাইরে চাকরি করাকে সুনজরে দেখে না, সে সমাজে থেকেও শাপলা একদিকে স্বামীর অবর্তমানে স্কুলে চাকরি করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছেন। অন্যদিকে পরিবারের দেখভাল করার বিষয়েও তিনি যথেষ্ট মনোযোগী, সমাজ যেটা মেয়েদের প্রধান কাজ বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, শাপলার কেসটি নির্দেশ করে, কীভাবে গ্রামের কর্মজীবী নারী নিত্যপ্রয়োজন এবং জেন্ডার বিষয়ে সামাজিক নিয়মের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলেন। গ্রামীণ বাংলায় নারীদের বিষয়ে সামাজিক রীতিনীতিকে না ভেঙেও কীভাবে ঘরে বসে অর্থকরী কাজে নিযুক্ত হওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে নাজমা। বাড়ির বাইরে এসে কর্মক্ষেত্রে অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করাটা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ নারী ও পরিবারের জন্য অবমাননাকর বলে মনে করে।

ঢাকা ও লন্ডনে বাংলাদেশি নারীদের শ্রমবাজার বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে কী বিষয়গুলো কাজ করে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কবীর বলেছেন যে ঢাকার মেয়েরা যেখানে বাড়ির বাইরে পোশাক কারখানায় কাজ করাটি সামাজিকভাবে আইনসিদ্ধ করার জন্য 'পর্দা'কে দর-কষাকষির একটি হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে, লন্ডনে বসবাসরত বাংলাদেশি মেয়েরা এই 'পর্দা' রক্ষা করার জন্য কারখানার কাজের বদলে 'ঘরে বসে করা যায়' এমন কাজ বেছে নিয়েছেন। পরিবর্তিত সামাজিক নিয়ম ও মূল্যগুলো ঢাকায় তৈরি পোশাক কারখানাগুলোকে 'নারীর স্থান' হিসেবে চিহ্নিত করলেও লন্ডনের শ্রমবাজার বাংলাদেশি নারীর জন্য একটি নিষিদ্ধ স্থান। এর ভিত্তিতে কবীর মন্তব্য করেছেন যে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানায় কাজ করা মেয়েদের জীবিকা বাছাই করার ক্ষমতা 'পশ্চিমা দেশে' অবস্থানরত বাংলাদেশিদের স্ত্রীর তুলনায় বেশি।[৪৪]

কবীরের গবেষণার নারীদের সঙ্গে আমার গবেষণায় প্রবাসীর দেশে রেখে যাওয়া স্ত্রীদের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুই গবেষণাতেই 'পর্দাপ্রথা' নারীর সামাজিক নিয়মের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর একটি মাধ্যম হিসেবে এসেছে। উদার নারীবাদে যদিও পর্দাকে ধরা হয় পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে অধস্তন ও অক্ষম করে রাখার একটি হাতিয়ার হিসেবে; প্রকৃতপক্ষে, আমার গবেষণার গ্রামে যেমনটি দেখেছি, নারী পর্দাকে ব্যবহার করছে ইচ্ছেশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে।



যৌথ পরিবারে বসবাসরত প্রবাসী স্ত্রীদের প্রসঙ্গে আগে উল্লেখ করা হয়েছে নিয়মরীতিকে ভাঙা বা প্রতিহত করা হলো নারীর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের একটিমাত্র বহিঃপ্রকাশ, অন্যটি হলো নিয়মরীতিগুলোকে আয়ত্ত করা।[৪৫] অনেক সময় নারী নিয়ম মেনে চলার মধ্যেই তার ইচ্ছেশক্তি অর্জন করে, উদার নারীবাদে যাকে হয়তো নারীর স্বার্থবিরোধী মনে হতে পারে।

ওপরের আলোচনায় একটি বিষয় ইঙ্গিত করে, সেটা হলো নারীর ওপর পুরুষের শ্রম অভিবাসনের প্রভাব যেমন জটিল ও বহুমুখী, তেমনি 'আদর্শ নারী' কিংবা 'নারীর জীবনের লক্ষ্য বা মূল্য' কী হবে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। অবশ্য একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে পুরুষশাসিত সমাজের অনেক নিয়মকানুন ও মূল্যবোধ নারীর জীবনকে নেতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে চায়, অনেক নারীই তাঁর শিকার হয়। তবে এ ধরনের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য যে নারী তার প্রতিদিনের ব্যবহারে সমালোচনা, পুনর্ব্যাখ্যা বা প্রতিহত করার ভেতর দিয়ে 'প্রাত্যহিক প্রতিঘাত' রচনা করছেন, এমন ব্যাখ্যাও আসলে ভুল।[৪৬] প্রতিহত করা নিয়ে যে প্রবল 'ভাবাবেগ' (romanticization) তা উদার নারীবাদী ধারণার বাইরে নারীর ক্ষমতা ও ইচ্ছেশক্তিকে ব্যাখ্যা করা বা দেখার দৃষ্টিকে নষ্ট করে দেয়।[৪৭]

প্রকৃতপক্ষে, পুরুষ শ্রম অভিবাসনে নারীর জীবনের যে চিত্র এখানে উপস্থাপিত হলো, তাতে আমরা দেখি যে নারীকে নিয়ন্ত্রণকারী রীতিনীতি এবং তার প্রয়োগকে নারী কখনো নস্যাৎ করেছেন, কখনো জোরদার করেছেন আবার কখনো বা পুনঃসমন্বয় করেছেন। এটা প্রতীয়মান যে এসব নারীর জীবনে 'ক্ষমতা' আসলে প্রবাহিত হতে থাকে সমাজের দেহজুড়ে, যেখানে নারীর প্রতিনিয়ত গভীর চেষ্টা থাকে একজন 'ভালো গৃহিণী', 'ভালো পুত্রবধূ, অথবা 'ভালো কর্মজীবী নারী, যিনি কাজ ও সমাজের মধ্যে সমন্বয় করতে পারবেন', তা হওয়ার।[৪৮] একক পরিবারের প্রধান নারীর 'ক্ষমতা' যেখানে দেখি স্বামীর অবর্তমানে সংসারের দেখভাল করার মধ্যে এবং প্রচলিত জেন্ডার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সংসারের নিত্যকর্ম সম্পাদন, যৌথ পরিবারে রেখে যাওয়া প্রবাসীর স্ত্রীর শক্তি খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর স্বামীর পরিবারে একজন 'ভালো পুত্রবধূ' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা ও সুনাম অর্জনের মধ্যে। এই সুনাম নারীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, যা ব্যবহার করে স্ত্রী তাঁর স্বামীর সমর্থন ও পরিবারের মধ্যে ভালো একটি অবস্থান পেতে পারে। আবার কর্মজীবী নারীর ক্ষমতা ও শক্তি দেখা যায় প্রচলিত জেন্ডার নিয়মগুলোকে প্রতিহত ও আয়ত্ত করার মধ্যে। এককথায় বলা যায়, অভিবাসন নতুন ক্ষমতার সম্পর্ক তৈরির একটি হাতিয়ার, যেখানে নারীর অধস্তনতা সৃষ্টিকারী নিয়ম ও চর্চাগুলোই আবার নারীকে একজন সচেতন ব্যক্তি হিসেবে বিকশিত হতে সাহায্য করে।[৪৯]

## উপসংহার

এ প্রবন্ধে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকের দেশে রেখে যাওয়া নারীর গ্রামীণ জীবনকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে আমি দেখিয়েছি যে স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর একক, যৌথ বা বাবার পরিবারে থাকার ব্যবস্থা এবং সে বিশেষ পরিবেশে বিভিন্ন কৌশল নিয়োগ করার ওপর তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতি, সাংসারিক দায়দায়িত্ব এবং জেন্ডার নীতির প্রতি সম্পৃক্ততা বা অসম্পৃক্ততার মাত্রা নির্ভর করে। স্বামীর যৌথ পরিবার বা মা-বাবার পরিবারে রেখে যাওয়া নারীর তুলনায় একক পরিবারের দায়িত্বে থাকা নারীর বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি দখল থাকে এবং সাংসারিক কাজে বেশি স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের সাংসারিক দায়িত্ব অনেক বেশি পালন করতে হয়। একইভাবে, শ্বশুরবাড়িতে থাকা নারীরা সামাজিকভাবে বেশি মর্যাদা পেলেও স্বামীর পাঠানো টাকার ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ কম থাকে। আবার মা-বাবার পরিবারে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে অবস্থানরত স্ত্রীদের তুলনায় 'ভালো পুত্রবধূ' হওয়ার দায়টা যৌথ পরিবারের স্ত্রীদের ওপর অনেক বেশি। গ্রামীণ বাংলাদেশে বিয়ের পর মেয়েরা সাধারণত স্বামীর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় এবং বাবার বাড়ি অনেকটা 'পর' হয়ে যায়। কিন্তু এ গবেষণায় দেখা গেল যে স্বামীর শ্রম অভিবাসন অনেক সময় স্ত্রীকে তাঁর মা-বাবার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

পুরো প্রবন্ধে আমি নারীজীবনকে এঁকেছি উদার নারীবাদী ধারণার ঊর্ধ্বে। উদার নারীবাদ বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর সব নারীর কর্তৃত্বের সম্পর্ক থেকে মুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে থাকা নারীর সত্যিকার অবস্থানকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে না। মাহমুদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের এ কেসটি জেন্ডার ও অভিবাসনের বৃহত্তর ধারণার ভেতরে তুলে ধরার পেছনে আমার মূল উদ্দেশ্য হলো এটা দেখানো যে অনুদার সমাজব্যবস্থায় থাকা অনেক নারীর জীবনে চর্চিত ক্ষমতা ও শক্তিকে কেবল 'ক্ষমতায়ন' বা 'জাগরণ'-এর কাঠামোয় অনুধাবন করা সম্ভব নয়। গ্রামীণ বাংলাদেশি নারীদের চাহিদা ও পছন্দকে তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে আমি দেখিয়েছি যে বাংলাদেশি গ্রামীণ নারীর জীবনের বিশেষ আদর্শ আছে, যেটা তাঁরা অর্জন করতে সব সময় তৎপর। জীবনকে তাঁরা যেভাবে দেখেন, তা উদার নারীবাদে হয়তো অনুপযোগী ও অর্থহীন মনে হতে পারে, কিন্তু আলোচ্য নারীদের জীবনে এর বিপুল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে। প্রকৃতপক্ষে, আপন সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নিয়মনীতি মেনে চলে গ্রামীণ বাংলায় শ্রম অভিবাসীর স্ত্রীরা এক অন্য ধরনের 'ক্ষমতা'র চর্চা করেন, যা তাঁদের অস্তিত্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



## তথ্যসূত্র


1. Leela Gulati, *In the Absence of their Men: the Impact of Male Migration on Women* (New Delhi: Sage Publication, 1993).
2. Amina Maharjan, Siegfried Bauer, and Beatrice Knerr, "Do Rural Women Who Stay Behind Benefit From Male Out-Migration? A Case Study in the Hills of Nepal," *Gender, Technology and Development* 16:1 (March 2012), pp. 95-123.
3. Amrita Datta and Sunil K. Mishra, "Glimpses of Women's Lives in Rural Bihar: Impact of Male Migration," *The Indian Journal of Labor Economics* 54:3 (January 2011), pp. 457-477.
4. Sonalde Desai and Manjistha Banerji, "Negotiated Identities: Male Migration and Left-Behind Wives in India," *Journal of Population Research* 25:3 (October 2008), pp. 337-355.
5. Katy Gardner, *Global Migrants, Local Lives: Travel and Transformation in Rural Bangladesh* (Oxford: Clarendon Press, 1995), pp. 98-127.
6. Ibid.
7. Shahzada M. Akram and Khandaker R. Karim, *Security and Empowerment: The Case of Left Behind Wives of Bangladeshi Migrant Workers* (Dhaka: Bangladesh Freedom Foundation, 2004).
8. Ibid., p. 105.
9. For a wider discussion see Sarah C. White. *Arguing with the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh*. (London: Zed Books, 1992), p.158.
10. See Jane Parpart, Shirin Rai, Kathleen Staudt, eds., *Rethinking Empowerment: Gender and Development in a Global/Local World,* Vol. 3 (London: Routledge, 2002).
11. See for example Lila Abu-Lughod, *Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society* (Berkeley: University of California Press, 1999 (1986)); Chandra T. Mohanty, *Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity* (New Delhi: Zubaan, 2003).
12. Steven Lukes, *Power: A Radical View* (London: Macmillan, 1974), pp 23-24, cited in Stewart R. Clegg, *Frameworks of Power* (London: Sage Publications Limited, 1989).
13. For a wider discussion on post-structural construction of 'power' see Michel Foucault, *The History of Sexuality* Vol. 1 (London:

Pelican, 1981); Michel Foucault, "Truth and Power" in *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977,* ed. Colin Gordon (Brighton: Harvester Press, 1980), pp.122-128.

14. Foucault, *The History of Sextuality*.
15. Saba Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject* (Princeton: Princeton University Press, 2011 (2005)), pp. 14-15. Italics in the original.
16. See Jitka Kotalová, *Belonging to Others: Cultural Construction of Womenhood in a Village in Bangladesh* (Dhaka: University Press Ltd, 1996); Santi Rozario, *Purity and Communal Boundaries: Women and Social Change in a Bangladeshi Village* (Dhaka: University Press Limited, 2001 (1992)).
17. Syeda Rozana Radhid, *Uncertain Tomorrows: Livelihood and Social Protection in International Labor Migration from Bangladesh (*Dhaka: University Press Limited 2014) (forthcoming).
18. I have used pseudonyms for the villages and respondents in order to maintain confidentiality.
19. Kirin Narayan, "How Native is a 'Native' Anthropologist," *American Anthropologist* 95:3 (September 1993), p. 678.
20. See, Mohammad A. Hossain, *Inflation, Economic Growth and the Balance of Payments in Bangladesh: A Macroeconomic Study* (New Delhi: Oxford University Press, 1995), Chapter 2.
21. Government of Bangladesh (GoB), *Year Book 2011* (Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, 2011).
22. Tasneem Siddiqui and Selim Reza, *Labor Migration from Bangladesh 2013: Achievements and Challenges* (Dhaka: RMMRU and MJF, 2014).
23. Ibid.
24. Time to offer Morning Prayer. Usually this is at 5 o'clock in the morning.
25. Author's interview with Marium, Jhumpur village, Comilla, August 23, 2005
26. See Alain Lefebvre, *Kinship, Honour and Money in Rural Pakistan: Subsistence Economy and the Effects of International Migration* (Richmond: Curzon Press, 1999), pp. 257-258.



27. Author's interview with Firoza, wife of a migrant from Monpur, village, Comilla, February 17, 2006.
28. Author's interview with Rebecca, Monpur village, September 20, 2005.
29. For further discussion see Sylvia Vatuk, *Kinship and Urbanization: White Collar Migrants in North India* (Berkeley: University of California Press, 1972), p. 147.
30. Informal conversation with Shapla of Jhumpur village, November 18, 2005. She was also my research assistant.
31. See Ranjana Kumari, *Women-Headed Households in Rural India* (London: Sangam, 1989), p. 37.
32. Lukes, *Power: a Radical View*; Foucault, *The History of Sexuality*, and Foucault, "Truth and Power."
33. Lukes, *Power: a Radical View*; Foucault, *The History of Sexuality*, and Foucault, "Truth and Power."
34. Akram and Karim, *Security and Empowerment*, p. 105.
35. See Kotalova, "Belonging to Others," p. 19-20**;** Betsy Hartmann and James K. Boyce, *A Quiet Violence: View from a Bangladesh Village* (Dhaka, University Press Limited, 1983). Pp. 88-91.
36. See for example Sherry B. Ortner and Harriet Whitehead, eds., *Sexual Meanings* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)
37. Mahmood, *Politics of Piety,* pp.5-8.
38. Ibid, p. 15.
39. See Sarah Lamb, *White Saris and Sweet Mangoes: Aging, Gender, and Body in North India* (Berkeley: University of California Press, 2000); Katy Gardner, *Age, Narrative and Migration: The Life Course and Life Histories amongst Bengali Elders* (London: Berg, 2002).
40. Lamb, "White Saris and Sweet Mangoes," p.198.
41. Ibid., p. 242.
42. Shalini Grover, *Poor Women's Experiences of Marriage and Love in the City of New Delhi: Everyday Stories of Sukh aur Dukh*. Unpublished DPhil Thesis (Brighton, University of Sussex, 2006) p. 63.
43. Mahmood, *Politics of Piety*, p. 10.

44. See Naila Kabeer, *The Power to Choose: Bangladeshi Women and Labor Market Decisions in London and Dhaka* (London:Verso, 2000).
45. Mahmood, *Politics of Piety,* p. 15.
46. See for example Gloria G. Raheja, and Ann G. Gold. *Listen to the Heron's Words: Reimagining Gender and Kinship in North India* (Berkeley, University of California Press, 1994).
47. Lila Abu-Lughod, "The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power through Bedouin Women," *American Ethnologist* 17: 1 (February 1990), p. 42.
48. See Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (Harmondsworth: Penguin, 1979 (1975)).
49. Mahmood, *Politics of Piety,* p. 17.






# লিসবনে শহীদ মিনার : পর্তুগালপ্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে স্মৃতি ও সম্প্রদায়ের রাজনীতি এবং দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ

**হোস ম্যাপ্রিল**

**সারসংক্ষেপ**

বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশি বহুজাতিক জনপরিমণ্ডল ক্রমান্বয়ে গুরুত্বসহকারে বেড়েছে। এ প্রবন্ধে মূলত বহুজাতিক রাজনৈতিক কার্যক্রমকে ফোকাস করা হয়েছে। এখানে মুখত যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি ও বাংলাদেশি অভিবাসীদের একাত্মতার উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও অন্যান্য অঞ্চলে এ জনপরিমণ্ডল থেকে অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা সরিয়ে রাখা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে এ প্রবন্ধে, ২০১১ সালের লিসবন স্কয়ারে শহীদ দিবস উদ্‌যাপনের বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে বহুজাতিক রাজনৈতিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত, এ বাংলাদেশি জনপরিমণ্ডল যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিদের বাংলাদেশ ও অন্যান্য এলাকা যেমন পর্তুগালে প্রতীক, দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ এবং রাজনীতির স্মৃতির মাধ্যমে যুক্ত করে। দ্বিতীয়ত, এ লেখাতে বলা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশিদের বসবাস এবং এর নতুন অর্থ অনুমিত হয় সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়।

**শব্দগুচ্ছ :** বহুজাতিক জনসাধারণের এলাকা, শহীদ দিবস, রাজনীতির স্মৃতি, লুসো-বাংলাদেশি।

## প্রারম্ভিক আলোচনা

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর, শহীদ দিবস, বাংলা ভাষা দিবস ইউনেসকো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পর্তুগালের[১] কেন্দ্রীয় লিসবনে মার্টিম মনিজ স্কয়ারে ২০১১ সালের একুশ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত/পালিত

হয়। অনুষ্ঠিত দিবসটি একটি ঘরোয়া বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন 'বন্ধুদের বন্ধু' দ্বারা সংগঠিত হয়। এটি সংগঠনে লিসবন সিটি হল ও রেনোভার আ মৌরারিয়া (একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যা এ এলাকার পুনঃসংস্কার করে) সহায়তা দিয়েছে। শহীদ মিনারের রেপ্লিকা, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত, সেখানে ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু মাতৃভাষা হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাঙালি ছাত্রদের হত্যা করার সূত্রপাত হয়েছিল। তা মার্টিম মুনিজ স্কয়ারের দক্ষিণ পাশে সাময়িকভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই স্কয়ারটি মৌরারিয়ায় অবস্থিত, যা গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক উপদেশ দ্বারা 'অভিবাসী প্রতিবেশী' হিসেবে বর্ণিত। মার্টিম মুনিজ স্কয়ার নামটি ১২ শতাব্দীতে পর্তুগালের ভিত্তিপ্রস্তর এবং মুরদের থেকে লিসবন জয় করার শিল্পানুগ হিসেবে পরিচিত। এই এলাকা লাল ও সবুজ কার্পেট দিয়ে সাজানো হয়েছে, যা বাংলাদেশের পতাকার রং এবং একটি বড় পোস্টার বাংলা ও পর্তুগিজ ভাষায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস : ২১ ফেব্রুয়ারি'। প্যানেলের সাজে বাংলাদেশি ও পর্তুগিজ পতাকা এবং ঢাকায় সজ্জিত শহীদ মিনারের ছবি প্রাধান্য পেয়েছে। পর্তুগিজ ও বাংলাদেশি জাতীয় পতাকা স্কয়ারের দক্ষিণ দিকে পাশাপাশি উড়ছিল।

একটি ছোট একুশে[২] বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বাংলা উপন্যাস, ছোটদের বই, শিক্ষাসংক্রান্ত দলিল এবং ডিভিডি বিক্রি হয়েছে। ১৪ এপ্রিলের বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখের উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠানও ঘোষণা করা হয়েছিল, যা আলগ্রেভ পর্যন্ত দিবাভ্রমণ ছিল। সারা দিন ধরে পর্তুগালে বাংলাদেশি তিনটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ পর্তুগাল, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী পার্টি পর্তুগাল এবং ইসলামিক ফোরাম শহীদ মিনারের রেপ্লিকায় ফুল দিয়ে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল, তবলা ও হারমোনিয়ামের সাহায্যে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়েছিল। দর্শকদের মধ্যে শুধু বাংলাদেশি নারী, পুরুষ, শিশু ছিল না; লিসবন সিটি কাউন্সিলের প্রতিনিধিও ছিলেন। এই এলাকার অভিবাসী ও অনভিবাসী জনগণের মধ্যে বেশির ভাগ দর্শকই বাংলাদেশি ছিল।

সন্ধ্যার পর শহীদ মিনারের রেপ্লিকা সরানো হয় এবং উদ্‌যাপনের ভেন্যু পর্তুগিজ ধর্মীয় অ্যাসোসিয়েশনের কাছে নেওয়া হয়, যা সংগীতানুষ্ঠান ও কবিতা আবৃত্তিতে ভরপুর ছিল।[৩] ওই দিন শেষে অনুষ্ঠানের ছবি ফেসবুকে দেওয়া হয় এবং ব্যাপকভাবে মন্তব্য করা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো পর্তুগালে উদ্‌যাপন করা হয় এবং প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক প্রতিভা প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হয়।[৪]

ক্লেয়ার অ্যালেক্সান্ডার (২০১৩ : ৫৯১) বলেন : শহীদ মিনার স্তম্ভ এবং একে ঘিরে বার্ষিক একুশে আচার-অনুষ্ঠান, যা পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশি কমিউনিটির



রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয়/জাতীয়তার প্রাথমিক দিক।

এই লেখাটি শহীদ মিনারের গুরুত্ব এবং একুশের আচার-অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, যা বাংলাদেশি বহুজাতিক জনগণের স্থান বলা যায়।[৫] গত কয়েক বছরে বাংলাদেশি বহুজাতিক জাতীয়তাবাদ (Transnationalism) সম্পর্কে লেখা গুরুত্বসহকারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রধানত বাংলাদেশি অভিবাসীদের এবং তাদের বংশধরদের যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নজর দেয়। (ইয়েড ১৯৮৯, ইয়েড ও গার্বিন ২০০৬, গ্লিন ২০০৬, অ্যালেক্সান্ডার ২০১৩, কিবরিয়া ২০১১ ইন্টার এলাইয়া)। বাংলাদেশিদের জন্য যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র হলো সবচেয়ে বেশি জরুরি দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসন গন্তব্য। (ভিসরাম ১৯৮৬, গার্ডেনার ১৯৯৪, কিবরিয়া ২০১১ দেখুন) এবং এসব দেশে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম ক্রমাগত বাড়ছে এবং গবেষণা হচ্ছে।

গবেষণাকৃত থিমগুলো ভিন্ন এবং মূলধারার ব্রিটিশ রাজনৈতিক দল (ইয়েড ১৯৮৯) ও স্থানীয় রাজনীতিতে বাংলাদেশি সেক্যুলার ও ইসলামি অংশের মধ্যে সংগ্রাম, সমসাময়িক বহুজাতিক রাজনৈতিক কার্যক্রম, বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীকের প্রাধান্য, যেমন : বৈশাখী মেলা, লন্ডনে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের (ইয়েড ও গার্বিন ২০০৬) জন্য শহুরে ও রাজনৈতিক স্থান তৈরি করা, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিদের ভূমিকা এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও শেখ মুজিবুর রহমানের সহায়তা (লিন ২০০৬) এবং বাংলাদেশি স্বাধীনতা যুদ্ধ, বাঙালি পরিচয় ও যুক্তরাজ্যে সমসাময়িক জাতিগত রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক (অ্যালেক্সান্ডার ২০১৩)। এই বিশেষ ইস্যুতে বেঞ্জামিন জেটলিন আন্তর্জাতিক অপরাধী ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বিতর্ক উত্থাপন করেন কীভাবে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা এই সাম্প্রতিক বিতর্কে জড়িত হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর কিছু নেতা যারা ১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের সহায়তা করে; যেখানে অন্যরা নিরপেক্ষদের সহায়তা করে, যারা শাহবাগ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। এসব অ্যাপ্রোচের দ্বারা বহুজাতিক রাজনীতির গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে।

বাংলাদেশি অভিবাসনের বিভিন্নতার কারণে জনগণের প্রভাব (আপ্পাদুরাই ১৯৯৬) অন্যান্য জায়গা, মানুষ ইত্যাদি যা দৃশ্যপট থেকে দূরে সরে গেছে তার বিস্তৃতি ঘটছে, দক্ষিণ ইউরোপে ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন এবং গ্রিস অভিবাসন আশির দশকের শেষে শুরু হয়েছে এবং আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন শ্রমিক অভিবাসন ও পরিবারের পুনর্মিলন হয়েছে গত দশকে (নাইটস ১৯৯৬, জেটলিন ২০০৬, ম্যাপ্রিল ২০১১, ২০১৪)। অনেক প্রবাসী লিসবন, মাদ্রিদ ও রোমে স্থায়ী হয়েছেন, সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করেছেন, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা, ব্যবসা ও অন্যান্য জায়গা যেমন ধর্মীয় স্থান মসজিদ ও প্রার্থনার জায়গায় বিনিয়োগ

করেছেন। পর্তুগালে স্থায়ী বসতি সত্ত্বেও বহুজাতিক অনুশীলন ও সচেতনতা বৃদ্ধি ও অভিবাসন (স্কিলার ২০০৪) ব্যবস্থা বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ যেখানে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের বন্ধন রয়েছে তা চলছে।[৬] বহুজাতিক কাজের কিছু উদাহরণ গৃহস্থালি পর্যায়ে দেখা যায় যেমন: গৃহস্থালির সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ, গৃহস্থালি আচার-অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, ভূমি কেনা ও বিনিয়োগ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রেমিট্যান্স, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের দেখাশোনা করা (এই শেষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এটা বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে দেখা যায়, যখন শিশুরা তাদের দাদা-দাদির সঙ্গে সময় কাটায়)। এই দিক থেকে, বেশির ভাগ বাংলাদেশি যারা পর্তুগালে থাকে তারা বহুজাতিক অভ্যন্তরীণ ইউনিটের অংশ, যা দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে অথবা অন্য জায়গার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

অন্য দুটি দিক হলো প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ (হল ১৯৯৭) এবং স্বদেশ রাজনীতিতে অংশ (ভারটোভেক ২০০৯)। প্রথমটি অংশগ্রহণের জন্য প্রতিনিধিত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং গ্রহীতা সমাজের জনসমক্ষে দাবি করা, অপর পক্ষে, স্বদেশি রাজনীতি লবি, ঘরোয়া রাজনীতি, ক্যাম্পেইন ও অন্যান্য দীর্ঘ দূরত্ব জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশি রাজনীতিতে অংশ নেয় (এন্ডারসন ১৯১৮, স্কিলার ও ফোরন ২০০১)।[৭]

শহীদ দিবস উদ্‌যাপন প্রাথমিক চিত্র বর্ণনা করে। এই লেখাটির উদ্দেশ্য বহুজাতিক সামাজিক ক্ষেত্রে (স্কিলার *et al.* ১৯৯২)[৮] সম্প্রতি বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে রাজনৈতিক দিকের নৃতাত্ত্বিক দিক তুলে ধরা। এই দিকগুলো শুধু স্বদেশি রাজনীতি তৈরি করে না, পর্তুগিজদের মধ্যে বাংলাদেশি সম্প্রদায়ও তৈরি করে। এই লেখার যুক্তি, প্রথমত, এই বাংলাদেশি বহুজাতিক প্রভাব যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য স্থানে প্রতীকের দ্বারা দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ এবং বিশেষভাবে রাজনীতির স্মৃতির মাধ্যমে, আয়ান হেকিংস (১৯৯৫) বলেন, রাজনীতির স্মৃতি সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে স্পষ্ট যেমন প্রতিষ্ঠার ঘটনা উদ্‌যাপন সঙ্গে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট, যা পৃথকভাবে অতীতকে বর্ণনা করে।[৯]

দ্বিতীয়ত, এই লেখায় দেখা যায় যে এই উপদেশ ও প্রকল্পগুলো অনূদিত হয় এবং এভাবে প্রেক্ষিত অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়, যার ওপর বাংলাদেশিরা বাস করে। এই ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব শাসন ও পর্তুগিজ অভিবাসন রাজনীতির মাধ্যমে তারা 'সম্প্রদায়' তৈরি করতে অভ্যস্ত।[১০] এ সত্ত্বেও এসব অপ্রাসঙ্গিক গঠনের একই দৃশ্যমানতা ও প্রভাব নেই, উদাহরণস্বরূপ, বাউম্যান (১৯৯৬) তাঁর সাউথ হল গবেষণায় বলেছেন, সম্প্রদায় সম্পর্কে উপদেশ ও সংকেতের গঠন রাষ্ট্রের অ্যাক্টররা



নিজেরা তৈরি করে (অথবা এনজিওগুলো একই ভূমিকা পালন করে) নাগরিক নীতির ক্ষেত্রে এবং মানুষের আচার-আচরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এসব শক্তিশালী উপদেশ সমাজের উৎপাদন সেক্টরে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে অভিবাসীদের মধ্যে একই ধরনের সম্প্রদায় ও সংস্কৃতি হিসেবে কোনো লৌকিক সংস্করণ জটিলতা ছাড়া (দৈনন্দিন প্রেক্ষাপটে অপ্রাসঙ্গিক গঠন, বাউনেন ১৯৯৬ দেখুন)। সুতরাং সম্প্রদায় একটি ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণাত্মক হাতিয়ার নয় বরং একটি রাজনৈতিক প্রকল্প।

প্রিটিশ কেসে অ্যালেক্সান্ডার (২০১৩) ও ইয়েড ও গার্বিন (২০০৬) দ্বারা বর্ণিত যুক্তি ও লিসবনের বিতর্কে সাধারণ উপাদানে ও যুক্তি যদি সত্য হয় এটাও স্বীকৃতি দেওয়া দরকার যে পর্তুগিজ কেস বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক পরিচয়, যা অভিবাসীদের পর্তুগালে রাজনীতির নতুন ব্যাখ্যা দেয়।

বর্ধিত ক্ষেত্র পদ্ধতি দ্বারা (গ্লাকম্যান ১৯৪০) অনুপ্রাণিত হয়ে, যা পরিস্থিতিগত বিশ্লেষণ[১১] নামেও পরিচিত, এই যুক্তি একটি ঘটনার বিশ্লেষণ ও গতিশীলতা দ্বারা কীভাবে বহুজাতিক সামাজিক প্রক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এটা করতে গিয়ে আমি প্রথমে বাংলাদেশ ও পর্তুগালের কিছু অভিবাসন ইতিহাস দেখাব। দ্বিতীয়ত, কীভাবে পর্তুগালের তিনটি দীর্ঘ দূরত্ব জাতীয়তাবাদ এবং অতীতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রতিদ্বন্দ্বী তা উপরে উল্লেখিত উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করে তা দেখাব। তৃতীয়ত, এই একই ঘটনা কীভাবে একটি পরিষ্কার অনুস্মরক (Reminder) হিসেবে কাজ করে, যেখানে পর্তুগালের রাজনীতিতে বাংলাদেশের 'সম্প্রদায়' হিসেবে অংশগ্রহণ আশা করা হয়। পরিশেষে আমি কিছু উপসংহার টানব।

## আধুনিকত্ব, বিতাড়ন ও বহুজাতিক জাতীয়তাবাদ : পর্তুগালে বাংলাদেশিরা

বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে অভিবাসানের ইতিহাস আশির দশক থেকে। অপর্টোতে বাংলাদেশ কাউন্সেলর অফিসের রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী আজ দেশে ৪৫০০ বাংলাদেশি বাস করে।

এসব বাংলাদেশির অধিকাংশই অন্তর্বর্তী সামাজিক গোষ্ঠী থেকে এসেছে, যারা বাংলাদেশে 'নতুন' ও 'উচ্চ মধ্যবিত্ত' শ্রেণির হিসেবে চিহ্নিত শহুরে এবং উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা রয়েছে (ম্যাপ্রিল ২০১৩, ২০১৪; স্পেন ও ইতালির সঙ্গে একটি বিশ্লেষণ; জেটলিন ২০০৬ এবং নাইটস ১৯৯৬ দেখুন)। এসব সামাজিক স্তরের জন্য সাধারণত বিদেশ এবং ইউরোপে আধুনিক জীবনমান থাকে শিক্ষার মূলধন ও সাবালকত্ব (ম্যাপ্রিল ২০১৪) এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চিত পথকে এড়ানো যায় (বাল ২০১২)[১৩]

বিদেশ যাওয়ার জন্য আমার মধ্যস্থতাকারী বিভিন্ন রুট অনুসরণ করে। কেউ সরাসরি বাংলাদেশ থেকে মহাদেশীয় ইউরোপে দেশান্তর করে, যেখানে অন্যরা ধাপে ধাপে করে। যারা ধাপে ধাপে যায় তারা প্রথমে মিনা (মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা) দেশগুলোতে যায় এবং কখনো ইউরোপে পুনরায় দেশান্তরিত হয়। একসময় ইউরোপে তারা বিভিন্ন দেশে আত্মীয় ও বন্ধুদের অনুসরণ করে চাকরি ও স্থায়ী হওয়ার সুযোগ খুঁজতে যায়। এভাবে আমার বেশির ভাগ গবেষণা সহকারী ইউরোপ মহাদেশে রয়েছে যেমন : অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স এবং ২০০০ ও ১৯৯০-এর দিকে নিয়মিতকরণ প্রক্রিয়ার সময় পর্তুগালে পৌঁছায়।[১৪]

দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলোতে একত্রীকরণের সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন শুধু জীবনমান উন্নত করেনি, আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিভাগ ও বিশ্ব অভিবাসনের ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে (কিং ও অন্যান্য ২০০০)। ১৯৬০-এর শুরুর দিকে গ্রিস, ইতালি, স্পেন ও পর্তুগাল উচ্চ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। একসঙ্গে উৎপাদন মানের পরিবর্তন আধুনিকীকরণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ, সম্প্রসারিত সেবা খাত ও মূলধনের গতিশীলতা বোঝায় যে এসব দেশ আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সঙ্গে তাদের পরিবর্তিত অবস্থান প্রত্যক্ষ করেছে (কিং ও অন্যান্য ২০০০)।

এসব গঠনমূলক পরিবর্তনে ইউরোপে অভিবাসন ধীরস্থির হয়ে পড়েছে এবং ক্ষণস্থায়ীভাবে পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক স্থানে এবং যার সঙ্গে পর্তুগালের ঐতিহাসিক কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানে অভিবাসীদের আগমন বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিবাসনপ্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় দেশের মতো পর্তুগাল ১৯৯০ ও ২০০০-এ আইন ও বিশেষ নিয়মিতকরণ প্রোগ্রাম উন্নয়ন করেছে।

অনেক বাংলাদেশির জন্য পর্তুগালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বিতাড়িত হওয়া থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নাগরিক অধিকারের খোঁজের মাধ্যমে অব্যাহতি হিসেবে কাজ করে। অ্যারেন্ডট (১৯৫১) একে 'অধিকারের অধিকার' বলেছেন। ডি জেনোভা (২০০২) এবং কালাভিটার (২০০৫) তত্ত্ব অনুযায়ী অনেক ইউরোপিয়ান দেশে অবৈধ তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক তৈরি হচ্ছে যারা অর্থনৈতিক শোষণের শিকার। ইতালি ও স্পেনের মতো পর্তুগালে অভিবাসন যা ক্ষণস্থায়ী হলেও তা অধিকার আদায় ও বিতাড়ন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে মনে হয় (নাইটস ১৯৯৬ ও জেটলিন ২০০৬)

বিতাড়ন একটি বড় রকমের ঝুঁকি মনে করা হয়, কারণ এখানে সম্পত্তি বিক্রয় ও টাকা ধারসংক্রান্ত পরিবারের বিনিয়োগ থাকে এসব অভিবাসন প্রকল্পে। ফলে বাংলাদেশে বিতাড়িত হওয়ার কারণে এসব বিনিয়োগের পরিপূরক ব্যর্থ হয়, শুধু



তার কাছে না তার পরিবারের কাছেও (কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশে ব্যর্থ হওয়া মানে সমাজে পরিবারের অসম্মান)।

নিয়মিতকরণের পর অনেকে পর্তুগালে স্থায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং অর্থনীতির নিচু পদে যেমন : নির্মাণ, রাস্তার কাজ, পরিষ্কারকের কাজ করতে লাগল। শিগগিরই ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও পরিবার-পরিজন থেকে গৃহীত ঋণ মার্টিম মুনিজ স্কয়ার ও মৌরারিয়ার কাছাকাছি যা সিটি সেন্টারের পরে ছোটখাটো বাণিজ্যিক কাজে বিনিয়োগ করে। এটি লিসবনের একটি এলাকা যেখানে চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কোপ ভার্দে, গুয়েনা বিসভি, মোজাম্বিক, সেনেগাল থেকে আসা নতুন লিসবনবাসীর খোঁজ পাওয়া যায়। এই উপস্থিতি যা সত্তরের দশকের শেষে শুরু হয়েছে তা শুধু বাণিজ্যিক নয় আবাসিকও এবং এটা সাবেক পর্তুগিজ উপনিবেশে উত্তর-উপনিবেশ অভিবাসী এবং বিশ্ব অভিবাসনপ্রবাহের সঙ্গে পর্তুগালের অবস্থানের পরিবর্তন সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন দেশ থেকে অভিবাসীদের উপস্থিতি মূলধারার গণমাধ্যম ও রাজনীতিকদের দ্বারা তৈরিকৃত উপদেশ যা আধুনিক পর্তুগাল, আন্তসংস্কৃতি, বিভিন্ন সংস্কৃতি, অভিবাসনের সঙ্গে লিসবনের এই এলাকায় সহযোগী হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি সংস্থা ও সিটি হল দ্বারা অসংখ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। যেমন 'টোডোস' অথবা 'সিউশন' মার্কেট করা হয়।

কেন্দ্রীয় লিসবনে আজ বাংলাদেশি দু শর বেশি ব্যবসা রয়েছে। যেমন মুদিদোকান, তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক দোকান, হস্তশিল্প, বাংলাদেশি ও ভারতীয় খাবারের দোকান, বাংলাদেশি মিষ্টির দোকান, ভ্রমণ সংস্থা, ইন্টারনেট ক্যাফে, ডোনার কাবাববিক্রেতা এবং পত্রিকার দোকান। একটি খুব বৈচিত্র্যময় বাজার, যা বাংলাদেশি ক্রেতাদের পান ভোজনসংক্রান্ত স্মৃতি পর্যন্ত যায়, যা দেশের সর্বত্র সস্তায় কাপড় বিক্রয় করে। (মানকেকার ২০০৫)।

প্রথমে এটি একক তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের অভিবাসনপ্রবাহ ছিল, কিন্তু এখন অধিকাংশই বাংলাদেশে বিয়ে করেছে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা পর্তুগালে আছে। এটা বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে শুধু নতুন অভিবাসনপ্রবাহ তৈরি করে না, এটা জনসংখ্যার কিছু বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন ও তৈরি করে। শত বাংলাদেশি পরিবার লিসবনে এসে পুনরায় একত্র হয়, যার বেশির ভাগ ছোট পরিবার, যার সঙ্গে পরিবারের আরেক সদস্য থাকে সাধারণত স্বামী অথবা স্ত্রীর ভাই, সাধারণত যে ইউরোপে তাদের মাধ্যমে নতুন পরিবেশে আসে। আমার কিছু গবেষণা সহকারীর মতে, তুমি এমন কাউকে আনতে পারো না যে তার পুরো জীবন গ্রামে কাটিয়েছে এবং ইংরেজি বলতে পারে না। এই কমিউনিটির সদস্যরা তাদের সন্তানের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা উভয় দিকেই বিনিয়োগ করে।

যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের পরিবারকে একত্র করে সন্তানদের শিক্ষা ও সঞ্চিত অর্থনৈতিক মূলধন বিনিয়োগ করে তাদের সফল প্রবাসী হিসেবে দেখা হয়, পর্তুগিজ শব্দে যাকে বলা হয় 'patrao' মানে বস। পরিবার ও অর্থনীতি ছাড়াও তারা কিছু বাংলাদেশি এলাকায় রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে, যেমন বাংলাদেশি মসজিদ 'বায়তুল মোকাররম' এবং লুসো-বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন। বাংলাদেশি মসজিদ বাংলাদেশিদের দ্বারা অর্থায়ন হয়। তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগকারী এবং 'ওয়াফ' হিসেবে বিনিয়োগ করে।

অভিবাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্নতা। পর্তুগালে কমপক্ষে বাংলাদেশের ১২টি জেলার মানুষ পাওয়া যাবে যেমন: ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, চাঁদপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল এবং গোপালগঞ্জ (স্পেন ও ইতালিতে বাংলাদেশিদের মত: নাইটস ১৯৯৬ ও জেটলিন ২০০৬ দেখুন)। ঢাকা খুব শক্ত প্রতিনিধিত্বকারী অঞ্চল ও চাঁদপুর সবচেয়ে কম।

পর্তুগালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ থাকা সত্ত্বেও এই বাংলাদেশিরা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তারা সম্পত্তি ক্রয়, স্বজনদের টাকা পাঠানো, সন্তানদের তাদের দাদা-দাদি, নানা-নানির সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য পাঠানো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন যেমন: কোরবানি করা, বিয়ে ইত্যাদি পালন করে (স্কিলার ২০০৪), যৌথ পরিবারের এক অংশ পর্তুগালে থাকা সত্ত্বেও তারা একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল।[১৫]

দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ ও স্মৃতির রাজনীতি, আরেকটি উদাহরণ হলো স্বদেশি রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া। অভিবাসন ছাড়াও আঞ্চলিক ইতিহাস, লিসবনে মাতৃভাষা দিবস পালন করা বহুজাতিক রাজনীতির কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। পর্তুগালে তিনটি রাজনৈতিক দল রয়েছে: পর্তুগাল আওয়ামী লীগ, পর্তুগালের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী দল এবং ইসলামী ফোরাম জামায়াতে ইসলামী।[১৬]

এসব দল সফল প্রবাসী ও অগ্রদূতরা পরিচালনা করে। অভিবাসনের আগে এর নেতারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইসলামি ফোরাম শুধু বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীকে নয়, নতুন যারা রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছে। অধিকাংশ অভিবাসী বাংলাদেশি শিশু যারা পর্তুগালে জন্মগ্রহণ করেছে অথবা ছোট থেকে আছে তারা রাজনীতিতে আগ্রহী নয় (বাংলাদেশ ও পর্তুগাল উভয় জায়গায়)। যারা আগ্রহী তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু করেছে, যেমন ইসলামিক পার্টি ফোরাম, যা ইউরোপের অন্যান্য কেসের মতো (জেটলিন দেখুন: অ্যালেক্সান্ডার ২০১৩)।



প্রত্যেক দল বাংলাদেশের প্রধান অনুষ্ঠানগুলো যেমন: ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, নববর্ষ আলাদাভাবে উদ্‌যাপন করে এবং অনেক ক্ষেত্রে দলের বিশেষ কোনো দিন (যেমন আওয়ামী সমর্থকদের জন্য জেল হত্যা দিবস)[১৮] উদ্‌যাপন করে। ইসলামিক ফোরামের ক্ষেত্রে শুধু ভাষা দিবস পালিত হয়।

ফারুক[১৯] ১৯৯০ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০২ সালে পর্তুগালে তাঁর মা তিন ভাইয়ের সঙ্গে বাবার (আনোয়ার) কাছে যান, যিনি ১৯৯৬ সালে পর্তুগালে অভিবাসী হয়েছেন। ফারুক ১১ গ্রেড পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন কিন্তু কিছু পারিবারিক জটিলতার কারণে লিসবনে একটি পিৎজার দোকানে কাজ করতে থাকেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক হিসেবে আসার কারণে তিনি পর্তুগালের মুসলিম ফোরামের দিকে ঝুঁকছেন। লিসবনে ভাষা দিবসে তাঁর সমালোচনার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট, 'আমরা মুসলমানরা সবাই এক এবং একই সম্প্রদায়ের কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করে আমাদের মধ্যে কাল্পনিক লাইন আছে, যা আমাদের পৃথক করে।'[২০]

ফারুকের মতে, অন্যান্য ইসলামিক ফোরামের অন্য সদস্যদের মতে, বাঙালি ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের বিভাজক হিসেবে অনুভূত হয়। এখান থেকে বোঝা যায় যারা একুশে ফেব্রুয়ারি অথবা অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করে তারা ভবিষ্যতের চেয়ে অতীত নিয়ে বেশি চিন্তা করে বলে অভিযুক্ত।

যাঁরা শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করেন তাঁরা সাধারণত বাংলাদেশি দোকানে তা ঘোষণা করেন মালিকের রাজনৈতিক সমর্থন বোঝানোর জন্য, যদি কোনো দোকানে ভাষা দিবস বিএনপির মাধ্যমে আয়োজন করা হয় তাহলে একই আয়োজন আওয়ামী লীগ দ্বারা করা হয় না।

এসব অনুষ্ঠান সাধারণত ভাড়া করা হোটেলের হল, প্রার্থনা রুম বা রেস্টুরেন্টে করা হয় এবং এটি রাজনৈতিক র‍্যালি হিসেবে একই দলের অতিথিদের এবং অন্য দেশে বাসকৃতদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। ২০০৫ সালে যখন লিসবনের মুন্ডিয়াল হোটেলের কনফারেন্স রুমে পর্তুগাল বিএনপি ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন করে তখন বেলজিয়ামের বিএনপির একজন প্রতিনিধি প্রধান অতিথি ছিলেন। এভাবে পর্তুগালের রাজনৈতিক দল অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেও সম্পর্ক বজায় রাখে।

এসবই বহুজাতিক রাজনৈতিক এলাকার অংশ। একটি বহুজাতিক দেশ, যেখানে ইউরোপের অন্যান্য অংশের একই রকম আন্দোলনই নয় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলও এর অন্তর্ভুক্ত। অনেক লেখক (ইয়েড ও গার্বিন ২০০৬, কাবির ২০০০, সিদ্দিকী ২০০৪) দেখিয়েছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি ও বাংলাদেশি অভিবাসনের রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে

যুক্তরাজ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৩ সালে আওয়ামী লীগ পর্তুগাল লীগের ইউরোপিয়ান দেশগুলোর প্রতিনিধিদের একটি সভা সংগঠিত করে। ২০০৩ সালের ৫ আগস্ট দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বিএনপি/জামায়াতে ইসলামী দলের (চারদলীয় জোটের)[২১] সদস্য হিসেবে লিসবন দর্শন করেন এবং লিসবন মসজিদে জামায়াতে ইসলামী সমর্থকদের দ্বারা গৃহীত হন। ২০১০ সালের ১০ অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি সরকারি সফরে পর্তুগাল সফর করেন এবং সেখানকার আওয়ামী লীগের সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হন।

এসব শুধু বাংলাদেশ ও তার ঐতিহাসিক দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন নয়, তারা দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ (এন্ডারসন ১৯৯৮, স্কেলার ও ফোরন ২০০১) যেখানে বাঙালি নিরপেক্ষতাবাদ, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক ইসলাম অন্তর্ভুক্ত তা প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্করণের জন্য স্পেস হিসেবে ব্যাখ্যা করা। এসব প্রকল্পের শুধু মতাদর্শগত ভিত্তি নিয়ে নয় বরং এর বৈধতা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে পর্তুগালে। এভাবে করার মাধ্যমে প্রত্যেক দলের মতাদর্শিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে।

এটা দুটি ঘটনার দ্বারা চিত্রায়িত করা যায়। একটি ২০০৩ সালের এবং আরেকটি ২০১৩ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। প্রথমটি হলো ২০০৩ সালের গ্রীষ্মে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর লিসবন সফর। দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য। তিনি চারদলীয় জোট থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।[২২] প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল এমপি হিসেবে বাংলাদেশি মসজিদ ও মার্টিম মুনিজ স্কয়ারে ব্যবসা পরিদর্শন করা কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর আন্দোলনে এটি বাতিল হওয়ার কথা ছিল। এই সফরের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি ছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর ও তাঁর দলের ভূমিকা।

আমরা এমপির সফর সম্পর্কে কথা বলছিলাম, যখন মতিউর বলল একজন ইসলামিক পার্টির সদস্য হিসেবে তিনি রাজনৈতিকভাবে কিছু সঠিক কথা বলেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তিনি সম্পূর্ণ ভুল ছিলেন, সত্য হলো বাংলাদেশের মানুষরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, ভিন্ন খাবার খায়, কাপড়চোপড় আলাদা, তারা কেন একসঙ্গে থাকবে? কেবল একই ধর্ম বলে? কিন্তু যেখানে এটাও ভিন্ন। এভাবে জামায়াতে ইসলামী যে যুক্তি দিয়েছে মুসলমানরা আলাদা থাকতে পারে না, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।[২৩]

আরেকটি উদাহরণ হলো আমিনের সঙ্গে কথোপকথনের উদ্ধৃতাংশ, যিনি ঢাকা জেলার, ২০০২ সালে পর্তুগালে এসেছেন :

'অনেক বাংলাদেশি এই এমপিকে পর্তুগালে চায় না। তাদের বক্তব্য মতে, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মতে, সাঈদী বিশ্বাসঘাতক, কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে



পারে না, সে যুক্তি দেখিয়েছেন, যদিও তারা ইসলামিক দল কিন্তু তারা যা বলে তা করে না।'[২৪]

একই দিনে পরবর্তী সময়ে, ওসমান দেলাওয়ারের সমালোচনা করেছেন, কারণ তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকার হিসেবে অনেক বাঙালিকে হত্যায় সাহায্য করেছেন। ওসমানের জন্য দেলাওয়ারের লিসবন সফর মেনে নেওয়া অনেক কঠিন, কারণ তিনি তাঁর চাচাকে কেরানীগঞ্জের মুক্তিবাহিনীতে যুদ্ধ করতে দেখেছেন এবং তা মনে রেখেছেন। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে তাঁর দাদির সঙ্গে তাঁর চাচার গোপন সাক্ষাৎ। কেউ তাঁর উপস্থিতি টের পায়নি। ওসমান স্বতন্ত্রভাবে ওই দিন মনে রেখেছেন এবং তিনি কীভাবে কাপড় পরেছিলেন, একটি পুরোনো ন্যাকড়া ও একটি রাইফেল। তিনি কখনোই ওই দিনটি ভুলবেন না![২৫]

ওসমান ২০০২ সালে পর্তুগাল এসেছেন অনেক দিন জাপান ও সৌদি আরবে থাকার পর। তিনি আগে কেরানীগঞ্জে যুবলীগ করতেন। দেলাওয়ারের উপস্থিতি তাঁর জন্য অসহনীয়, কারণ তিনি রাজাকার হিসেবে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছেন, যা শত মানুষের প্রাণ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি তাঁর ব্যক্তিগত অতীতের দ্বন্দ্বের সঙ্গেও বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে তাঁর চাচা, যার ফলাফল শুধু অসংখ্য বাঙালিকে নয়, তাঁর নিজের পরিবারকেও ভুগতে হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ট্রায়াল এবং লিসবনে এর প্রতিবিম্ব।[২৬] এই প্রক্রিয়ার সময় ফারুক বলেছেন :

> অনেক সাক্ষী যাঁদের কোর্টে আনা হয়েছে তাঁরা পরে স্বীকার করেছেন যে তাঁদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল জামায়াত ও সাঈদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। অন্যদিন আমিন লিসবনে একটি জনসভা ডাকল এটা ব্যাখ্যা করার জন্য যে জামায়াতে ইসলামী কখনোই যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো অফিশিয়াল অবস্থান নেয়নি। তাঁর মতে, জামায়াত-সমর্থকদের মধ্যে কিছু যুক্ত মুসলিম দেশ সমর্থন করে কিন্তু অন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি ছিল। আমিন আরও বলেন, দেলাওয়ার রাজাকার হিসেবে থাকতে পারেন না, কারণ তাঁর তখন মাত্র ১৬ বছর বয়স।[২৭, ২৮]

এরপর এখন যেখানে লিসবনে বাংলাদেশি এম্বাসি রয়েছে তার সামনে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়।

দুই ক্ষেত্রেই ঝুঁকি হলো বিতর্কিত ধারণা অতীত সম্পর্কে এবং তাদের ভূমিকা সম্পর্কে হেকিংস (১৯৯৫) যাকে বলেছেন স্মৃতির রাজনীতি। এই ধারণা আগে দিদিয়ের ফাসিন 'স্মৃতির বস্তুগত উপস্থিতি' (ফাসিন ২০০৮ : ৩১৬) হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু কেন এসব বিতর্ক? এখানে ঝুঁকিপূর্ণ কী আছে? দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ ধারণাটি অভিবাসীদের স্বদেশি রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো

(স্কিলার ও অন্যান্য ১৯৯৪, ভারটোভেক ২০০৯, ইন্টার এলাইয়া দেখুন)। কিন্তু এখানে আমি, অন্যদিকে, দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ স্মৃতির রাজনীতিতে যুক্ত তা দেখিয়েছি এই পেপারে। বিদেশ অভিবাসীদের জন্য সম্পত্তি সম্মানের জায়গা, যা তার দেশে আত্মীয়দের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে (গার্ডনার ১৯৯৩ দেখুন)। এটি জালালের সঙ্গে একটি স্পষ্ট কথোপকথন যিনি ২০০২ সাল থেকে পর্তুগালে বাস করেন :

> জামায়াতিরা পর্তুগালে তাই করছে যা বাংলাদেশে করেছে। তারা অভিবাসীদের ভোটের জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করেছে এবং এভাবে তাদের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি পরিবর্তন করেছে। পরে যখন এসব অভিবাসী দেশে যায়, যেহেতু তারা গুরুত্বপূর্ণ, তাদের আত্মীয়স্বজনকে তাদের ভোট বদল করার জন্য প্রভাবিত করে।[২৯]

যদিও জালাল রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন, তবে তাঁর আওয়ামী লীগের জন্য সহমর্মিতা আছে। বাংলাদেশি অভিবাসীদের কাছে পৌঁছানো হলো পর্তুগালের মতো বিভিন্ন দেশে, যেমন যুক্তরাজ্যে, নতুনভাবে রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি। একটি উপায় হলো কিছু প্রতিষ্ঠান, যেমন মসজিদ ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ রাখা।[৩০]

### 'সম্প্রদায়' তৈরি

একটি উদাহরণ হলো প্রবাসীর লিসবন কমিউনিটি তৈরি এবং এমন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা। প্রাথমিক চিত্র পর্তুগাল পাবলিক ডোমেইনে বাংলাদেশি 'সম্প্রদায়' তৈরি করা, যেখানে বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক প্রতীক, যা অভিবাসী প্রতিনিধিত্বের রাজনৈতিক গতিশীলতায় দেখা যায়। লিসবনে বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন সৃষ্টির ইতিহাস প্রকাশিত ক্ষেত্র। মানসের মতে, একজন প্রবর্তক, যিনি আশির দশকের শেষে পর্তুগালে এসেছেন এবং পর্তুগালে আওয়ামী লীগের একজন নেতা :

> অ্যাসোসিয়েশন সৃষ্টির ব্যাপারে লিসবনে আমরা তেরোজন একটি ডিনারে অংশ নিই। সবকিছুই ঠিকভাবে চলছিল, যতক্ষণ না এর প্রেসিডেন্ট নিউটনের সিদ্ধান্ত এসেছে। তারপর সবকিছু জগাখিচুড়ি হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন বলল, শুধু তাঁর বয়স বেশি এবং তিনি একজন ডাক্তার দেখে তাঁর নেতৃত্বের অধিকার ও ক্ষমতা বেশি হয়ে গেল! কিন্তু সবাই এটা মানে না।[৩১]

পর্তুগাল-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ইউনিয়ন গঠিত হয় এই প্রথম সভার পরে। পর্তুগাল আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পর্তুগিজ প্রতিষ্ঠান যেমন: হাইকমিশনার ফর ইমিগ্রেশন অ্যান্ড এথনিক



মাইনরিটিজ[৩২], সীমান্ত পুলিশ ইত্যাদির কাছে বাংলাদেশিদের প্রতিনিধিত্ব করা।

এটা বিভিন্ন জরুরি জাতীয় দিবস যেমন: ভাষা দিবস, নববর্ষ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক আয়োজন করার দায়িত্বেও ছিল। উদাহরণস্বরূপ ২০০৩ সালে বাংলাদেশি দূত, প্যারিসের বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডর ও বর্ডার পুলিশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লিসবনের একটি হোটেলে ভাষা দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলা গান, কবিতা ও বক্তৃতা দেওয়া হয়।

এর প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী কমিটির মতে, এর লক্ষ্য হলো পর্তুগিজ পাবলিক ডেমোইনে বাংলাদেশিদের প্রতিনিধিত্ব করা, যা ২০০৭ সালে লিসবনে ২৬ মার্চের উদ্‌যাপনে উদ্বোধনী ভাষণে বলা হয়েছে।

> আমি ব্যক্তিগতভাবে দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব নিয়ে কৃতজ্ঞ। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য বিনিময়ের গুরুত্বের ওপর জোর দিতে পারি না। যতক্ষণ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো তখন বললাম! ৫০০ বছর আগে ভাস্কো দা গামা আমাদের দেশে এসেছিলেন এবং আমরা তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলাম। ৫০০ বছর পর আমরা এখানে এসেছি এবং আমরা আশা করি আপনারাও আমাদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবেন। প্রেসিডেন্ট সব বাংলাদেশিকে অভিনন্দন জানালেন। সম্প্রতি আমরা এখানে প্রায় চার হাজার এবং আমরা এখানে কাজের মাধ্যমে অবদান রাখি। আমরা সামাজিক নিরাপত্তা দিই। আমরা ট্যাক্স দিই, সংক্ষেপে আমরা পর্তুগালের অংশ। আমি দুদেশের মধ্যে চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির বিনিময় চাই। আজ আমাদের ৩৫তম স্বাধীনতাবার্ষিকী এবং আমরা বলতে চাই: স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক এবং আমাদের স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেওয়া হোক।[৩৩]

আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকেরা পর্তুগাল-বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের সমালোচনা করেছে। ওপরে বর্ণিত এর লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও ইউনিয়নেও প্রথম যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এর লক্ষ্যে সন্দেহজনক। মাহমুদের মতে, এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমরা এক, আমরা বাংলাদেশি। আমরা পর্তুগালে কতজন আছি? ৩০০০ অথবা ৩৫০০ এবং আমাদের তিনটি দল![৩৪]

এমন বিবাদ ও বিতর্ক সত্ত্বেও ইউনিয়নেও কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশি ও পর্তুগিজ প্রতিষ্ঠানে যারা অভিবাসন নিয়ে কাজ করে তার একমাত্র অংশগ্রহণকারী ২০১০ সালে অনেক অনিশ্চয়তার পর সব দল একসঙ্গে একটি নতুন অ্যাসোসিয়েশন করার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। এর ধারণা একজন বাংলাদেশি সংসদ সদস্য থেকে এসেছে, কিছু অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সফরের সময় একটি সভা করেছিল। ২০১০ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পর্তুগাল সফরের সময় কথা দিয়েছিলেন যে এর লক্ষ্য ছিল প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করার নতুন প্রতিষ্ঠান, যা পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লিয়াজোঁ করতে পারবে।

অনেকগুলো সভার পর লুসো-বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনের নতুন নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হলো, যা শুধু নির্বাচনের পরই লিপিবদ্ধ করা হবে। লিসবনে চতুর্থ স্বাধীন বাংলাদেশি গোষ্ঠী, যাদের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নেই, তাদের দ্বারা সম্পূর্ণ নির্বাচনপ্রক্রিয়া ভোট গ্রহণ আঠারো বছরের বেশি বয়সী বাংলদেশিদের লিপিবদ্ধকরণ এবং প্রার্থীদের তালিকা তৈরি সম্পন্ন করতে হবে। এই চতুর্থ দল, যা বন্ধুদের বন্ধু নামে পরিচিত, ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই লেখার শুরুতে বলা হয়েছে ২০১১ সালের ভাষা দিবস এই চতুর্থ দল আয়োজন করছে। একুশে ফেব্রুয়ারি 'বন্ধুদের বন্ধু'র সব সদস্য একই লাল-সবুজ টি-শার্ট পরেছিল।

সব দল এটাতে আসন্ন নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সবার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল এবং শহীদ মিনারে ফুল এবং ভাষাশহীদদের প্রতি সম্মান জানানোর মাধ্যমে এটি উদ্‌যাপন করা হয়।

নির্বাচনের জন্য তিনটি তালিকা তৈরি হয়েছে। আগের বাংলাদেশ পর্তুগাল সাংস্কৃতিক সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সদস্যরা 'নীল তালিকা' তৈরি করেন। ক্যাম্পেইনের সময় বিকেলের চা খেতে খেতে মানস বলেন :

> এই তালিকা সব বাংলাদেশিকে শুধু আওয়ামী সমর্থকদের জন্য নয়। নইলে আমরা নির্বাচন হারানোর ঝুঁকিতে থাকব![৩৫]

এটা সত্ত্বেও সমালোচক ও যাঁরা সমালোচনাকারী নন উভয়ের জন্য এটি 'আওয়ামী লীগের তালিকা' এবং এই গোষ্ঠী তাদের এই ইমেজ থেকে আলাদা হতে পারবে না। তথাপি মানস সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রার্থী এবং তিনি এমন একজন যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন। সবাই বুঝতে পারল তিনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী।

দ্বিতীয় তালিকায় বিএনপি ও ইসলামিক ফোরাম দুটোই অন্তর্ভুক্ত এবং এটি 'নীল তালিকা'র জন্য প্রধান প্রতিযোগিতা। এটা 'সবুজ তালিকা' হিসেবে পরিচিত এবং এতে পর্তুগাল বিএনপির প্রধান প্রতিনিধির মেয়ের জামাই। কিছু গুরুত্বপূর্ণ লুসো-বাংলাদেশি উদ্যোক্তা এবং জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকেরা অন্তর্ভুক্ত।

শেষে আরেকটি ছোট তালিকা রয়েছে, কিছু স্বাধীন প্রার্থীর যারা ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে পরিবার থেকে আলাদা হয়েছে এবং যারা সাবেক আওয়ামী সদস্য।

মোজাম্বিকের পর্তুগিজ মুসলিমের লিসবন হোটেলে ১০ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যালট বন্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেক দলের প্রার্থী এবং অন্য বাংলাদেশিরা ফলাফলের জন্য অপেক্ষায় ছিল, যা ভোর তিনটা বাজিয়েছে। সব



ধরনের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে সবুজ তালিকা বিজয়ী হয়। কয়েক মাসের প্রস্তুতির পর লুসো-বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়।

কিন্তু আগে ব্যাখ্যা করা শহীদ দিবস এবং সম্প্রতি সৃষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে সম্পর্ক কী? এবং এটি স্থানীয় ও বহুজাতিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে কী বলে? ২০১১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন ছিল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি যা নতুন 'প্রণালির পর্তুগাল কমিউনিটি' গঠনে ভূমিকা রাখে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলোর নাগরিকত্বের ওপর ভিত্তি করে পর্তুগিজ অভিবাসন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ জরুরি।

যাই হোক একই সময়ে বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক প্রতীক ও পরিচয় বাংলাদেশিদের মধ্যে শুধু বাংলাদেশ নয়, বিদেশেও বিতর্কিত হয় এবং এটি রাজনীতির স্মৃতিতে দৃশ্যমান। অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও বিদেশের সফল চিত্রের কারণে দেশের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

## শেষ কথা

২০১১ সালের শহীদ দিবস উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বর্ধিত পদ্ধতি (গ্লাকম্যান ১৯৫৮) ব্যবহার করে এই লেখাটি বাংলাদেশ ও পর্তুগালের মধ্যে বহুজাতিক রাজনৈতিক দিক প্রকাশ করেছে।

একদিকে বাংলাদেশি বহুজাতিক ক্ষেত্র যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ ও অন্যান্য জায়গায় শহীদ মিনার ও একুশের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে। অন্যদিকে, এসব পরিচয় ও প্রতীক বাংলাদেশিদের অবসান অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়। অ্যালেক্সান্ডার (২০১৩) এবং ইয়েড ও গার্বিনের (২০০৬) ব্রিটিশ কেসের সঙ্গে লিসবনের বিতর্কের মিল রয়েছে। অ্যালেক্সান্ডার (২০১৩) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশি প্রতিনিধিত্বের প্রতিষ্ঠান। সঙ্গে লন্ডনের শহীদ মিনারের রেপ্লিকা বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের অংশ ছিল। পর্তুগালে বাঙালি ও বাংলাদেশি প্রতীকগুলো অধিবাসী প্রতিধিত্বের জন্য আন্তসাংস্কৃতিক রাজনীতিতে অংশ নিয়ে 'জাতীয় সম্প্রদায়' হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এসব বিতর্ক সংক্ষেপে দীর্ঘ দূরত্ব জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

এভাবে ২০১১ সালের ভাষা দিবস উদ্‌যাপন একদিকে বাংলাদেশিদের বিশেষ জাতীয় সম্প্রদায় হিসেবে পর্তুগিজ অভিবাসনে অংশগ্রহণের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে এসব অংশগ্রহণকারী বহুজাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সম্পৃক্ততার সঙ্গেও যুক্ত।

অনুবাদ : **জোশিতা জিহান অর্নব**

## টীকা ও তথ্যসূত্র

১. আমি পর্তুগিজ বিজ্ঞান ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যা ছাড়া এই লেখাটি সম্ভব হতো না। এর আগের ভার্সনটি লন্ডনে ২০১৩ সালের ২৭ এপ্রিল ব্রিকলেন সার্কেলের তৃতীয় বার্ষিক কনফারেন্সে এবং লিসবনে ২৫-২৮ জুলাই, ২০১২ সালে দক্ষিণ এশিয়ান স্টাডিজের ২২তম ইউরোপিয়ান কনফারেন্সে কল্পনায় বাংলাদেশ শিরোনামে (imagining Bangladesh) উপস্থাপন করা হয়েছিল। যাঁরা মন্তব্য করেছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ।

২. একুশে হলো ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ। এদিনে মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। একুশে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বইমেলার নামও, যা ফেব্রুয়ারি মাসে হয়।

৩. লিসবনের এই এলাকায় পর্তুগিজ আঞ্চলিক অ্যাসোসিয়েশন ও ক্লাব হাউস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেগুলো শুধু অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয় না, জাতিগত কাজের জন্যও ভাড়া দেওয়া হয়।

৪. পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি যে আগে লিসবনে বাংলা নববর্ষ ও ভাষা দিবস ছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠান হতো কিন্তু কোনোটিই ২০১১ সালের অনুষ্ঠানের মতো দৃশ্যমান হয়নি।

৫. বহুজাতিক জনসাধারণের এলাকা ধারণাটি জন বোয়েন (২০০৪) এবং ন্যান্সি ফ্রেসার (২০০৭)-এর কাজে রয়েছে।

৬. ব্রিটিশ বাংলাদেশি বহুজাতিক অভ্যাস এবং অভিবাসনের তৃতীয় স্পেসের মধ্যে সম্পর্ক জানতে জেটলিন (২০১৩) দেখুন।

৭. দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ ধারণাটি প্রথম বেনেডিক্ট এন্ডারসন ১৯৯৮ সালে দেন এবং পরে নিনা গ্লিক শিলার এবং জর্জ ফোরন (২০০১) হাইতিয়ান আমেরিকান এবং বহুজাতিক রাজনৈতিক সক্রিয়তা সম্পর্কে তাঁদের গবেষণায় তত্ত্ব হিসেবে দেন। শিলার এবং ফোরনের (২০০১ :৪) মতে, দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ হলো রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার দাবি, যা দেশের বাইরে প্রসারিত হওয়ার দাবি। এটি জনগণকে রাজনৈতিক কাজে যাওয়ার জন্য বাধ্য করতে মানসিক সংযুক্তি হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের জাতীয়তাবাদের পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

i) এটা অনুমান করে যে জাতীয় সীমানা একাত্মতার সীমানা নির্ধারণ করে না। ii) এটা শুধু কাল্পনিক এবং আবেগপ্রবণ নয়, রাজনীতি ও ক্রিয়াকলাপের সেট। iii) দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য হলো বহুজাতিক রাষ্ট্র তৈরি। iv) কন্টেক্সট গ্রহণ ও প্রদানের মধ্যে এর উত্থান এবং প্রকাশ নির্ভর করে। এবং সবশেষে v) দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ এবং ডায়াসপোরিক ফেনোমেনা একই সঙ্গে চলে কিন্তু স্বতন্ত্র থাকে।

৮. বহুজাতিক সামাজিক ক্ষেত্র ধারণাটি গ্লিক শিলার দ্বারা ১৯৯২ সালে প্রথম প্রস্তাবিত হয়। এটি কীভাবে বহুজাতিকবাদ মানুষের সম্পর্ক পরিবর্তন করে তা বর্ণনা করে (ভারতোভেক ২০০৯ : ১২), (হেকিং ১৯৯৫ : ২১১)।

৯. আয়ান হেকিংয়ের মতে, ব্যক্তিগত স্মৃতির রাজনীতি হলো একটি নির্দিষ্ট ধরনের রাজনীতি। এটা জ্ঞানের চারপাশে নির্মিত ক্ষমতার সংগ্রাম। এর মাধ্যমে এটি নিশ্চিত হয় যে নির্দিষ্ট রকম জ্ঞান আহরণ সম্ভব। এই প্রতিদ্বন্দ্বী দাবির মধ্যে গভীর জ্ঞান আছে। যে জ্ঞানের স্মৃতি সত্য অথবা মিথ্যা উভয়ই হতে পারে। ক্ষমতার লড়াই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে হয়, যেখানে বিপরীত পক্ষ গভীর জ্ঞানকে সাধারণভাবে নেয়। প্রত্যেক দিক অন্য দিকের বিপরীত। যারা ট্রমা থেকে উদ্ধার হয়েছে এবং যারা একে প্রশ্ন করেছে তাদের মোকাবিলার জন্য সঠিক ধরন।



১০. অভিবাসী জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পর্তুগিজ নাগরিকত্বের শাসন আন্তসাংস্কৃতিক নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। বিস্তারিত শেষের অধ্যায়ে দেখুন।

১১. ১৯৪০ সালে ম্যাক্স গ্লাকম্যান তাঁর *The Social Situation in Modern Jululand* বইয়ে বর্ধিত কেস পদ্ধতি সম্পর্কে প্রস্তাব দিয়েছেন, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সেতুর উদ্বোধন সম্পর্কে গবেষণা ছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া, যেখান থেকে বৃহৎ সমাজের সমাজবিদ্যাগত ধরন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা যায়। একই পদ্ধতি কয়েক বছর পর জে. সি. মিশেল (১৯৫৬) ব্যবহার করেছেন। নৃবিজ্ঞানের মধ্যে বর্ধিত কেস পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণের জন্য ইভেনস এবং এডেলম্যান (২০০৬) দেখুন।

১২. এই লেখাটি নৃতাত্ত্বিক মাঠ গবেষণার তিনটি সময়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রথমটি ২০০৩ সালে শুরু হয় এবং ২০০৬ সালে শেষ হয় এবং লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের ওপর পিএইচডি করা হয়। প্রথম কেসে পর্তুগাল এবং বাংলাদেশের নৃতত্ত্ব এবং ৭০টি সাক্ষাৎকার রয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কেস ছিল ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত এবং ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। এই দুটি মাঠপর্যায়ের কাজ আগের উপাত্তের সঙ্গে আপডেট হয়েছে এবং সেখানে ২০টি ইন ডেপথ সাক্ষাৎকার ছিল (যার বেশির ভাগ দ্রাঘিমাংশ উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আগের যোগাযোগে প্রয়োগ করা হয়েছে)।

১৩. *দেশ* হলো ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং দারিদ্র্যের জায়গা, যা *বিদেশের* সমৃদ্ধি, সুভাগ্য এবং সফলতার জায়গার বিপরীত ধারণা। এটি প্রবাসী অভিজ্ঞতার সঙ্গে দীর্ঘ সম্পৃক্ত রূপক বহিঃপ্রকাশ (গার্ডনার, ১৯৯৩)। উত্তর আমেরিকায় স্থায়ী অভিবাসনসহ সিলেটিদের ব্রিটেনে অভিবাসনের অভিজ্ঞতা এবং মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক অভিবাসন থেকে 'অভিবাসন সংস্কৃতি' খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ম্যাসেই ও অন্যান্য (১৯৯৩) এটিকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে যে যারা অভিবাসন করে না তাদের অলস ও খারাপ বৈবাহিক চুক্তি হিসেবে দেখা হয়, যেখানে যারা *বিদেশে* থাকে তাদের ধনাঢ্য, সফল এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৪. সর্বমোট ১৯৯৩ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে তিনটি রেগুলারাইজেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়, যেগুলো পর্তুগালের ভূকৌশলগত স্বার্থের সঙ্গে জড়িত (যেমন পর্তুগিজ ভাষাভাষী আফ্রিকান দেশগুলো) এবং শ্রমবাজারের (যেমন কনস্ট্রাকশন) কয়েকটি খাত থেকে সৃষ্ট চাপের উত্তর।

১৫. পর্তুগাল ও বাংলাদেশে বসবাসকারী গোত্রের মধ্যে এই অচলাবস্থা কিছু দুশ্চিন্তা নিয়ে এসেছিল, বিশেষ করে যখন সন্তানদের শিক্ষা এবং দেশে বসবাসকারী আত্মীয়দের সম্পদ পাঠানোর ব্যাপারে বিরোধপূর্ণ দাবি উঠেছিল। পারিবারিক সম্পত্তি ভাগের সময় এটা বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়। সেই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে প্রবাসী কর্তৃক দেশের আত্মীয়দের মধ্যে সম্পদ পুনর্বণ্টনকে সাধারণ পুনর্বণ্টন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং প্রায়ই ভাইবোন এবং পিতামাতাদের মধ্যে তিক্ত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল।

১৬. ইসলামিক ফোরামের ইতিহাসের জন্য দেখুন, ঈড এবং গার্বিন ২০০৬।

১৭. তথাকথিত স্বাগতিক দেশে প্রবাসীদের সন্তানদের স্থান (বা সেদিক থেকে ঘাটতি) নিয়ে ঝামেলাপূর্ণ অনুমান থাকায় এই লেখায় 'দ্বিতীয় প্রজন্মের' মতো শ্রেণিবিন্যাসগুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ধারণার একটি সমালোচনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন, আলি এবং অন্যান্য, ২০০৬।

১৮. এই দিনটি ৩ নভেম্বর স্মরণ করা হয় এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আওয়ামী লীগের চার নেতার হত্যাকাণ্ডকে মনে করিয়ে দেয়।

১৯. আমার গবেষণা-সহযোগীদের পরিচয়ের সুরক্ষার জন্য তাদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

২০. মাঠগবেষণা টীকা, ২ মার্চ ২০১২।

২১. চারদলীয় জোট বিএনপির নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে গঠিত হয়, যেখানে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী ঐক্যজোটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২২. তিনি জামায়াতে ইসলামীর সাংসদ।

২৩. মাঠগবেষণা টীকা, ৫ আগস্ট ২০০৩।

২৪. মাঠগবেষণা টীকা, ৬ আগস্ট ২০০৩।

২৫. মাঠগবেষণা টীকা, ৬ আগস্ট ২০০৩।

২৬. আইসিটির পরিপ্রেক্ষিতকরণে দেখুন, জেটলিন, এই বিশেষ সংখ্যায়।

২৭. পরের দিন ফারুক ফেসবুকে সাঈদীর একটি ভিডিও শেয়ার করে।

২৮. মাঠগবেষণা টীকা, ২০ ডিসেম্বর ২০১২।

২৯. মাঠগবেষণা টীকা, ৪ আগস্ট ২০০৩।

৩০. একটি তুলনামূলক কেসের জন্য দেখুন ওয়েবনার (২০০২)।

৩১. মাঠগবেষণা টীকা, ২১ অক্টোবর ২০০৬।

৩২. ২০০৭ সালে নামটি হাইকমিশনার ফর ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ইন্টারকালচারাল ডায়ালগে পরিবর্তিত হয়। এটি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যা অভিবাসন বিষয়ে পরামর্শ করে।

৩৩. মাঠগবেষণা টীকা, ২৬ মার্চ ২০০৭।

৩৪. মাঠগবেষণা টীকা, ১২ মার্চ ২০০৭।

৩৫. মাঠগবেষণা টীকা, ১১ এপ্রিল ২০০৭।

## গ্রন্থপঞ্জি


Alexander, Claire (2013) 'Contested Memories: The Shahid Minar and the Struggle for Diasporic Space', *Ethnic and Racial Studies*, 36(4), pp. 590-610.

Ali, Nasreen; Kalra, Virinder; Sayyid, Salmon (eds.) (2006) *A Postcolonial People: South Asians in Britain*, London: Hurst.

Amit, Vered (2002) *Realizing Community: Concepts, Social Relationships and Sentiments*, London: Routledge.

Anderson, Benedict (1998) *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World*, London: Verso.

Appadurai, Arjun (1996) *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Arendt, Hannah (1968) *The Origins of Totalitarianism*, New York: Harcourt, Brace and Jovanovich, [1951].

Bal, Ellen (2012) ''Were We Born Here to Suffer?' Constructing Notions of Belonging and Disengagement in Bangladesh', paper presented in the 22nd European Conference on South Asian Studies, Lisbon.

Baumann, Gerd (1996) *Contesting Culture: Discourses of Identity in Multi-Ethnic London,* Cambridge: Cambridge University Press.

Bowen, John (2004) 'Beyond Migration: Islam as a Transnational Public Space', *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 30(5), pp. 880-94.

Calavita, Kitty (2005) *Immigrants at the Margins: Law, Race, and Exclusion in Southern Europe,* Cambridge: Cambridge University Press.

Cohen, Anthony (1985) *The Symbolic Construction of Community*, London: Routledge.

de Genova, Nicolas (2002) 'Migrant Illegality and Deportability in Everyday Life', *Annual Review of Anthropology*, 31(1), pp. 419-47.

Eade, John (1989) *The Politics of Community: The Bangladeshi Community in East London*, Avebury: Aldershot.

Eade, John; Garbin, David (2006) 'Competing Visions of Identity and Space: Bangladeshi Muslims in Britain', *Contemporary South Asia*, 15(2), pp. 181-93.

Evens, T; Handelman, Don (eds.) (2006) *The Manchester School: Practice and Ethnographic Praxis in Anthropology*, Oxford: Berghahn Books.

Fassin, Didier (2008) 'The Embodied Past: From Paranoid Style to Politics of Memory in South Africa', *Social Anthropology*, 16(3), pp. 312-28.

Fog Olwig, Karen (2009) 'A Proper Funeral: Contextualizing Community among Caribbean Migrants', *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 15(3), pp. 520-37.

Fraser, Nancy (2007) 'Transnationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in a Post-Westephalian World', *Theory, Culture and Society*, 24(4), pp. 7-30.

Gardner, Katy (1993) 'Desh Bidesh: Sylheti Images of Home and Away'. *Man*, 28(1), pp. 1-15.

Gardner, Katy; Sukur, Abdus (1994) ''I´m Bengali, I'm Asian and I'm Living Here': The Changing Identity of British Bengalis', in

Roger Ballard (ed.), *Desh Pardesh: The South Asian Presence in Britain*, New Delhi: B.R. Publishing Corporation, pp. 142-64.

Gluckmam, Max (1940) *Analysis of a Social Situation in Modern Zululand*, Rhodes-Livingstone Paper nº 28, Manchester: Manchester University Press.

Glynn, Sarah (2006) 'The Spirit of 71: How the Bangladeshi War of Independence has Haunted Tower Hamlets', *Socialist History Journal*, 29, pp. 56-75.

Hacking, Ian (1995) *Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory*, Princeton: Princeton University Press.

Hall, Stuart (1997) 'The Spectacle of the 'Other'', in Stuart Hall (ed.) *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, London: Sage Publications, pp. 223-90.

Kabeer, Naila (2000) *The Power to Choose: Bangladeshi Women and Labour Market Decisions in London and Dhaka*, London: Verso.

Kibria, Nazli (2011) *Muslims in Motion: Islam and National Identity in the Bangladeshi Diaspora*, New Brunswick and London: Rutgers University Press.

King, Russel; Lazaridis, Gabriella; Tsardanidis, Charalambos (eds.) (2000) *Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe*, London: Palgrave.

Knights, Melanie (1996) 'Bangladeshi Immigrants in Italy: From Geopolitics to Micropolitics', *Transactions of the Institute of British Geographers,* 21(1), pp. 105-23.

Mankekar, Purmina (2005) 'India Shopping: Indian Grocery Stores and Transnational Configurations of Belonging', in James Watson & Melissa Caldwell (eds.) *The Cultural Politics of Food and Eating*, Oxford: Blackwell, pp. 197-213.

Mapril, José (2011) 'The Patron and the Madman: Migration, Success and the (In)Visibility of Failure Among Bangladeshis in Portugal', *Social Anthropology*, 19(3), pp. 288-96.

Mapril, José (2014) 'The Dreams of Middle Class: Consumption, Life-Course and Migration Between Bangladesh and Portugal', *Modern Asian Studies*, 48(3), pp. 693-719

Massey, Douglas; Arango, Joaquin; Hugo, Graeme; Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela; Taylor, Edward J. (1993) 'Theories of International Migration: A Review and Appraisal', *Population and Development Review*, 19(3), pp. 431-466.

Meer, Nasar; Modood, Tariq (2011) 'How Does Interculturalism Contrast with Multiculturalism', *Journal of Intercultural Studies*, 33(2), pp. 175-96.

Mitchell, J. C. (1958) *The Kalela Dance: Aspects of Social Relationships among Urban Africans in Northern Rhodesia*, Manchester: Manchester University Press.

Schiller, Nina Glick; Bach, Linda; Szanton-Blanc, Christina (1992) 'Transnationalism: A New Analytic Framework for Understanding Migration', *Annals of the New York Academy of Sciences*, 645, pp. 1-24.

Schiller, Nina Glick; Bach, Linda; Szanton-Blanc, Christina (1994) *Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States*, London: Taylor & Francis.

Schiller, Nina Glick; Fouron, Georges (2001) *George Woke Up Laughing: Long Distance Nationalism and the Search for Home,* Durham: Duke University Press.

Schiller, Nina Glick (2004) 'Transnationality', in David Nugent and Joan Vincent (eds.) *A Companion to the Anthropology of Politics*, Oxford: Blackwell, pp. 448-67.

Siddiqui, Tasneem (2004) *Institutionalising Diaspora Linkage: The Emigrant Bangladeshi in UK and USA,* Dhaka: I.O.M.

Vertovec, Steven (2009) *Transnationalism*, London: Routledge.

Visram, Rozina (1986) *Asians in Britain: 400 Years of History*, London: Pluto Press.

Werbner, Pnina (2002) *Imagined Diasporas among Manchester Muslims*, Oxford: James Currey.

Zeitlyn, Benjamin (2006) *Migration from Bangladesh to Italy and Spain,* Dhaka: R.M.M.R.U.

Zeitlyn, Benjamin (2013) 'Desh Bidesh Revisited', *Identities*, 20(3), pp. 253-69.

সাক্ষ্যপ্রমাণ ও দলিলপত্র

## মার্কিন দলিলপত্রের সাক্ষ্য

# কেন বুদ্ধিজীবী হত্যা? কীভাবে জামায়াত জড়িত?

**মিজানুর রহমান খান**

*প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কাইভে ২০১২ সালের ১ নভেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত আমি গবেষণাকাজে নিয়োজিত ছিলাম। এ সময় আমি প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্টের আওতায় ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত অবমুক্ত করা গোপনীয় নথিপত্র পরিদর্শন করি। আমি সেখানে দেখি, ঢাকার মার্কিন কনসাল হার্বার্ট ডি স্পিভাক ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে পাঠানো একটি তারবার্তায় (আমার নোটবুক অনুযায়ী এর ক্রমিক নম্বর ঢাকা ৫৭২৪) উল্লেখ করেছেন, বুদ্ধিজীবী হত্যায় জামায়াতি দুর্বৃত্ত বা 'জামায়াত থাগস'রা জড়িত।

ওই তারবার্তায় স্পিভাক লিখেছেন, 'নিহত বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যায় কত তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, এটা "জামায়াত থাগস"রা ঘটিয়েছে। এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর 'কনাইভেন্স' বা তাদের সম্মতিতে এটা ঘটেছে। এই ঘটনা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণতা এবং যুদ্ধাপরাধের দাবি তুলতে পারে।'

আর নির্দিষ্টভাবে আলবদরই যে এর নেতৃত্ব দিয়েছে সে বিষয়ে মার্কিন দলিলপত্রে যেমন তেমনি তা পাশ্চাত্যের গবেষকেরাও নিশ্চিত করেছেন। এর মধ্যে ইরানি বংশোদ্ভূত মার্কিন অধ্যাপক ড. সাইদ ভালি রেজা নসরের নাম প্রণিধানযোগ্য। তিনি জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা আবুল আলা মওদুদী সম্পর্কে দুটি গবেষণামূলক বইও লিখেছেন।

ভালি রেজা নসর বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স স্কুল অব অ্যাডভান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সরকারের মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ফরেন অ্যাফেয়ার্স পলিসি বোর্ডের সদস্য। এর আগে তিনি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানবিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি (২০০৯-২০১১) হিসেবে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত রিচার্ড হলব্রুক সিনিয়র অ্যাডভাইজারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামি বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক একজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৯১ সালে এমআইটি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনি পিএইচডি করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি মার্কিন সিনেটে তাঁকে উদ্ধৃত করে বক্তব্য রেখেছেন। এবং মার্কিন কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড হাস নসরকে আমেরিকার 'ন্যাশনাল রিসোর্স' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ভালি নসরের লেখা বই *দ্য ভ্যানগার্ড অব দি ইসলামিক রেভল্যুশন: দ্য জামায়াত-ই-ইসলামি* বইয়ের ৬৬ পৃষ্ঠায় তিনি জামায়াতের অঙ্গসংগঠন ইসলামি জমিয়তে তুলাবা আইজেটির সঙ্গে আলবদরের সম্পর্ক এবং তাদের দ্বারা বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছেন। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে তাঁর এই বইয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নাম আছে।

ভালি নসর লিখেছেন, 'এটা বিস্ময়কর নয় যে ইসলামি জমিয়তে তুলাবা (আইজেটি) ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে যখন আইয়ুব খানের শাসন ভেঙে পড়ে এবং পিপলস পার্টি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বাঙালি পার্টি আওয়ামী লীগের মধ্যে বিরোধের কারণে গৃহযুদ্ধ ঘটে এবং পাকিস্তান ভেঙে যায়, তখন তুলাবা পুনরায় রাজনৈতিক লাইমলাইটে চলে আসে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আইজেটি পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি ও আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জামায়াতের ন্যাশনাল ক্যাম্পেইনের নেপথ্যের মূল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই প্রচারণার ফলে জাতীয় রাজনীতিতে আইজেটির অবস্থান নিশ্চিত হয়, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মে মাসে। এ সময় আইজেটি পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ দমন অভিযোনে যোগ দেয়। সেনাবাহিনীর সাহায্যে আইজেটি দুটি আধা সামরিক বাহিনীর ইউনিট সংগঠিত করে। আর তা হলো আলবদর ও আলশামস। তাদের কাজ ছিল বাঙালি গেরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। অধিকাংশ আলবদর নেওয়া হয়েছিল আইজেটি সদস্যদের মধ্য থেকে, যারা পূর্ব পাকিস্তানে মুহাজির সম্প্রদায়ের প্রতি সমর্থন জুগিয়েছিল। আইজেটির নাজিম-ই-আলা মতিউর রহমান নিজামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলবদর ও আলশামস সংগঠিত করেন। গৃহযুদ্ধে তাঁদের ওই ভূমিকার কারণে তাঁদেরকে চরম মূল্য দিতে হয়।'

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ৮ ডিসেম্বর লন্ডনের *দি ইকোনমিস্ট* 'গিল্টি অ্যাট বার্থ' শীর্ষক প্রতিবেদনে নিজামীকে আলবদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে উল্লেখ করলে নিজামী তার প্রতিবাদ করেন। নিজামী দাবি করেন যে আলবদরের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। অথচ আলবদরের সঙ্গে নিজামীর সম্পৃক্ততা মাওলানা নিজামীরই দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারের বরাতে দাবি করেছেন অধ্যাপক ভালি নসর। অধ্যাপক নসর তাঁর বইয়ের ফুটনোটে নির্দিষ্টভাবে এর তথ্যসূত্র হিসেবে ১৯৮১ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত সৈয়দ মুত্তাকিল রহমানের *য্যাব ভু নাজিম-ই আলা দি*-এর বরাত দিয়েছেন।

মার্কিন কূটনীতিকেরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে জামায়াত ও মওদুদী গোড়া থেকেই সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল এবং ইসলামের নামে নানা ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। তবে বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে জামায়াতের বদর বাহিনী গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। আর এটা আমরা আমেরিকান সরকারের নথিপত্রের সাহায্যেই অনেকটা খতিয়ে দেখতে পারি। আমরা দেখি যে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের লক্ষ করে মাওলানা মওদুদী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নাৎসিবাদের মতোই একটি জামায়াতবাদ বা মওদুদীবাদের সূচনা করেন।

এ অঞ্চলের মার্কিন কূটনীতিকেরা ধারাবাহিকভাবে পঞ্চাশের দশক থেকেই জামায়াতে ইসলামী ও তার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর রাজনৈতিক দর্শনে বাঙালি, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতি জামায়াতের ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষ করেন। জামায়াতের এই অবস্থান বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলেই প্রতীয়মান হয়। ইসলাম বা অন্যান্য নামে বা কারণে স্বাধীনতার বিরোধিতাকারীদের থেকে এই অবস্থান জামায়াতকে আলাদা করেছে।

জামায়াত গোড়া থেকেই বাংলা, বাঙালি, বাঙালি সংস্কৃতি, পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন ও নাৎসিদের মতো বর্ণবাদী অবস্থান নিয়ে প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিক ইস্যুকে নির্দিষ্টভাবে ইসলামের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। এটাকেই আমি বলি জামায়াতবাদ। নাৎসিবাদের মতো এটা নিষিদ্ধ করার দাবি রাখে। মওদুদী স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার আন্দোলনকে ইসলামবিরোধী, যৌথ নির্বাচনপদ্ধতিকে ইসলামবিরোধী এবং সর্বোপরি পদ্ধতিগতভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যায় জড়িত হয়ে নিজেকে অন্য সব ইসলামি দল বা গোষ্ঠী থেকে পৃথক করেছে। তাই রংপুরে বাংলা ভাষার দাবিতে অধ্যাপক গোলাম আযমের তিন সপ্তাহ জেল খাটার একটি বিচ্ছিন্ন দাবির সঙ্গে তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কোনো মিল নেই ।

অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর বইয়ে [*জীবনে যা দেখলাম*] মওদুদীর *তারজুমানুল কোরান* পড়ে তাঁর মুগ্ধতার বিবরণ দিয়েছেন। ভালি নসর লিখেছেন,



১৯৫১ সালের জুনে *তারজুমানুল কোরান*-এর একজন পাঠকের প্রশ্নের জবাবে মওদুদী ঘোষণা দেন যে ভারত দারুল কুফর (ল্যান্ড অব ব্লাসফেমি) এবং ভারত প্রত্যাগতদের বিয়ে করা পাকিস্তানিদের জন্য হারাম। এ ছাড়া মওদুদী মাহদি ও আহমেদিঘেঁষা হিসেবেও উলেমাদের দ্বারা অভিযুক্ত হন। এ জন্য তিনি ভারত ও পাকিস্তানের সব মতবাদের অনুসারী উলামাদের সমালোচনার শিকার হন (পৃ. ১২৯)। ভালি নসর আরও লিখেছেন, '১৯৭১ সালের গৃহযুদ্ধে জামায়াত তার শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে [ইয়াহিয়া] সরকারের পাশে দাঁড়ায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশ হওয়া ঠেকাতে সংঘাতে অংশ নেয়। সমাজতন্ত্রের ধারক ভুট্টোর জনপ্রিয় হয়ে ওঠাকেও তারা ইসলামের প্রতি চ্যালেঞ্জ (এটাও জামায়াতবাদ) হিসেবে দেখে এবং সে কারণে তারা ১৯৭২-৭৪ সালে [ভুট্টো কর্তৃক] বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিরোধিতা এবং নতুন করে আহমেদিয়া দাঙ্গা শুরু করে' (পৃ. ৫৬)।

১৯৫৩ সালের ১২ মে (টেলিগ্রাম নং ১৭১১) করাচির মার্কিন কনস্যুলেট ওয়াশিংটনকে জানায়, সামরিক আদালতে লাহোরে আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রায়ট বাধানোর জন্য মওদুদীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ১১ মে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। মওদুদী পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় মোল্লা। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রসচিব উভয়ে তাঁকে 'পাকিস্তানের সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

১৯৫৬ সালের ১৪ জুন করাচির মার্কিন দূতাবাসের (ফরেন সার্ভিস ডেসপাচ নং ৮৯৩) প্রথম সচিব গ্যারেট এইচ সোলেন 'মাওলানা মওদুদী অ্যান্ড দি ইলেকটরাল সিস্টেম অব পাকিস্তান' শীর্ষক তারবার্তায় লেখেন, পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থোডক্স প্রেসার গ্রুপ জাতীয় ভোট প্রদান পদ্ধতিতে ধর্মীয় পার্থক্য সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণা শুরু করেছে।

মওদুদী ও জামায়াতের এই দৃষ্টিভঙ্গিই বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেয়। উল্লেখ্য, ১৯০৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ডের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মর্লি-মিন্টোর ব্যাপকভিত্তিক সাংবিধানিক সংস্কারের আওতায় মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য ব্রিটিশ ভারতে পৃথক নির্বাচনপদ্ধতি চালু করেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রেকর্ড থেকে দেখা যাবে, সেটা তারা মুসলিম লীগের দাবি বিবেচনায় নিয়ে করলেও সেখানে আল-কোরআন, ধর্ম ও বর্ণ একেবারেই বিবেচ্য ছিল না। মুসলমানরা সমাজের অনগ্রসর অংশ বিবেচনায় পৃথক নির্বাচনপদ্ধতি করা হয়েছিল। অথচ মাওলানা মওদুদী ১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় এই বিষয়টিকে কোরআনের আলোকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে একটি ফতোয়া দেন। তিনি *ডন* পত্রিকায় তিন কিস্তিতে নিবন্ধ লেখেন, মওদুদীর আসল মাথাব্যথা যে ছিল পূর্ব পাকিস্তান, তা এই নিবন্ধে ফুটে উঠেছে।

করাচির মার্কিন দূতাবাস যথার্থই বলেছিল, 'মওদুদীর এই প্রপাগান্ডার লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত করা। পাকিস্তানের উভয় অংশের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যাতে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচনপদ্ধতি সংরক্ষণ করে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কাছে সুপারিশ পাঠায়। যুক্ত পদ্ধতিতে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী থাকবে। জয়েন্ট ইলেকটরেট হলে তা হিন্দুদের দুর্বল করবে, এই যুক্তি 'সবচেয়ে বড় প্রতারণা' মনে করেন মওদুদী। তাঁর কথায় জয়েন্ট ইলেকটরেট হওয়ার পরিণাম হবে হিন্দুরা যতটা না পারবে, তার চেয়ে বেশি তাদের জন্য করে দেবে মুসলমানরা। যারা সেক্যুলার ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, তারাই কার্যকরভাবে হিন্দুদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে।'

মার্কিন কূটনীতিক গ্যারেট সোলেন এরপর লেখেন, এই বিষয়ে মওদুদীর লেখা একটি নিবন্ধ ধারাবাহিকভাবে *ডন* পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এতে মওদুদীর বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের ভীতি ফুটে উঠেছে। যদি শুধু মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে পৃথক ভোট পদ্ধতি করা যায়, তাহলে সেটাই হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিহত করার কার্যকর হাতিয়ার। যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির প্রস্তাবকে মওদুদী ইসলামের উদ্দেশ্য নষ্ট করার হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর কথায় কেবল মুসলিম ভোটাররাই একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে। হিন্দুরা 'এর দৃশ্যপটে একেবারেই আসতে পারে না।' যারাই জয়েন্ট ইলেকটরেট চাইবে, তাদের উদ্দেশ্য হবে একটি 'প্রকৃত ইসলামি জীবনব্যবস্থা' প্রতিরোধে শামিল হওয়া। যুক্ত পদ্ধতির সমর্থন করা মানেই 'মুসলিম ভণ্ড ও নাস্তিকদের নির্বাচন' বলে গণ্য হবে। মার্কিন কূটনীতিক তাঁর তিন পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের মন্তব্য অংশে লেখেন, মওদুদীর বিশ্লেষণের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য স্ববিরোধিতা রয়েছে। পাকিস্তান যেখানে একটি বহুধর্মীয় সমাজ, সেখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সেক্টেরিয়ান বা তাতে উপদলীয়তা প্রকাশ পাচ্ছে। মওদুদী স্বীকার করেছেন যে মুসলমানরা বিভক্ত। কারণ, একটি গোষ্ঠী বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ চায়। তিনি সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের আইনগত অধিকার মঞ্জুর করেন। কিন্তু আবার এ কথাও বলেন, একটি প্রকৃত ইসলামি সমাজে হিন্দুদের কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। এরপর সোলেন আরও লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে যে যদি যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর আওতায় নির্বাচন হয় তাহলে বর্তমানে হিন্দু এমএলএরা যে ৫০টি আসন দখল করে আছে, সেগুলোতে তারা জয়লাভ করবে। মার্কিন কূটনীতিক নির্দিষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ করেন যে মওদুদীর সমর্থকেরা প্রধানত আওয়ামী লীগের ক্ষমতায়ন এবং তাঁর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কর্মসূচিতে শঙ্কিত।

উল্লেখ্য যে ১৯৫৬ সালের ৪ জুন মওদুদী *ডন*-এ তাঁর দ্বিতীয় কিস্তির নিবন্ধে 'মুসলমান ও হিন্দুর জীবনের সবকিছুই পৃথক। আমরা তাই কেবল ব্যালট বাক্সে



একত্র হতে পারি না। হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য এতটাই মৌলিক যে জীবনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোর কোনোটিতেই তাদের একমত হওয়ার সুযোগ নেই। পাকিস্তান হলো মুসলিম জাতির ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ এবং একে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে।' জিন্নাহকে এভাবে উদ্ধৃত করে মওদুদী লিখেছেন, 'বাঙালি সাহিত্য মূলত হিন্দু লেখকদের সৃষ্টি। শিক্ষিত মুসলমানদের এই সাহিত্য দিয়েই বুদ্ধিভ্রম ঘটানো হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এমন অনেক সাময়িকী ও সংবাদপত্র রয়েছে, যাতে কেবল মুসলমানদের নাম ব্যবহার করা হয় কিন্তু আসলে তা হিন্দুদের টাকায় এবং তাদের বুদ্ধি-পরামর্শেই চালিত হয়ে থাকে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলও হিন্দু অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল। যদি পাকিস্তানে জয়েন্ট ইলেকটরেট প্রবর্তন করা হয়, তাহলে ভারত থেকে তেমন ধরনের মুসলমানরা এসে ঘাঁটি গড়বে, যারা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।'

১৯৫৬ সালের জুনে *ডন*-এ মওদুদী এই নিবন্ধটি লেখার আগে তাঁর জীবনের প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরটি করেন। ১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত মওদুদীর এই সফর সম্পর্কে গোলাম আযম গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ২০০২ সালে কামিয়াব প্রকাশন প্রকাশিত তাঁর *জীবনে যা দেখলাম*, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '৩৮ দিন মাওলানার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আমার আদর্শিক ও সাংগঠনিক জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা।'

মওদুদী বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছিলেন, তাতে কখনো কোনো ভ্রান্তি দেখেনি জামায়াত। আশ্চর্যের বিষয়, সংখ্যালঘুদের জন্য 'পৃথক' পদ্ধতি আজও জামায়াত তার গঠনতন্ত্রে ধারণ করে আছে। গোলাম আযম তাঁর বইয়ে অসাম্প্রদায়িক হতে আওয়ামী লীগের যুক্ত নির্বাচনপদ্ধতি গ্রহণকে কটাক্ষ করেন। ১৫৯ পৃষ্ঠায় যুক্ত পদ্ধতির নির্বাচন গ্রহণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'অমুসলিমদের নিকট পরিপূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য হওয়ার "মহান উদ্দেশ্যেই" আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণরূপে "অসাম্প্রদায়িক" ও "ধর্ম নিরপেক্ষ" হওয়ার মহাগৌরব (?) অর্জন করে।'

আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে এই মওদুদীবাদ কিংবা জামায়াতবাদ জার্মানিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষিত ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তুলনীয় এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশেও এই অপরাজনীতির কোনো ঠাঁই হতে পারে না। ওই 'জামায়াতবাদের' অনুশীলন সংবিধান পরিপন্থী বলেই প্রতীয়মান হয়।

মওদুদী ও জামায়াতের ওই ঐতিহাসিক হিন্দু বিদ্বেষ থেকেই একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যা ও গণহত্যার বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল। এর ভিত্তিতেই আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটি গঠন করতে পেরেছিল জামায়াত।

মার্কিন নথিই সাক্ষ্য দিচ্ছে, মওদুদীর ওই মতবাদই হয়ে উঠেছিল গণহত্যার মূল 'আদর্শগত' ভিত্তি। একটি নথিতে বলা হয়, '১৯৭১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান "হাতে গোনা কতিপয় বুদ্ধিজীবী" এবং লেখক "পরিকল্পিত উপায়ে সংস্কৃতজাত বাঙালি শব্দ" ব্যবহার করছেন এবং তাঁরাই এখন "বাঙালিবাদ এবং হিন্দু প্রভাবিত সংস্কৃতির প্রবক্তা" হয়ে উঠেছেন। গভর্নর অভিযোগ করেন যে সীমান্তের ওপারের লোকজন তাদের মদদ দিচ্ছে। ১৫ সেপ্টেম্বর নিয়মিত বেতার ভাষণে মালেক অভিযোগ করেন যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে যারা পাকিস্তানের রণক্ষেত্র থেকে উৎখাত হয়েছিল, তারাই ছদ্মবেশ ধরে এখন সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে কব্জা করতে চাইছে। পশ্চিম পাকিস্তানের রণক্ষেত্র থেকে যুদ্ধ এখন পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে।'

একাত্তরে মার্কিন কংগ্রেসের শুনানিগুলোতে স্পষ্ট যে বুদ্ধিজীবীরা আগাগোড়া পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের দোসরদের টার্গেট ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর হেনরি কিসিঞ্জারের জন্য প্রস্তুত একটি স্মারকে উল্লেখ করা হয় যে ইয়াহিয়া ৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন কিন্তু ঢাকার মার্কিন কনস্যুলেট জানিয়েছে যে বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার অব্যাহত রয়েছে (*আমেরিকান পেপারস*, পৃ. ৬৭০)।

১৯৭১ সালে ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল অর্চার ব্লাড তাঁর বিখ্যাত টেলিগ্রামে ২৫ মার্চে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তাঁকে সরিয়ে তাঁর স্থানেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন হার্বার্ট ডি স্পিভাক। ১৯৪৯ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকায় প্রথম মার্কিন কনস্যুলেট খোলা হয়। ১৯৭২ সালের ১৮ মে ঢাকায় পূর্ণাঙ্গ মার্কিন দূতাবাস প্রতিষ্ঠালগ্নে স্পিভাক ছিলেন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স।

আমি লক্ষ করি যে একাত্তরের মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেটের শুনানি ও আলোচনায় গণহত্যা বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কংগ্রেসের আগ্রহের কারণেও ঢাকার মার্কিন কনসাল স্পিভাক বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিশেষ নজর রেখেছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাঁর বর্ণনায় জামায়াতের নাম আকস্মিকভাবে আসেনি।

১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর লেখেন (তারবার্তা নম্বর ঢাকা ৫৭১৪), 'বাঙালি সৈন্যরা কথিতমতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার অল্প আগে গ্রেপ্তার হওয়া কয়েক শ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে ওই ব্যক্তি অন্তত ২০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেন বলে অভিযোগ আছে।' এটা লক্ষণীয় যে মার্কিন কনসাল মূল বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ১৪-১৬ ডিসেম্বরে সংঘটিত হয় বলে বর্ণনা করেন। এটা ঘটে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়ার পরে।



প্রফেসর ইমেরিটাস ড. আনিসুজ্জামান সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি চৌধুরী মুঈনুদ্দীনকে ১৯৭৯ সালে লন্ডনের পাবলিক লাইব্রেরির ইন্ডিয়া অ্যাফেয়ার্স বিভাগে ১৯৭১-এর *স্টেটসম্যান* পত্রিকার মাইক্রোফিল্ম দেখতে পেয়েছিলেন। এই *স্টেটসম্যান*-এ ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর খবর ছাপা হয়েছিল যে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১১ ডিসেম্বর '৭১ 'গণবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক তৎপরতার' দায়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, মুসলিম লিগ, জামায়াতে ইসলামী এবং নিজাম-ই-ইসলামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে কলকাতার মার্কিন কনসাল গর্ডন ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে তারবার্তায় (কলকাতা ৩০২৮) জানান, ছয়টি দলকে (মুসলিম লিগ তিনটি স্বতন্ত্র ও উপদলের সমন্বয়ে) নিষিদ্ধ করার মূল কারণ তাদের সন্দেহভাজন 'কোলাবরেশনিস্ট অ্যাক্টিভিটিজ'। ঢাকার মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করে কর্ন ওই বার্তা পাঠান বলেও উল্লেখ করেন।

হার্বার্ট স্পিভাক ঢাকা ৫৯৯৬ নম্বর তারবার্তায় ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনকে অবহিত করেন যে ঢাকার পশ্চিম পাশে ইটখোলাসংলগ্ন পতিত একটি মাঠের গর্তে ৩০টি গলিত মরদেহের সন্ধান মিলেছে। বিশ্বাস করা হয় যে পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মির স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা সমর্থক ও রাজাকার আত্মসমর্পণের শর্তাবলি যাতে তাদের অনুকূল হয়, সে জন্য প্রায় ৩০০ জন বুদ্ধিজীবীকে গ্রেপ্তার করেছিল 'হোস্টেজ' হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। ওই লাশগুলো গ্রেপ্তারকৃত বুদ্ধিজীবীদেরই হবে। নারী প্রফেসর এবং কতিপয় মেডিকেল স্পেশালিস্টকে আত্মসমর্পণের মাত্র দুই দিন আগে হত্যা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, ইটের কারখানার কাছে অনেককেই হত্যা করে গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। কথিতমতে, রাজাকাররা এখনো ইটখোলায় লুকিয়ে আছে। ভারতীয় একটি টহল দল শনিবার অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে কয়েকজন রাজাকারকে আটক করেছে। কথিতমতে, তারা ওই হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছে।

১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর [তারবার্তা নম্বর ৫৮৪৩] স্পিভাক ওয়াশিংটনকে জানান, 'ঢাকার প্রেস এবং জনগণ সার্বক্ষণিক এই চিন্তায় আছেন যে, "বাংলাদেশকে বুদ্ধিজীবীশূন্য" করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারি জেনারেলের বরাতে বলা হয়েছে জেনারেল ফরমান আলী এবং অন্যরা ১৫-১৬ ডিসেম্বরে যারা নিহত হয়েছে, তাদের তালিকা তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল।' আরেকটি নথিতে আছে, কেলি নামে ঢাকায় ইউনিসেফের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। ভারতীয় হাইকমিশনের জে এন দীক্ষিত (পরে পররাষ্ট্রসচিব) কেলিকে একান্তে বলেছেন, ভারতীয়রা ফরমান আলীর দপ্তর

থেকে কিছু নথিপত্র পেয়েছেন, যা থেকে অনুমান করা চলে যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে তাঁর ভূমিকা ছিল।

১৯৭১ সালের ২৮ জানুয়ারি ওয়াশিংটন থেকে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম পি. রজার্স ঢাকার মার্কিন কনস্যুলেটে পাঠানো এক তারবার্তায় [নম্বর ১৬৮৯২] বলেন, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তথ্য জানতে মার্কিন কংগ্রেস অব্যাহতভাবে আগ্রহ দেখিয়ে চলেছে। তাই ডিসেম্বরের গোড়ায় যেসব বুদ্ধিজীবী মারা গেছেন, তাঁদের নাম এবং নিহত হওয়ার প্রেক্ষাপট জানিয়ে অতিরিক্ত তথ্য জানতে চাইছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

তাই বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের কাছে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে বলেও প্রতীয়মান হয়। ধারণা করা যায় যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের দায়ী করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর হার্বার্ট স্পিভাক ৫৭৭২ নম্বর কনফিডেনশিয়াল তারবার্তায় ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দেন যে 'বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের জন্য মুক্তিবাহিনীকে দায়ী করা নিম্নোক্ত কারণে সন্দেহ সৃষ্টি করে :

(১) আমাদের জানামতে, ১৪-১৫ ডিসেম্বরে (আগের [তারবার্তায়] এই তারিখ ১৫-১৬ ডিসেম্বর উল্লেখ করা হয়েছিল) হত্যাকাণ্ড ঘটে। ওই সময়ে পাকিস্তানি আর্মির নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং কারফিউ পুরোপুরি কার্যকর ছিল। (২) ওই সময়ে মুক্তিবাহিনীর সক্রিয় থাকার ব্যাপারে সামান্যই সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। (৩) নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো, তাঁদের কেউ 'কোলাবরেটর' ছিলেন না। বরং তাঁদের অধিকাংশই বাঙালি জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ...যদিও তাঁদের অনেকেই ঢাকায় অবস্থান করেছেন কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য দেননি।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আটজনের মৃত্যু স্পিভাক নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন। তাঁরা হলেন: অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক এম এফ রাব্বী, শহীদুল্লা কায়সার, সিরাজুদ্দীন হোসেন, এস এ মান্নান, নিজামউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক এ খায়ের ও ড. আলীম চৌধুরী।

'বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা' শীর্ষক ওই তারবার্তায় [৫৭৭২] আরও তিনটি বার্তার [ঢাকা ৫৭২৪ ও ৫৭৪৩: ইসলামাবাদ ১২৮৫৬] উল্লেখ দেখেছি। মনে হচ্ছে, ওই বার্তাগুলো বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডবিষয়ক, এগুলোর হদিস আমি পাইনি।

১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি স্পিভাক অপর এক তারবার্তায় (ঢাকা ৩৯৩) যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ বুদ্ধিজীবী হত্যার তথ্য উল্লেখ করেন। অন্যান্য বড় শহর থেকেও একই ধরনের খবর এসেছে, তবে তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তালিকার সবাই বাঙালি কিন্তু সাধারণভাবে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয়। তাঁদের অধিকাংশই ১১ ডিসেম্বরের রাত এবং ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। প্রায়ই উর্দি পরিহিত সামরিক জওয়ানদের পরিহিত



থেকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাঁদের আটক করে। সংবাদপত্র, কনস্যুলেটের স্থানীয় স্টাফ এবং আমেরিকান সংবাদদাতাদের ভাষ্য অনুযায়ী, ঢাকার উত্তর-পশ্চিমাংশের একটি ইট কারখানায় তাঁদের অধিকাংশকে হত্যা করা হয়। মার্কিন সাংবাদিকেরা প্রায় ২০টি লাশ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, মৃত্যুর আগে তাঁদের ওপর নির্যাতন চলেছে। ইউসিসের স্থানীয় জ্যেষ্ঠ স্টাফদের রিপোর্ট করেছেন যে ইতিপূর্বে গণনায় ধরা হয়নি এমন অনেক নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীকে মোহাম্মদপুর বিহারি ক্যাম্পে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল এবং তাঁদের হত্যা করা হয়। এই তারবার্তাটির পরের অংশ আমি পাইনি।

মার্কিন কংগ্রেস যে বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একাত্তরেই অবহিত ছিল তার সাক্ষ্য দেবে মার্কিন কংগ্রেশনাল রেকর্ড। উপরন্তু ওই সময়ে জাতিসংঘও স্বীকার করেছে যে একাত্তরের ডিসেম্বরের পরিস্থিতি মার্কিন কনস্যুলেটই সবচেয়ে ভালোভাবে নজরদারি করতে পেরেছে।

১৯৭১ সালের ২৯ এপ্রিল মার্কিন কংগ্রেসে উইলিয়াম বি. স্যাক্সবি মার্চের গণহত্যা সম্পর্কে ঢাকার ইউএসএইডে কর্মরত এক মার্কিন চিকিৎসকের একটি চিঠি উপস্থাপন করেন। ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ওহাইও থেকে ডা. জন ই রোড লিখেছেন, প্রিয় সিনেটর স্যাক্সবি, আমি ও আমার স্ত্রী কদিন আগে ঢাকা থেকে এসেছি। ...এই অধ্যাপকদের অনেকের পরিবারের সদস্যদেরও গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ড. রোড আর্চার ব্লাডের বার্তাগুলোর কথাও উল্লেখ করেন।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর পপুলেশন স্টাডিজের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ড. রিচার্ড ডি ট্যাবরস ও তাঁর স্ত্রী প্যাটন ও ট্যাবরস ১৯৭১ সালের ১৬ মে বোস্টন গ্লোবে লিখেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপকদের তাঁদের বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়...' [১৮ মে, ১৯৭১, কংগ্রেশনাল রেকর্ড সিনেট, পৃ. ১৫৪৮৪]।

এখানে লক্ষণীয় যে '৫৬ সালে বাঙালির জাতীয়তাবাদের প্রতি মওদুদীর ঘৃণা কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় ছিল না। পাঞ্জাবিদের কব্জায় থাকা আর্মি চিন্তায়ও তা ছিল। মওদুদী একে ইসলাম দিয়ে ব্যাখ্যা করে আরও ভয়ংকর করে তুলেছিলেন।

সে কারণে একাত্তরের ২৯ মার্চ ব্যাংকক ডেটলাইনে *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ সেলিন এস. হ্যারিসন লিখেছেন, 'পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র যখন সমরাস্ত্র সরবরাহ শুরু করে তখন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে ঘরোয়াভাবে সতর্ক করেছিলেন যে এসব অস্ত্র একদিন বাঙালির আকাঙ্ক্ষা দমনেই ব্যবহৃত হবে।'

১৯৭১ সালের ১৮ মে মার্কিন কংগ্রেসের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বাঙালি হত্যায় মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়ে হ্যারিসনের ওই প্রতিবেদনটির বরাত

দিয়েছিলেন সিনেটর চার্চ (সূত্র : মে ১৮, ১৯৭১, কংগ্রেশনাল রেকর্ড সিনেট, পৃ. ১৫৪৬৯) একই দিনে কংগ্রেস নথিবদ্ধ করে ১৬ মে ১৯৭১ ম্যালকম ডব্লিউ ব্রাউনের *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ প্রকাশিত লেখা, 'সৈন্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তাড়া করেছে এবং ঠান্ডা মাথায় তাদের এবং তাদের পরিবারকে হত্যা করেছে' (১৮ মে, ৭১, কংগ্রেশনাল রেকর্ড পৃ. ১৫৬০৯)।

৭ জুন ১৯৭১, *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ অ্যান্থনি লিউস (Anthony Lewis) লিখেছেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ "সিলেকটিভ"। আর্মির নির্দিষ্ট টার্গেট হলো বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের জনমত গঠনকারী অংশ—চিকিৎসক, অধ্যাপক, ছাত্র ও লেখক' [১১ জুন, ১৯৭১, মার্কিন কংগ্রেসের বিতর্ক, পৃ. ১৯৫১৭]।

১০ জুন ১৯৭১ সিনেট ফরেন রিলেশনস কমিটির শুনানিতে অনর্গল বাংলা বলতে পারা হার্ভার্ডের মেডিকেল স্কুল স্নাতক ড. জন রোড, যিনি এর আগে সিনেটর স্যাক্সবিকে চিঠি লেখেন, তিনি এ দিন শুনানিতে অংশ নেন। তিনি বলেন, আমি ২৫ মার্চ রাতে ঢাকার রাস্তায় ট্যাংকবহরে আমেরিকান এম-২৪ প্যাটনস দেখেছি। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান আর্মির সামরিক আইন নম্বর ১৪৮ আমাকে ১৯৩০-এর দশকে নাৎসি জার্মানির 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' ফরমান স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ সিডনি এইচ শ্যানবার্গ দিল্লি ডেটলাইনে লিখেছেন, 'রক্তস্নাত প্রতিশোধের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন তরুণ, বুদ্ধিজীবী, নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের সদস্য এবং সংখ্যালঘু হিন্দু' [সূত্র : ৮ জুলাই, ১৯৭১, রেকর্ড, পৃ. ২৪০৬৭]।

হিন্দু নিশ্চিহ্নকরণের যে যৌক্তিকতা দিয়েছেন জেনারেল টিক্কা খান তারও মূলে রয়েছে ওই জামায়াতবাদ বা জামায়াতিজম। মার্কিন কংগ্রেস অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের *সানডে টাইমস*-এ লেখা একটি প্রতিবেদন বিবেচনায় নেয়। সেখানে মাসকারেনহাস লিখেছেন, ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ আমি রেডিওতে টিক্কার কণ্ঠ শুনলাম 'পাকিস্তান সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠের কণ্ঠস্বর আসলে সহিংস ও উচ্চকিত সংখ্যালঘুদের কারণেই চাপা পড়েছে, তারাই আওয়ামী লীগকে ধ্বংসের পথে যেতে বাধ্য করেছে [*সানডে টাইমস*, লন্ডন, ১৩ জুন, ৭১ মাসকারেনহাস [কংগ্রেশনাল রেকর্ড জুলাই ৮, ৭১, পৃ. ২৪০৭৯]। নবম ডিভিশনের দপ্তরে কর্নেল নাজিম তাঁকে বলেন, 'হিন্দুরা তাদের অর্থ দিয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একেবারে নত করে ফেলেছে। ...বাঙালি সংস্কৃতি মানে হিন্দু সংস্কৃতি।'

মাসকারেনহাস লেখেন, টিক্কা খান ঢাকায় ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তরে আমাকে বলেন, তিনটি নীতি বাস্তবায়ন করছেন তিনি। ১. বাঙালিরা 'অবিশ্বস্ত' তাই পশ্চিম পাকিস্তানিরাই তাদের শাসন করবে ২. বাঙালিদের ইসলামীকরণ করতে হবে ৩. হিন্দু নিধন ও নির্মূলের পর তাদের সম্পদ দরিদ্র মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ...ইয়াহিয়া ও টিক্কা তাদের এ রকম কর্মসূচির প্রতি এ পর্যন্ত বাঙালি আইনজীবী মৌলভি ফরিদ আহমেদ, ফজলুল কাদের চৌধুরী ও জামায়াতে ইসলামীর প্রফেসর গোলাম আযমের সমর্থন পেয়েছেন [জুলাই ৮, ১৯৭১, কংগ্রেশনাল রেকর্ড, পৃ. ২৪০৯৯]।

১৯৭১ সালের ১৪ জুলাই সিডনি এইচ শ্যানবার্গ *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ লিখেছেন, সেনাবাহিনীর সৃষ্টি করা শান্তি কমিটিকে সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের অনুগত ও সহায়তাকারী হিসেবে পরিচিত মুসলিম লিগ ও জামায়াতে ইসলামীর মতো ডানপন্থী ধর্মীয় দলের অনুসারীরা রয়েছে (১৪ জুলাই, ১৯৭১ কংগ্রেশনাল রেকর্ড, পৃ.৩)। এর মাত্র ১২ দিন পর ১৯৭১ সালের ২৬ জুলাই মার্কিন কংগ্রেসে শুনানিতে পেশ করা হয়েছিল কেবল শান্তি কমিটির ওপর তৈরি একটি বিশেষ প্রতিবেদন। ১৯৭১ সালের ২৩ জুলাই *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ প্রকাশিত লি লেসকেজের তৈরি করা ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, 'শান্তি কমিটির সদস্যরা বাস্তবে অত্যন্ত ক্ষমতাধর ছিল। কাউকে গ্রেপ্তার বা হত্যা করতে তাদের তরফে সেনাবাহিনীর কাছে একটি শব্দ উচ্চারণই যথেষ্ট ছিল (২৬ জুলাই ১৯৭১, কংগ্রেশনাল রেকর্ড, পৃ. ২৭১৩৪)। নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যুদ্ধাপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেও তারা তাদের ওয়েবসাইটে লিখেছে, গোলাম আযম শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন।

আমি আমার অনুসন্ধানে দেখেছি, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে পাকিস্তানি আর্মি ও জামায়াতইজমের কোনো অমিল নেই। বরং জামায়াতই বুদ্ধিজীবী নিধনকে ইসলামের দোহাই দিয়ে একে প্রকারান্তরে ধর্মযুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। বাঙালি মুসলমানের বর্ণ, গোত্র ও রক্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার বিষয়টিকে ধর্মের বাতাবরণে যথার্থতা দিয়ে জামায়াত মুসলিম সভ্যতাকেই কলঙ্কিত করেছে।

পাকিস্তানি লেখক হুসেইন হাক্কানিও ভালি নসরকে সমর্থন করেছেন। হাক্কানি তাঁর *পাকিস্তান : বিটুইন মস্ক অ্যান্ড মিলিটারি* গ্রন্থে লিখেছেন, সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের অবাঙালি বেসামরিক নাগরিক ও পাকিস্তানপন্থী ইসলামি গ্রুপগুলোর মধ্য থেকে এক লাখ রাজাকার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী বিশেষ করে তার ছাত্র শাখা ইসলামি জমিয়ত-ই-তালাবা (আইজেটি) দুটি আধা সামরিক কাউন্টার ইনসার্জেন্সি ইউনিট গঠনে সামরিক বাহিনীর প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। আইজেটি বিপুলসংখ্যক ব্যক্তির নিয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৫০ হাজার রাজাকারের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিম

পাকিস্তানের সেক্যুলার রাজনীতিকেরা অভিযোগ করেছিলেন যে এটা হলো 'অ্যান আর্মি অব জামায়াতে ইসলামি নমিনিজ।' ইসলামি ক্যাডারদের দুটি স্পেশাল ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় আলশামস (আরবিতে সূর্য) এবং আলবদর (চন্দ্র)। পরে পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি রাজাকারদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: একটি পৃথক রাজাকার ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল...দুটি পৃথক শাখার নাম ছিল আলবদর ও আলশামস। আলবদরকে স্পেশালাইজড অপারেশনস বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

সিনডি সি. কম্বস ও মার্টিন স্ট্যান্ড *এনসাইক্লোপিডিয়া অব টেররিজম* বইয়ে লিখেছেন ১০ হাজার বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে হত্যার সঙ্গে আলবদরের সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে।

> ১৯৭১ সালের মে থেকে জুলাইয়ের মধ্যে সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটির শুনানিতে বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রসঙ্গটি আসে। বলা হয়, 'পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, প্রফেসরস, আর্মি অফিসারস, ইঞ্জিনিয়ারস, ডাক্তার ও সম্ভাবনাময় অন্য যে কেউ' (পৃ. ১১৭)। এর ৩১২ পৃষ্ঠায় আছে, East Pakistanis accuse the West Pakistan Army of genocide—of the selected killing of Bengali intellectuals and of perpetuating a reign of terror so that they will be unable to raise effective opposition for many years to come.

সিডনি শ্যানবার্গের ২৩ সেপ্টেম্বরের *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ প্রকাশিত এই রিপোর্টও জুডিশিয়ারি কমিটি বিবেচনায় নিয়েছে, যেখানে তিনি বলেন, 'Moslem League and Jamaat-i-Islami, which have usually backed the military regime.'

ভালি নসর ১৯৯৬ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত মাওলানা মওদুদীর ওপর একটি বইয়ে মওদুদীকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি [*Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism*/Seyyed Vali Reza Nasr লিখেছেন, His discourse on the Islamic state deliberately sidestepped the ulama, depicting them as an anachronistic institution that had no place in a reformed and rationalized Islamic order.

কেমব্রিজ থেকে প্রকাশিত একটি বইয়ে প্রফেসর ক্রিশ্চিয়ান গারলেক উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যায় আলবদর জড়িত। তিনি যদিও মনে করেন পাকিস্তানি আর্মি বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সিস্টেমেটিক এক্সটারমিনেশন বা পদ্ধতিগত বিনাশ ঘটায়নি। কিন্তু তিনিও তাঁর বইয়ের ১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, একাত্তরের ডিসেম্বরে ঢাকা, খুলনা, সিলেট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২৮০ জন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী এবং সিভিল সার্ভেন্টদের অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় যারা ঘটিয়েছে, তারা হলো প্যারা মিলিটারি আলবদর।



ডেভিড লিউস লিখেছেন, বাঙালি 'রেসকে' দুর্বল করতে ধর্ষণকে পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। মাসকারেনহাস *দি রেপ অব বাংলাদেশ* বইয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোতে শেল ছুড়েছিল। কারণ, সেগুলো 'হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের' বলে চিহ্নিত হয়েছিল। আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের সংকটকে 'কতিপয় বুদ্ধিজীবীর' সৃষ্ট সমস্যা হিসেবে দেখেন (পৃ. ৭০)। টিক্কা খান 'কেবল ৩৫ হাজার বাঙালি বুদ্ধিজীবী' হত্যার কথা স্বীকার করেন (পৃ. ৭২)।

ইমন মারফি জামায়াতে ইসলামী (পৃ. ৭২)-এর পক্ষে সেনাবাহিনী, বিশেষ করে আইএসআইর সঙ্গে জোট বাঁধে এবং 'ইসলামের শত্রু' নিধনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে বলে উল্লেখ করেন।

মাসকারেনহাস তাঁর বইয়ের ২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '২৫ মার্চের পর দুই সপ্তাহের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত গণহত্যার ক্যাম্পেইন চলে। এর লক্ষ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বাঙালি বুদ্ধিজীবী।'

মার্কিন দলিল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জামায়াত তাদের রাজনৈতিক টার্গেট করেছিল। কারণ, জামায়াত ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে ধর্মবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ১৯৭০ সালের জুনে ঢাকায় শেখ মুজিব মার্কিন কূটনীতিক কিলগোরের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানে তার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জামায়াতের কাছ থেকে তিনি মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন (সূত্র: *দি আমেরিকান পেপারস*, ইউপিএল, ১৯৯৯, পৃ. ৩৬৭)।

আমেরিকান কূটনীতিকেরা জামায়াতকে কখনো গণতান্ত্রিক দল বলেনি। ১৯৭০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এক মার্কিন নথিতে জামায়াতকে 'ভোসিফেরাস এবং ফেনাটিক' এবং ১৯৭০ সালের ২২ জুন লাহোর থেকে পাঠানো অপর এক নথিতে জামায়াতকে 'রাইটিস্ট এক্সট্রিমিস্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন পিটার ডি কনস্টেবল।

মার্কিন ডকুমেন্টস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে বাঙালির বর্ণ ও গোত্রকে নিচু হিসেবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৫৬ সালে মওদুদী তাঁর প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরে পরে দেখিয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি মার্কিন কনসাল জেনারেল হার্বার্ট স্পিভাক এবং রবার্ট জে কার্লের সঙ্গে আলোচনা করেন। ক্যান্টনমেন্টে ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তরে এই বৈঠক হয়। এতে বাঙালিদের সম্পর্কে নিয়াজি যা বলেছেন, তার সত্যতা আবারও নিশ্চিত করেছেন প্রয়াত মেজর জেনারেল (অব.) খাদিম হোসেন রাজা। *A Stranger in My Own Country: East Pakistan, 1969-1971* (OUP,

2012)। ২০১২ সালে রাজার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত বইয়ে তিনি বলেন, নিয়াজি যে উক্তি করেছিলেন তা উচ্চারণে চেঙ্গিস খানও বিব্রত হতেন। পূর্ব পাকিস্তানের ১৪ পদাতিক ডিভিশনের সাবেক জিওসি নিয়াজির 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে he would let loose his soldiers on the women of East Pakistan till the lineage/ethnicity of the Bengali race was changed.

৪ আগস্ট ১৯৭১ নিয়াজির সঙ্গে আলোচনার পর ওয়াশিংটনকে স্পিভাক লেখেন, 'বাঙালিদের প্রতি জেনারেলের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই অবমাননাকর। ম্যাকুলেকে বরাত দিয়ে তিনি বলেন, বাঙালি মিথ্যুক, চোর, বিশ্বাসঘাতক এবং পেছন থেকে ছুরি মারা লোক। নিয়াজি লর্ড কার্জনের বরাতে বলেন, বেঙ্গল সব সময় নিচু ভূমির দেশ, এখানে নিচু জাতের ও মিথ্যুকরা বাস করে। জেনারেল তাঁর আলোচনায় কখনোই তাঁর মিশনের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি।'

কিন্তু মওদুদীই সেই ব্যক্তি, যিনি ১৯৫৬ সালে লিখেছেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ নোংরা। এর শিকড় গভীরে প্রোথিত করার জন্য জামায়াতের ছত্রচ্ছায়ায় আলবদর বাহিনী তাই বুদ্ধিজীবীদেরই টার্গেট করেছিল। আমেরিকার কংগ্রেসের একটি সাম্প্রতিক শুনানির জন্য প্রস্তুত একটি গবেষণাপত্রেও বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে আলবদরকেই চিহ্নিত করা হয়েছে।



খ্যাতি
বই আলোচনা
চিন্তা

# 'অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিন'

**আসজাদুল কিবরিয়া**

*ডিজঅ্যাপিয়ারিং প্যালেস্টাইন : ইসরায়েল'স এক্সপেরিমেন্ট ইন হিউম্যান ডিসপেয়ার*
জোনাথান কুক; লন্ডন; জেড বুকস লিমিটেড, ২০০৮।

ফিলিস্তিনিরা কি শেষ পর্যন্ত সত্যিই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাবে? ফিরে পাবে কি নিজেদের হারানো ভূখণ্ডের ওপর মালিকানার অধিকার? অন্যদের মতো তারাও কি ভবিষ্যতে নিজভূমিতে মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে? ঘুচবে তাদের ছয় দশকের বেশি সময়ের অপমান-লাঞ্ছনার উদ্বাস্তু-জীবন? সময় যত গড়াচ্ছে, এসব প্রশ্নের নেতিবাচক জবাবের পাল্লা যেন তত ভারী হচ্ছে। বরং প্রশ্ন আসছে, ফিলিস্তিনিরা কি নিয়মিতই শিকার হবে ইসরায়েলি বোমার? আর খাঁচায় বন্দী দীনহীন জীবনই তাদের শেষ পরিণতি? নিজভূমেও অধিকারহীন অবমাননাকর জীবন? এসব প্রশ্নের ইতিবাচক জবাবই যেন জোরদার হয়ে উঠছে ক্রমেই। ব্রিটিশ সাংবাদিক জোনাথান কুকও এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছেন দুই দশক ধরে। এই সময়কালে যেসব উত্তর খুঁজে পেয়েছেন, সেগুলো গুছিয়ে তুলে এনেছেন তাঁর *ডিজঅ্যাপিয়ারিং প্যালেস্টাইন* (অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিন)[১] গ্রন্থে। বইটার উপশিরোনাম হলো, 'ইসরায়েল'স এক্সপেরিমেন্ট ইন হিউম্যান ডিসপেয়ার' (মানুষে হতাশা নিয়ে ইসরায়েলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালনা)[২]। উপশিরোনামের মধ্য দিয়েই লেখক আসলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল কী করছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে, ইসরায়েল রাষ্ট্র কি না সে প্রশ্ন অবশ্য তোলা যায়। কেননা, আজ পর্যন্ত এই রাষ্ট্রটির সঠিক সীমানা চিহ্নিত হয়নি। তারপরও ইসরায়েল রাষ্ট্র তার জন্মের পর ৬৬ বছর অতিক্রম করছে, 'বিভিন্ন ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্রসহ পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা

সামরিকভাবে সুরক্ষিত; বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি (যে কি না জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এ পর্যন্ত ৩৯ বার ভেটো দিয়েছে ইসরায়েলের হয়ে) দ্বারা রাজনৈতিকভাবে সুরক্ষিত; যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী লবি ও বেশির ভাগ পশ্চিমা বিশ্বে একই রকম গোষ্ঠী দ্বারা সুরক্ষিত; বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া মুসলমান-বিরোধী মনোভাবে উল্লসিত হয়ে ইসরায়েল এখনো বেড়ে চলেছে।'[৩]

ইসরায়েলের এই বেড়ে চলা আসলে পরিকল্পিতভাবে ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এক নিরন্তর প্রক্রিয়াও বটে। জাতি বা গোষ্ঠী হিসেবে ফিলিস্তিনিদের দুনিয়া থেকে বাস্তবে একেবারে মুছে দেওয়া যদিও কখনোই সম্ভব হবে না। তবে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে ফিলিস্তিনের পতাকা ওড়ানোটা ক্রমেই অসম্ভবের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সাংবাদিক জোনাথান কুক তাঁর আলোচ্য বইটিতে এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন। বলপূর্বক ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এবং ফিলিস্তিনিদের নাকবার (বিপর্যয়) ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার বছরে ২০০৮ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তবে এর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা এখনো বহাল আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। লেখক এ প্রসঙ্গে ভূমিকায় বলেছেন, 'যে বছরটিতে দুনিয়া ইসরায়েলের ৬০তম জন্মবার্ষিকী "উদ্‌যাপন" করেছে, সে বছর এই ধরনের একটি বই জরুরিভাবে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। বেশির ভাগ পতাকা-নাড়া লোকজন ভুলে গিয়েছিল অথবা পাত্তাই দেয়নি যে এই বছরটি একই সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের নিজেদের আবাসভূমির বেশির ভাগটা হারানোর ৬০ বছরও বটে। কেননা, ঐতিহাসিক স্মৃতি থেকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড মুছে ফেলার ও এই ভূখণ্ডে মানুষের আবাসভূমিহীন উদ্বাস্তু থাকা নিশ্চিত করার জন্য গত ছয় দশক ধরে ইসরায়েল কাজ করে যাচ্ছে। ১০০ বছর ধরে চলা এই দ্বন্দ্বের অন্যতম ভয়াবহ বক্রাঘাত হলো, ফিলিস্তিনিরা শেষ পর্যন্ত জনগণ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও সত্যিকারের একটি রাষ্ট্র পাওয়ার জন্য তাদের সুযোগ একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে। ফিলিস্তিনিরা হয়তো ছায়া থেকে উত্থিত হবে, কিন্তু ফিলিস্তিন হারিয়ে গেছে। একটি "প্রক্রিয়ার" শেষ হিসেবে একটি "ফিলিস্তিন রাষ্ট্র" নিয়ে অশেষ কথা বলা হলেও তা আসলে এখন স্বপ্ন ছাড়া আর দৃশ্যমান কিছু নয়।' (জোনাথান কুক, ২০০৮, পৃ. ৯-১০)।

## ২.

জোনাথান কুক ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের ভেতর থেকে প্রতিবেদন করছেন, বিশ্লেষণ লিখছেন। বিলেতের *গার্ডিয়ান* ও *অবজারভার* পত্রিকায় কাজ করার পর ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নিজের মতো (ফ্রিল্যান্স) সাংবাদিকতা করছেন। বসবাস করছেন ইসরায়েলের নাজারেথ শহরে। খুব কাছ থেকে ফিলিস্তিনিদের



প্রতিদিনকার দুর্দশা দেখেছেন ও দেখছেন। গভীরভাবে ইসরায়েলের শাসকগোষ্ঠী, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও নাগরিকদের চিন্তাভাবনা পর্যবেক্ষণ করেছেন, কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন। এখনো করে যাচ্ছেন। ফিলিস্তিনিদের ছয় দশকের বেশি সময়ের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস নিবিড়ভাবে জেনেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন। জোনাথান কুকই বিশ্বে একজন বিরল পশ্চিমা সাংবাদিক, যিনি ফিলিস্তিন-ইসরায়েল বিরোধ-সংঘাতের ওপর সবচেয়ে ভালো জানেন ও বোঝেন। তিনি এই বিষয়ে কাজ করাটাকে পেশাদারির পাশাপাশি কিছুটা নৈতিক জায়গা থেকেও নিয়েছেন। দুর্দশাগ্রস্ত ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা অনেক সময়ই তাই পশ্চিমাদের নিন্দা-সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু জোনাথান কুক তথ্য-উপাত্ত ও দলিল-প্রমাণাদির বাইরে গিয়ে বাড়তি কোনো কিছু করেননি। তবে দলিল-তথ্যাদির ভিত্তিতে ঘটনাপরম্পরা বিশ্লেষণে তিনি যেসব উপসংহারে এসেছেন, অনেকেই তা পারেননি। আসলে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল বিরোধ-সংঘাত নিয়ে গত ছয় দশকে লাখ লাখ প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা হয়েছে, হাজার খানেক বই লেখা হয়েছে। এর বেশির ভাগই ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল পশ্চিমা ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের লিখিত। এসব লেখার অনেক আবার অন্ধভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন করে লেখা, ইসরায়েলের যাবতীয় অন্যায় কর্মকাণ্ডকে নৈতিক, আইনি ও আন্তর্জাতিক বৈধতা দেওয়ার প্রয়াসে লেখা। সেই সঙ্গে আছে ইতিহাস বিকৃতির নিরন্তর প্রয়াস। এর বিপরীতে ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ-দুর্দশার ইতিহাস ও পথপরিক্রমা নিয়ে লেখার সংখ্যা কম। বিশেষ করে ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে ইতিহাস বিকৃতির ও মিথ্যাচারের বিপরীতে জোরালোভাবে লেখা ও গবেষণা। এর একটি কারণ হলো পশ্চিমা গণমাধ্যম ও শিক্ষায়তনগুলোয় এসব কাজকে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন না করা। বরং বস্তুনিষ্ঠ কাজকে নানাভাবে নিন্দা-সমালোচনার মধ্যে ফেলে নিরুৎসাহিত করা, এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন তোলা আর এসব কাজকে সিমেটিক-বিরোধী প্রচারণা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে ইসরায়েলের কোনো সমালোচনা করলেই তাকে সিমেটিক-বিরোধী[৪] আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এটিও একটি পরিকল্পিত চর্চা, যা ভূরাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জোনাথান কুকও একই রকম আখ্যা পেয়েছেন, নিন্দাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু তিনি দমে যাননি।

আসলে নাজারেথ শহরে অবস্থান করে সেখান থেকে স্বাধীনভাবে প্রতিবেদন ও নিবন্ধ লেখার কাজটির পেছনে কুকের নিজস্ব কিছু যুক্তি আছে।[৫] প্রথমত, নাজারেথ হলো ইসরায়েলের ভেতরে সংখ্যালঘু ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর রাজধানী। এখান থেকে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের ঘটনাপ্রবাহগুলো ভিন্নভাবে দেখা যায়। ইসরায়েলের ভেতরে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের (যারা ইসরায়েলি নাগরিক,

তবে সব অধিকার পায় না) সঙ্গে পশ্চিম তীর ও গাজায় অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনিদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য দুটোই আছে। কেননা তারা সবাই জায়নবাদীদের অব্যাহত নৃতাত্ত্বিক নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়ার হুমকির মুখে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ বিদেশি সাংবাদিক জেরুজালেম অথবা তেল আবিবে অবস্থান করে নিত্য সংঘাত-বিরোধের সংবাদ সংগ্রহ করছেন ও লিখছেন। অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আছেন, যাঁরা পশ্চিম তীরের রামাল্লাহ শহরে থাকেন। এসব জায়গা থেকে সংগৃহীত খবরাখবরগুলো সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের সম্পাদকদের কিছু পূর্ব ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়। এঁরা বিশ্বাস করেন যে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত ভালোভাবে অনুধাবন করা সম্ভব শুধু ১৯৬৭ সালে ইসরায়েলের পশ্চিম তীর ও গাজা দখল করে নেওয়ার পর থেকে ঘটনাপ্রবাহ অনুসরণের মাধ্যমে। এ কারণেই এসব গণমাধ্যম ইসরায়েলের 'নিরাপত্তা' নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলের যে কর্তব্য রয়েছে, তা অবজ্ঞা করার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। একই কারণে ইসরায়েলি নাগরিক হিসেবে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ-দুর্দশার বিষয়টি বেশির ভাগ সাংবাদিকের মাথায় আসেই না। তৃতীয়ত, ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা চলছে এবং এটি যে এই সংঘাতের মূলে রয়েছে, তাও অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। পশ্চিমা গণমাধ্যমও এ বিষয়ে কথা বলতে বা লেখা ছাপতে অস্বস্তি বোধ করে। লন্ডন ও অন্যান্য পশ্চিমা গণমাধ্যম, যেখানে একসময় জোনাথানের লেখা ছাপা হতো, তারা ক্রমেই তাঁর সম্পর্কে সতর্ক হয়ে ওঠে। ইসরায়েলের ভেতরকার ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে তিনি লিখতেন, তা এসব পত্রপত্রিকার জন্য অস্বস্তিকর হয়। কেননা, বেশির ভাগ পশ্চিমা গণমাধ্যমই মনে করে যে ১৯৬৭ সাল থেকে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের সূত্রপাত। ১৯৪৮ সালের প্রসঙ্গ চলে এলে বা ইসরায়েলের ফিলিস্তিনি নাগরিকদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরলেই পত্রিকাগুলো পিছিয়ে যায়।

অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ মদদে যখন ইসরায়েল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়, তখন এই ভূখণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল ফিলিস্তিনি। আর এক-তৃতীয়াংশ ছিল ইহুদি। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট বা ব্রিটিশ-শাসিত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডটির ওপর ১৯৪৮ সালের ১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শেষ হয়। ব্রিটিশরা এই ভূখণ্ডটি ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে এর ৫৮ শতাংশ নবঘোষিত ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দ করা হয়। অবশ্য তার আগেই ওই বছর ১৫ মে ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি অবশ্য ব্রিটিশদেরই দেওয়া। '১৯১৭ সালে যে মুহূর্তে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর জায়নবাদী আন্দোলনকে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় আবাস গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিলেন,



সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি এক অশেষ সংঘাতের দ্বার খুলে দিলেন, যা শিগগিরই দেশটি ও তার জনগণকে গ্রাস করে। তাঁর সরকারের নামে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাতে বেলফোর অ-ইহুদি জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সুরক্ষারও প্রতিশ্রুতি দেন, যা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি এক অদ্ভুত মনোভাবের প্রকাশ। কিন্তু এই ঘোষণা ফিলিস্তিনিদের জাতিসত্তা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জন্মগত অধিকারের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে সংঘাতপূর্ণ। ১৯২০-এর শেষ দিকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই প্রস্তাব সহিংসতা ডেকে আনবে। ইতিমধ্যে কয়েক শ ফিলিস্তিনি ও ইহুদির প্রাণহানি হয়েছে। আর তাই ব্রিটিশরা কিছুট অনীহা সত্ত্বেও ধূমায়িত সংঘাত সমাধানে পদক্ষেপ নিতে তৎপর হয়।'[৬] সোজা কথায়, ব্রিটিশরা এই সমস্যা তৈরিতে এক বিরাট ভূমিকা রেখেছে এবং সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করিয়ে ফিলিস্তিনিদের সীমাহীন দুর্ভোগে ফেলে সেখান থেকে সরে এসেছে।

মনে রাখা দরকার যে বেলফোর ঘোষণার সূত্র ধরে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য দুই দফা পরিকল্পনা দিয়েছিল দুটো ব্রিটিশ কমিশন। ১৯৩৭ সালে পিল কমিশন যে বিভাজন পরিকল্পনা দেয়, তাতে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের ৩০ শতাংশ ইহুদিদের প্রদানের কথা বলা হয়। পরের বছর দুটো বিকল্প বিভাজন পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এভাবে ক্রমাগত বিভাজন ও সংঘাতকে উসকে দেওয়া হতে থাকে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে আসে। এই যুদ্ধের সময় সংঘটিত হলোকাস্টে ৬০ লাখ ইহুদির প্রাণহানি হয়। এটিকে ইহুদিদের নিজেদের আবাসভূমির দাবির বিরাট এক যৌক্তিকতা রূপে ভিত্তি দেওয়া হয়। আর ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের অনুরোধে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিন বিভাজন পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যেখানে ভূখণ্ডটিকে 'আরব রাষ্ট্র, ইহুদি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে জেরুজালেম'—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। আরবরা এর বিরোধিতা করে। এদিকে ইউরোপ থেকে ইহুদি অভিবাসীর স্রোত তখন ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বিরাট আকার ধারণ করেছে ব্রিটিশ সরকার নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করলেও তা সেভাবে কাজে দেয়নি। বরং ইহুদি রাষ্ট্রের দাবিতে ইহুদি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। জায়নবাদী[৭] নেতারা তাঁদের মদদ দিতে থাকেন। আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের দুই মাস আগে ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ ডেভিড বেন গুরিয়ান ও অন্যান্য শীর্ষ জায়নবাদী নেতা গোপনে মিলিত হন ফিলিস্তিনিদের নৃতাত্ত্বিক শুদ্ধি অভিযান[৮] চরমে তোলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে। এর সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় প্ল্যান দালেত (প্ল্যান ডি)। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৩০-এর দশকে, যখন ন্যাশনাল মিলিটারি অর্গানাইজেশন ও স্টার্ন গ্যাঙের মতো ইহুদি সন্ত্রাসী বাহিনীগুলো গঠন করা হয়। প্ল্যান ডির অংশ

হিসেবে ফিলিস্তিনি গ্রাম ও শহরগুলোয় বোমা হামলা ও লুটতরাজ চালিয়ে মানবশূন্য করে ফেলা হয়, যেন ন্যূনতম আরব জনগোষ্ঠী নিয়ে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইসরায়েলের সবচেয়ে বেশি সময়ের ও প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ান ১৯৩৭ সালেই লিখেছিলেন, 'আরবদের অবশ্যই চলে যেতে হবে। এ জন্য একটা সুযোগময় মুহূর্ত সৃষ্টি করতে হবে। যেমন একটি যুদ্ধ।' তিনি কঠোর নির্দেশনা জারি করেছিলেন এই বলে, 'প্রতিটি আক্রমণ শেষ হতে হবে দখল, ধ্বংস ও বিতাড়ন দিয়ে।' আর তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে পরবর্তী সময়ে দার ইয়াসিনের মতো গণহত্যা সংঘটিত হয়। তেল আবিব, হাইফা, জেরুজালেম ও অন্যান্য এলাকায় গ্রামের পর গ্রাম ও শহর হামলা চালিয়ে উজাড় করে ফেলা হয়, যা কিনা আট লাখ ফিলিস্তিনিকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে। হাজার হাজার নিরীহ বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়, যার বেশির ভাগটাই হয় ঠান্ডা মাথায়। সম্প্রদায়ের নেতাদের বিশেষভাবে নিধনযজ্ঞে আনা হয়। সকল প্রকার দুর্ভোগ নিয়ে ফিলিস্তিনিদের 'নাকবা' শুরু হয়। ইসরায়েলের যুদ্ধবীর মোশে দায়ান দম্ভভরে তাই লিখে গেছেন, 'আরব গ্রামগুলোর স্থলে ইহুদিদের গ্রাম গড়ে উঠেছে। আপনি ওসব আরব গ্রামের নাম জানবেন না। কেননা, সেগুলোর আর কোনো অস্তিত্বই নেই। এই দেশে এমন একটি স্থানও নেই, যেখানে আগে আরবরা থাকত না।' আসলে এটা ছিল পদ্ধতিগত ও নৃশংসভাবে ফিলিস্তিনি মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের নৃতাত্ত্বিক শুদ্ধি অভিযান, যা কিনা ৬০ বছর আগে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদি রাষ্ট্র তৈরি করেছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিশ্চিহ্নকরণ শেষ হয় ইসরায়েলের স্বাধীনতাযুদ্ধের পর, দেশটির ভেতরে থেকে যাওয়া ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত থাকে।[৯]

## ৩.

বইটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে চারটি অধ্যায়ে লেখক মূলত জায়নবাদের উত্থান ও ইহুদিদের নিজের আবাসভূমির নামে ফিলিস্তিনিদের মাটি দখল করে তাদের বিতাড়িত, নির্যাতিত ও অবরুদ্ধ করে রাখার কৌশল ও প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন সময়ে তিনি যেসব বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, সেগুলো থেকে বাছাইকৃত কিছু নিবন্ধ ঠাঁই পেয়েছে। সাংবাদিক হিসেবে তিনি যেভাবে কাছ থেকে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা ও ইসরায়েলি রাষ্ট্রযন্ত্রের সহিংসতা ও কূটচাল প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনাসহ বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ রয়েছে। যেহেতু এসব ঘটনা ২০০১ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে সংঘটিত, তাই এখন পড়তে গেলে কিছুটা ধাক্কা খেতে হয়। তবে ঐতিহাসিক বিবরণী হিসেবে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। বরং এখনকার



পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে প্রতীয়মান হয় যে বারবার একই ঘটনা ঘটছে। আর তা ঘটানো হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা বাড়ানোর জন্য। স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইকে নিস্তেজ করার জন্য।

জোনাথান কুক বইটি রচনায় সাংবাদিক ও বিশেষজ্ঞের দক্ষতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। যাঁরা ফিলিস্তিনি ট্র্যাজেডি সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন এবং যাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন বিরোধের পটভূমি জানেন, তাঁদের জন্য বইটি সুপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। কুক এই বইয়ের মাধ্যমে যে থিসিস বা প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, তা এ রকম: 'ইসরায়েলি নীতির লক্ষ্য হলো ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনিদের চিরতরে মুছে ফেলা।' তথ্য-উপাত্ত, যুক্তি ও বিশ্লেষণ দিয়ে এই প্রতিপাদ্য প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠা করা খুব সহজ কাজ নয়। ইতিহাস যখন খুব নিবিড়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়, তখন অনেক সময়ই তা দুর্ঘটনার জোড়াতালি বলে প্রতীয়মান হয়। আর তাই প্রকৃত কাজটি কঠিনতর হয়ে ওঠে। কুক কঠিনতর কাজটি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। এ জন্য তিনি প্রচুর বই ও নথিপত্র ঘেঁটেছেন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি জড়ো করেছেন। এরপর সেগুলোর বিন্যাস ঘটিয়েছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন।

কুকের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন মেলে আরও অনেকের বিশ্লেষণেই। যেমন ভারতীয় বিশ্লেষক জন চেরিয়ানের ভাষায়, 'ইসরায়েল সৃষ্টির আগে ৫০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি গ্রাম যে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, তা যেন বিশ্ব ভুলে যায়, ইসরায়েল এটাই চাইছে। আরও চাইছে, পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতির অব্যাহত সম্প্রসারণ। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা তাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য থেকে সরে আসেনি। তাই তারা ইসরায়েলের "মেমোরিসাইড" মোকাবিলায় ক্রমাগত নিজেদের কথ্য ইতিহাস, লেখনী ও সাহিত্যের দিকে জোর দিয়ে যাচ্ছে। অসলো চুক্তির তামাশা ও ২০০০ সালে ক্যাম্প ডেভিড পদক্ষেপের পর তা আরও জোরালো হয়েছে। এই দুটি ঘটনাই ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলের ও তার গুরুদের দ্বিচারিতার প্রকাশ ঘটেছে।...পশ্চিমা বিশ্ব বরাবরই এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে যে আক্রান্তরা নয়, বরং আগ্রাসীরাই ভুক্তভোগী হচ্ছে। ইসরায়েল পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে বসতি স্থাপন ও সম্প্রসারণ বিনা বাধায় অব্যাহত রাখছে আর ফিলিস্তিনিরা শান্তিপ্রক্রিয়া অবনমনের জন্য দায়ী হচ্ছে।'[১০] ইসরায়েলি শান্তিবাদী আন্দোলনের সংগঠক ও লেখিকা ইয়ায়েল লোটান তাই লিখেছিলেন, 'জায়নবাদকে সফল হতে হলে অবশ্যই নির্দয় হতে হবে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে এর নেতারা এমনটাই ঘোষণা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদি নেতাদের মনে হলো যে ইউরোপে ইহুদিদের যেভাবে গণহত্যা করা হয়েছে, তারপর আর অন্য কারও প্রতি কোনো সদয় বিবেচনা দেখানো থেকে তারা (ইহুদিরা) যেন ছাড় পেয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধে সংঘটিত হলোকাস্ট ও অচিন্তনীয় ধ্বংসযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে তাই কয়েক ডজন গ্রামবাসীকে গণহত্যা এবং কয়েক হাজার বেসামরিক ক্ষুব্ধ মানুষকে গণহারে নতুন সৃষ্ট সীমান্তের ওপারে বিতাড়িত করার মতো ঘটনাগুলো প্রায় উপেক্ষিতই হয়েছে। ডেভিড ও গোয়ালিথ কাহিনি, মিসর থেকে ইসরায়েলিদের বিতাড়িত হওয়া এবং পবিত্র ভূমিতে ইসরায়েলিদের প্রত্যাবর্তনের মতো কাহিনিগুলো বাইবেলের সঙ্গে মিলিয়ে জায়নবাদী বিবরণ তৈরি করা হয়েছে, যা কি না পশ্চিমা বিশ্বের কল্পলোকে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং পশ্চিমারা ইসরায়েলকে আঁকড়ে ধরেছে এবং সব ধরনের সুবিধা প্রদান করেছে। পশ্চিম জার্মানি থেকে ব্যাপক প্রত্যাবর্তন ইসরায়েলকে নিখাদ অবকাঠামো গড়তে সহায়তা করেছে আর জনসংখ্যা দ্রুতই বহুগুণ হয়েছে ইউরোপ ও আরব বিশ্ব থেকে ইহুদিদের অভিবাসনের জোয়ারে।'[১১]

## ৪.

বইয়ের প্রথম খণ্ডে কুক সংঘাতের একটি সুবিন্যস্ত পরিক্রমা তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের অভ্যুদয়ের অনেক আগে জায়নবাদের বেড়ে ওঠার ইতিহাস থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠার ছয় যুগ পেরিয়ে এসে পশ্চিম তীর ও গাজাকে পরীক্ষাগার বানিয়ে ফিলিস্তিনিদের গুম করার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইসরায়েল চালিয়ে যাচ্ছে, তার বিবরণী এতে ঠাঁই পেয়েছে। কুক দেখিয়েছেন, জায়নবাদীরা গোড়া থেকেই জাতি বা গোষ্ঠী হিসেবে ফিলিস্তিনিদের অস্বীকার করার একটি নীতি গ্রহণ করে। 'ফিলিস্তিনিদের জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি জানানো ছিল এমন একটি আদর্শিক ধারণার অপরিহার্য উপাদান, যেখানে ফিলিস্তিনে কোনো অ-ইহুদির উল্লেখযোগ্য অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। গত শতকের শেষ দিকেই জায়নবাদীরা এই ধারণা জনপ্রিয় করে তুলতে শুরু করে যে ফিলিস্তিন একটি "শূন্য ভূমি", যা কিনা ইহুদিদের উপনিবেশ হওয়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে' (পৃ. ২২)। কিংবা জায়নবাদীদের আরেকটি যুক্তি হলো, 'ফিলিস্তিনিরা কখনোই জনগোষ্ঠী হিসেবে বিরাজ করত না, কেননা তারা হলো আরব, যা কি না একটি বৃহত্তর জাতির অংশ আর মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে রয়েছে' (পৃ. ১৪)। তবে জায়নবাদীদের এই ধরনের বক্তব্য ও প্রচারণা যে মিথ্যা তা তারা নিজেরাও জানে। তবু ভূখণ্ড দখলের ব্রতে বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের ভেতর এই মিথ্যাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। আবার এই মিথ্যা নিয়ে জায়নবাদী ইহুদিরা চিন্তিত, তা তাদের কথা ও কাজেই ফুটে উঠেছে। ইসরায়েলের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী গোল্ড মায়ার ১৯৬৯ সালে বিলেতের *সানডে টাইমস*-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সেই কুখ্যাত মন্তব্য করেন : 'ফিলিস্তিনি বলে কোনো কিছু ছিল না। কখন একটি স্বাধীন



ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠী নিয়ে একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ছিল? হয়তো এটা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে দক্ষিণ সিরিয়ায় আর তারপরে ফিলিস্তিন ছিল জর্ডানকে নিয়ে। এটা এমন নয় যে একটি ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠী ফিলিস্তিনে ছিল, যারা নিজেদের ফিলিস্তিনি জনগণ ভাবত আর আমরা এসে তাদের বিতাড়িত করে তাদের দেশ তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিই। কখনোই তাদের অস্তিত্ব ছিল না' (পৃ. ১৮)। কুকের বক্তব্য হলো, 'যদি গোল্ড মায়ারের পর্যবেক্ষণ যে ফিলিস্তিনিদের "কখনোই অস্তিত্ব ছিল না" ব্যাপকভাবে গৃহীত হতো, বাস্তবে ইসরায়েলের এই নীতি প্রয়োগ হতো না। ১৯৪৮ সালের পর ইসরায়েল পদ্ধতিগতভাবে মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিনিদের এলাকার নামগুলো অপসারণ শুরু করে যেন সাবেক ফিলিস্তিনিদের উপস্থিতির বিষয়টি অদৃশ্য করে দেওয়া যায়। সরকার একই প্রক্রিয়ায় সরকারি মানচিত্র থেকে সবুজ রেখা মুছে ফেলতে থাকে। সবুজ রেখা হলো জর্ডানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুসারে পশ্চিম তীরের সঙ্গে সীমানা রেখা, যা কি না ইসরায়েলের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। স্কুলের পাঠ্যবই থেকেও সবুজ রেখা তুলে দেওয়া হয় বৃহত্তর ইসরায়েলকে সরকারি স্বপের মধ্যে না রেখে শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতায় নিয়ে আসার জন্য' (পৃ. ৫৫)।

কুক বলছেন যে বৃহত্তর ইসরায়েলের মানে হলো পশ্চিম তীর ও গাজাকেও শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলে বিলীন করে ফেলা। তাই বইয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশজুড়ে আছে পশ্চিম তীর ও গাজাকে ঔপনিবেশীকরণের ইতিহাস, যার শুরু ১৯৬৭ সালে। ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধের পর মিসরের কাছ থেকে সিনাই ও গাজা, জর্দানের কাছ থেকে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম আর সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান উপত্যকা দখল করে নেয়। পরবর্তী সময়ে ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তি অনুসারে মিসর সিনাই ফেরত পায়। কিন্তু বাকি এলাকাগুলো ইসরায়েলের দখলেই থেকে যায়। এটি আজও অব্যাহত আছে ভিন্ন রূপে। দখল করার পর ধীরে ধীরে শুরু হয় ইহুদি বসতি স্থাপন, যেন বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের জীবন কঠিন থেকে কঠিনতর করে ফেলা যায়। কুক লিখছেন, 'যদি পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে বেশির ভাগ ফিলিস্তিনিকে বিতাড়িত করা না যায়, তাহলে ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। ইসরায়েলের একই সঙ্গে দুটি জিনিস প্রয়োজন : জীবনযাপন অসহনীয় করে তুলে ফিলিস্তিনিদের অভিবাসনকে উৎসাহিত করা এবং অধিকৃত ভূখণ্ডে খালি হওয়া জমিতে ইহুদিদের উপনিবেশ গড়ে তোলা' (পৃ. ৬০)। সমস্যা হলো, দখলকৃত ভূখণ্ডগুলো ইসরায়েলে সংযোজন করে নিতে গেলে আন্তর্জাতিক নিন্দা ও চাপের মুখে পড়তে হয়, আবার এই ভূখণ্ডের অধিবাসী ফিলিস্তিনিদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়, যা ইহুদি রাষ্ট্রে ইহুদিদের আনুপাতিক হার কমিয়ে দেয়। এই দুই সমস্যা মোকাবিলায় কিছু কূট কৌশলের আশ্রয় নেয় জায়নবাদী রাষ্ট্রটি।

প্রথমত, তারা 'গোপনে সংযোজন' (ক্রিপিং অ্যানেকজেশন) নীতি গ্রহণ করে। ১৯৭০-এর দশকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান তাই ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'তোমরা কুকুরের মতো বেঁচে থাকবে আর যখন ইচ্ছে চলে যেতে পারো। আমরা দেখব পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকে।... পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা হয়তো দুই লাখ মানুষ কম পাব, আর তা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ' (পৃ. ৫৯)। তবে এই গোপন সংযোজনের কাজেও আন্তর্জাতিক আইন বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, 'সামরিক দখলদারির ক্ষেত্রে অধিকৃত ভূখণ্ডের বেসামরিক জনগণের অধিকার হেগ রেজল্যুশন ও চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন দ্বারা সুরক্ষিত। এসব কনভেনশনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো: অধিকৃত ভূখণ্ডে দখলদার রাষ্ট্র নিজেদের জনগণকে স্থানান্তর করতে পারবে না এবং অধিকৃত ভূখণ্ডের বিদ্যমান আইন মানতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো দখলকৃত ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, জনসংখ্যাগত ও ভৌত বাস্তবতা নিজেদের অনুকূলে পরিবর্তন করা থেকে দখলদারি শক্তিকে বিরত রাখা। কিন্তু ইসরায়েলে তো এসব কাজই করা দরকার। কেননা, পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করে এই ভূখণ্ডগুলো বৃহত্তর ইসরায়েলে বিলীন করতে হবে। আইনজীবীতে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে ইসরায়েল তাই আন্তর্জাতিক আইন অপব্যবহার করাকে বৈধতায় রূপ দিতে কোনো দেরি করেনি। ...ইসরায়েল যুক্তি দেখাতে থাকে যে পশ্চিম তীর ও গাজা আসলে দখলকৃত নয়, প্রশাসিত ভূখণ্ড, যেগুলো কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌম আইনের অধীনে ছিল না এবং ইসরায়েল সেগুলো যুদ্ধে অধিগ্রহণ করেছে। জর্ডান ও মিসর উভয়েই ১৯৪৮ সাল থেকে এই দুই ভূখণ্ড দখল করে ছিল। আর তার আগে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে শাসিত হতো' (পৃ. ৬১-৬২)। যদিও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও আইন বিশেষজ্ঞ ইসরায়েলের তৈরি করা জেনেভা কনভেনশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেনি, তার পরও দেশটির ভেতরে তা বেশ সমর্থন পায়। কিছু পশ্চিমা দেশও নীরবে এই ব্যাখ্যা মেনে নেয়।

কুক দেখিয়েছেন যে এভাবে আইনি মারপ্যাঁচ দিয়ে দখলকৃত ভূখণ্ডগুলো শাসনের নামে এখানে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের জমি-সম্পত্তি-বাগান থেকে শুরু করে জলাধার ও রাস্তাঘাট নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনিদের জন্য এক আইন আর ইহুদিদের জন্য আরেকটি—এই চর্চা শুরু হয়। 'অবশ্যই দখলকৃত ভূখণ্ডগুলোয় ইহুদি উপনিবেশ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ সম্ভব হতো না যদি বসতি স্থাপনকারী সেটেলাররা একই ধরনের আইন ও শাসন প্রয়োগের সম্মুখীন হতো, যা কি না ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত। এসব ভূখণ্ডে ইহুদিদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা আইনকানুন চালু করে ইসরায়েল এই সমস্যার সমাধান করে ফেলে' (পৃ. ৬৭)। একই ভূখণ্ডে দুই জনগোষ্ঠীর একটি ইহুদি, আরেকটি আরব



বসবাস করলেও দুটি ভিন্ন আইনি ব্যবস্থা দ্বারা প্রশাসিত হওয়ার এই চর্চা আন্তর্জাতিকভাবে বর্ণবাদনীতি হিসেবে স্বীকৃত। তবে ইসরায়েলের সেরা আইন বিশেষজ্ঞরাও এটি মানতে অস্বীকার করেছেন। এভাবে ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক, রাজনৈতিক ও মানবাধিকার কেড়ে নেয়। শুধু তা-ই নয়, 'ইসরায়েল একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ লুটে নেয়। যেমন সামরিক আদেশ ৯২ দ্বারা দখলকৃত ভূখণ্ডের সব পানির ওপর ক্ষমতা ইসরায়েলি সেনা কর্মকর্তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় যেন ইসরায়েল সব পাহাড়ি ভূগর্ভস্থ জলাধার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা কালক্রমে দেশটির বহনযোগ্য পানির অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে ওঠে। তদুপরি এই আদেশ অনুসরণ করে পশ্চিম তীরকে ইসরায়েলি পানি সরবরাহ গ্রিডে যুক্ত করা হয়, যা কার্যত দুই অঞ্চলের পার্থক্যকে অস্বীকার করার শামিল হয়। ১৯৭৯ সালের পর পশ্চিম তীরের পানির দায়িত্ব সামরিক সরকারের হাত থেকে ইসরায়েলি পানি কোম্পানি মেকোরোতের হাতে দেওয়া হয়' (পৃ. ৬৯-৭০)।

ইহুদি আবাস গড়ে তোলার জন্য জমি দরকার। ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে বলপূর্বক জমি কেড়ে নিয়ে নিন্দা কুড়ানোর চেয়ে আইনি কৌশলে জমি অধিগ্রহণ করা কম নিন্দনীয়—এই নীতি অনুসরণ করে ১৯৬৭ সালের পর পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জমি কেড়ে নেওয়া হতে থাকে। কুক দেখিয়েছেন যে ১৯৪৮ সালের নাকবার সময় যেসব ফিলিস্তিনি বিতাড়িত হয়েছিল, তাদের জমি পরিত্যক্ত দেখিয়ে দখলে নেওয়া হয়েছে। ইসরায়েল এমনভাবে আইন তৈরি করে যেন ওসব ফিলিস্তিনি বা তার উত্তরাধিকারীরা আর কখনোই জমির ওপর অধিকার দাবি করতে না পারে।

## ৫.

ইসরায়েল একদিকে বসতি স্থাপন করেছে, অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের সকল প্রকার অধিকার ক্রমাগত অস্বীকার করেছে, ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিরোধকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছে আর তাই সামরিক অভিযান যুক্তিসংগত প্রমাণের চেষ্টা করেছে। স্বাধীন ফিলিস্তিন বলে কোনো কিছুর অভ্যুদয় যেন হতে না পারে, সে জন্য নানা ধরনের কূটচাল অব্যাহত রেখেছে। ১৯৬৭ সাল থেকেই দখলকৃত ভূখণ্ডগুলোর বিষয়ে ইসরায়েলের সরকার ও নীতিনির্ধারকেরা বিভিন্ন সময়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। তবে পশ্চিম তীর ও গাজাকে পৃথক রাখার বিষয়ে কখনোই কোনো দ্বিমত হননি। কুক লিখেছেন যে একপর্যায়ে 'জর্ডান বিকল্প' ও 'মিসর বিকল্প' নিয়ে বেশ চিন্তাভাবনা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম তীরকে জর্ডানের সঙ্গে আর গাজাকে মিসরের সঙ্গে যুক্ত করে সীমিত স্বাধীনতা দেওয়া। ২০০৫ সালে

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়াল শ্যারন গাজা থেকে ইহুদি বসতি ও সেনা প্রত্যাহার করে নেন। সে সময়ই 'শ্যারন চেষ্টা করেছিলেন ফিলিস্তিনকে দুই ভাগে ভাগ করতে বা তাঁর কথামতো দুই ছোট্ট ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র (মিনি স্টেট) গঠনের: পশ্চিম তীরে "পূর্বাঞ্চলীয় ফিলিস্তিন" আর গাজায় "পশ্চিমাঞ্চলীয় ফিলিস্তিন"। শ্যারন চেয়েছিলেন দুই ভূখণ্ডকে ভিন্ন মর্যাদা দিতে এবং দুইয়ের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ও ভৌত যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে। বরং প্রতিটি ছোট্ট রাষ্ট্র তার আরব দেশের পশ্চাদভূমি হিসেবে পরিচিত হবে, পশ্চিম তীর জর্ডানের আর গাজা মিসরের' (পৃ. ১১৮-১১৯)। কুক এই পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েল আসলে ফিলিস্তিনিদের দায়দায়িত্ব প্রতিবেশী দুটো আরব রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। একই সঙ্গে ইহুদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের দায়ও তাদের ওপর চাপানোর সুযোগ করতে চেয়েছে। এই পরিকল্পনা সফল না হওয়ায় ইসরায়েলের অবশ্য তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং পশ্চিম তীরে সবুজ রেখা ধরে প্রাচীর নির্মাণ অব্যাহত রেখে কার্যত পশ্চিম তীরকে সব দিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে গাজা থেকে বসতি ও সেনা প্রত্যাহার করা হলেও এর স্থল, সমুদ্র ও আকাশ—সবই অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইসরায়েল। গাজায় প্রবেশ করতে ও সেখান থেকে বের হতে হলে ইসরায়েলি সেনা প্রহরা অতিক্রম করতে হয়। গাজাবাসীর নিত্যপ্রয়োজনীয় ও চিকিৎসাসামগ্রীর চালান পুরোপুরি ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে। আর হামাস ২০০৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর পশ্চিমাদের সমর্থনে গাজার ওপর অবরোধ আরোপ করে রেখেছে ইসরায়েল। আর এ পর্যন্ত তিনবার[১২] ভয়াবহ সামরিক অভিযান চালিয়ে গাজায় হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছে, হাজার হাজার পুরুষ-নারী-শিশুকে পঙ্গু করেছে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে, খাদ্য-পানীয় নষ্ট করেছে, অবকাঠামো বিধ্বস্ত করেছে। তিনবারই হামাস প্রতিরোধের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে ও ইসরায়েলি ভূখণ্ডে রকেট ছুড়ে সামান্য কিছু ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে। তবে প্রতিবারই একটি যুদ্ধবিরতি হয়েছে।

আসলে ইসরায়েল ক্রমাগত অবরোধ-আক্রমণ-হত্যা চালিয়ে কী করতে চায়? ইসরায়েলি সমাজবিজ্ঞানী বারুখ কিমমারলিংকে উদ্ধৃত করে জোনাথান কুক লিখেছেন, 'প্রথমত, ফিলিস্তিনের নেতাদের ও বস্তুগত অবকাঠামোসহ গণবলয় ধ্বংস করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিবলয় ও যেকোনো স্বাভাবিকতা ও স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা ধ্বংস করে দিয়ে ফিলিস্তিনিদের প্রাত্যহিক জীবন উপর্যুপরি অসহনীয় করে তোলা। ...এ সবকিছুই নকশা করা হয়েছে ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাশা নামিয়ে আনার, তাদের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেওয়ার, পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করার, ইসরায়েলিদের কথামতো যেকোনো ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার এবং সর্বোপরি এই ভূমি থেকে স্বেচ্ছায় গণহারে অভিবাসী হওয়ার জন্য' (পৃ. ১৩৩)। কুক আরও



লিখেছেন, '১৯৭০-এর মাঝামাঝি সময়ে মোশে দায়ান বলেছিলেন যে "ফিলিস্তিন রাজনৈতিকভাবে শেষ হয়ে গেছে।" পরবর্তী তিন দশকে ইসরায়েলি নেতারা এটা নিশ্চিত করেছেন যে তাঁর মূল্যায়ন যেন সঠিক প্রমাণিত হয়। একই সঙ্গে তাঁরা সমালোচনা রুখতে সিমেটিক-বিরোধী স্পর্শকাতরতা ও যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতাকে কাজে লাগিয়েছে।' প্রফেসর ইউরাম শাহার দখলকৃত ভূখণ্ডে পরোক্ষভাবে ইসরায়েল নীতির সূত্র বর্ণনা করেছেন, যার মূল কথা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েলি নৃশংসতাকে তাৎক্ষণিক, অপদ্ধতিগত ও নিরাপত্তার প্রয়োজনজনিত হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের চোখ বুজে থাকবে। শাহারের ভাষায়: 'সেখানে কোনো গণহত্যা হয়নি, ভূখণ্ডের কোনো ব্যাপকভিত্তিক ধ্বংসযজ্ঞ হয়নি, কোনো গণধর্ষণ হয়নি, কোনো নির্যাতন শিবির হয়নি, কোনো গণ-অনাহার হয়নি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের পদ্ধতিগতভাবে নির্বাসনে পাঠানো হয়নি, সেখানে কোনো কসোভো বা রুয়ান্ডা হয়নি—এমন কোনো পরিস্থিতি দেখা দেয়নি, যে জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সক্রিয় হয়ে উঠবে।' অন্যভাবে বললে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েল দেখবে যে পলিটিসাইড (ফিলিস্তিনিদের গণ ও ব্যক্তিগত জীবন ক্রমাগত বিধ্বস্ত করে দেওয়ার নিরন্তর লড়াই) জেনোসাইডের প্রচলিত অর্থের (নির্যাতন শিবির ও হত্যাযজ্ঞ) সমার্থক না হয়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এটি চালিয়ে যাবে।[১৩] যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতি মাসে ইসরায়েলি বোমা হামলায় বা খাদ্য অবরোধে শত শত বা হাজার হাজার ফিলিস্তিনি না মরে ডজন খানেক করে ফিলিস্তিনি মারা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমা রাজনীতিকদের বিবেক পরিষ্কারই থাকবে। তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, যেমনটা বারুখ বলেছেন, জাতি হিসেবে ফিলিস্তিনকে চিরতরে অদৃশ্য করে দেওয়া। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে, দ্বিতীয় ইনতিফাদার দুই বছর পর ইসরায়েলের এক সাবেক বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল এইটান বেন এলিয়াহু ইসরায়েলি টেলিভিশনে ঘোষণা করেছিলেন, 'কালক্রমে এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা আমাদের কমিয়ে আনতেই হবে।' তাঁর এই নৃতাত্ত্বিক শুদ্ধি অভিযানের ভাবনা ১৯৪৮ সালে নেওয়া বেন গুরিয়ানের সেই নীতিরই শামিল, যখন বোমা মেরে, অনাহারে ফেলে ও পঙ্গু বানিয়ে, ভীতি সৃষ্টি করে ফিলিস্তিনিদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এলিয়াহুর ঘোষণার পাঁচ বছরের বেশি সময় পরে গাজার অধিবাসীরা এমন একটি ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা শুরু করেছে, যেখানে তাদের জ্বালানি, বিদ্যুৎ, ওষুধ এবং নিত্যদিনের খাবার ছাড়া সেই প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে হবে। পশ্চিম তীরেও যে ঘেটোগুলো বানিয়ে রাখা হয়েছে, সেগুলোও খুব একটা পিছিয়ে নেই। গাজার কমিউনিটি মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রামের ইয়াদ আল সেরাজ ২০০৮ সালের প্রথম দিকে এক ই-মেইলে লিখেছিলেন যে ইসরায়েলি

নীতি একপর্যায়ে মিসরকে বাধ্য করবে উপায়হীন হয়ে গাজা সীমান্ত খুলে দিতে। এরপর কী হবে? 'দলে দলে মানুষ কীভাবে ছুটে পালায়,[১৪] তা দেখার জন্য অপেক্ষা করুন', বলে সতর্ক করেছেন তিনি' (পৃ. ১৩৪-১৩৫)।

**৬.**

বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে জোনাথান কুক অনেক বিষয় সংক্ষেপে অবতারণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, দখলকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিরা কীভাবে প্রতিনিয়ত হয়রানি, নির্যাতন আর অবমাননার শিকার হচ্ছে। কাঁটাতারের বেড়া আর কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে তাদের। কার্যত খাঁচায় বন্দী জীবন। জীবিকার সন্ধানে সামরিক চেকপোস্টগুলো পেরিয়ে ইসরায়েলের ভেতর আসতে ও ফেরত যেতে কী নির্মমতার শিকার হতে হয় ছেলে-বুড়ো, নারী-শিশু সবারই। সামরিক কর্মকর্তাদের মর্জিমাফিক প্রবেশের অধিকার মেলে। কখনো গুনতে হয় বড় অঙ্কের অর্থদণ্ড, যা কিনা এক মাসের উপার্জনের চেয়ে বেশি। কুক দেখিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকার যেভাবে কালো মানুষদের জন্য 'বানতুসতানস' তৈরি করেছিল, তার চেয়েও অনেক খারাপভাবে ফিলিস্তিনিদের বসবাস করতে বাধ্য করছে। আর তাই ইসরায়েলের ভেতর বসবাসকারী ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলের নাগরিক হয়েও নানা বঞ্চনার শিকার। আর এদের নিয়ে প্রতিনিয়ত ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর ভয় যেন বাড়ছে। কেননা, এখনই ইসরায়েলের মোট জনসংখ্যা এক-পঞ্চমাংশের বেশি হলো এই ফিলিস্তিনিরা, যাদের ইসরায়েলি আরব বলে অভিহিত করা হয়। কেননা, ইসরায়েল ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে স্বীকার করে না। ভয় এ জন্য যে আরবদের জন্মহার বেশি এবং একপর্যায়ে তারা হয়তো সংখ্যায় ইহুদিদের সমান হয়ে যাবে এবং ছাড়িয়েও যেতে পারে। এই ইসরায়েলি আরবরা তাদের নাগরিক অধিকার নিয়ে ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছে। যদিও আইন করে আরবদের রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তার পরও নানা সামাজিক আন্দোলনে আরবরা যুক্ত হয়ে পড়েছে।

কুক আরও দেখিয়েছেন, কীভাবে সাংবাদিকেরা ইসরায়েলের ভাষ্যই নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করে চলেছেন প্রতিনিয়ত আর এড়িয়ে যাচ্ছেন ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার প্রকৃত কারণ ও ক্রমেই ফিকে হয়ে যাওয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন। কুক লিখেছেন, 'ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের স্বীকৃতি দেয়নি, দখলকৃত জনগণের ওপর বে-আইনি সহিংসতা চালানো পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং সম্প্রতি সময়ে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো বাতিল করেছে। দখলদারি প্রতিরোধ করার অধিকার ফিলিস্তিনিরা ত্যাগ করবে, এই আশা করার আগে গণমাধ্যম কি কখনো এই দাবি করবে যে ইসরায়েলকে এই তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে?' (পৃ. ২২৩)।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে অনেক আগেই তীব্র সমালোচনা করে আসছেন নোয়াম চমস্কি। নিজে ইহুদি হয়েও জায়নবাদ ও ইসরায়েলের অন্যায় কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচক এই মার্কিন ভাষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী নিজ দেশকে বারবারই সতর্ক করেছেন ইসরায়েলকে যুক্তিবুদ্ধিহীনভাবে সমর্থন করার ও মদদ দেওয়ার বিষয়ে। দুই দশকের বেশি সময় আগে তিনি বলেছিলেন, 'দ্বিমুখিতা পরিত্যাগ করাই হবে উপযুক্ত কাজ। হয় আমরা বৃহত্তর ইসরায়েল গঠনে সমর্থন দেব এবং এর ভয়াবহ পরিণতির নিন্দা করা থেকে বিরত থাকব, নয়তো আমরা এসব কাজের সহায়ক উপাদান ও অনুমোদন প্রত্যাহার করব এবং ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের বৈধ দাবি পূরণ হয়, সে জন্য কাজ করব। এটা এখনো সম্ভব যদিও সম্ভাবনা ক্রমেই কমে অপসৃত হচ্ছে। কেননা, প্রতিটি বছর পার হচ্ছে আর আমরা যে বৃহত্তর ইসরায়েল গঠন করছি তা শক্ত মাটি পাচ্ছে। এর সামরিক শক্তি ক্রমাগতভাবে বাড়ছে, যা কি না শুধু যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন থেকে পিছিয়ে আছে বলে মনে করা হয়। শিগগির হয়তো এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হতে হবে যেখান থেকে ফেরার উপায় থাকবে না। আর পরিণতিটা প্রযোজ্য হবে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের জন্য, এই অঞ্চলের জন্য, এমনকি সম্ভবত গোটা দুনিয়ার জন্য।'[১৫]

জোনাথান কুক দেখিয়েছেন যে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতিটা ক্রমেই এই না-ফেরার দিকেই যাচ্ছে, যার পরিণতি ভয়াবহ জেনেও আমেরিকাসহ পশ্চিমারা ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। দশকের পর দশক ধরে কত শত কূটনৈতিক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনোই অগ্রগতি হয়নি ফিলিস্তিনিদের। সেদিকে লক্ষ রেখে বইয়ের ভূমিকায় তাই লিখেছেন, 'একটি "প্রক্রিয়ার" শেষ হিসেবে একটি "ফিলিস্তিন রাষ্ট্র" নিয়ে অশেষ কথা বলা হলেও তা আসলে এখন স্বপ্ন ছাড়া আর দৃশ্যমান কিছু নয়। কূটনীতিকেরা একে "দিগন্ত" বলে অভিহিত করলেও ভুলে যাচ্ছেন অথবা খারাপভাবে বললে বোঝাচ্ছেন যে দিগন্ত সর্বদা রংধনুর মতো, যা কখনোই ধরা যায় না। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পথে অবশ্যই বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইসরায়েল, যে কিনা একটি স্বঘোষিত নৃতাত্ত্বিক রাষ্ট্র[১৬] আর যাকে কিনা বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সত্যভ্রষ্ট হয়ে গণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করে। এই বইয়ের যুক্তিগুলো থেকে এটা খুব পরিষ্কার হবে আর আমিও বিশ্বাস করি যে ইসরায়েল ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে কোনো শান্তি বা মিলনসাধন সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিলিস্তিন ও এর জনগণকে ফিরে আসতে দেওয়া হবে' (পৃ. ১০)।

দুই রাষ্ট্রের বা এক রাষ্ট্রের সমাধান নিয়ে যে বিতর্ক আছে, সেটি দিয়ে কুক তাঁর বইটি শেষ করেছেন। সেখানে তিনি উপসংহার টেনেছেন এভাবে, 'সত্যি কথা হলো, এক রাষ্ট্র এবং প্রকৃতই দুই রাষ্ট্র উভয় ব্যবস্থাই অসম্ভব। কেননা, ইসরায়েল

ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবেই আধিপত্য বিরাজ রাখতে চায়। তাই সমাধানের অন্তরায় ভূখণ্ড ভাগ করা নয়, বরং জায়নবাদ স্বয়ং যার আদর্শ হলো নৃতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব আর এটাই ইসরায়েলের বর্তমান গোঁড়ামি। যতক্ষণ পর্যন্ত জায়নবাকে কীভাবে পরাস্ত করা যায় এর সঠিক জবাব পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সমাধানের আশা নেই। এর সর্বোত্তম উপায় হলো দুই রাষ্ট্রের স্বপ্নে যারা মোহাবিষ্ট, তাদের মোহ কাটানো এবং ব্যাখ্যা করা যে শান্তিপ্রক্রিয়ায় ইসরায়েল কেন স্থায়ীভাবে মন্দ বিশ্বাসের জায়গায় আছে। অন্যভাবে বললে, আমরা যদি দুই রাষ্ট্র সমাধানের হোলি গ্রেইল[১৭] নিয়ে মাতামাতি থেকে নিজেদের বিরত করি, তাহলে হয়তো আমরা আমাদের শক্তিকে এমন কিছুতে কাজে লাগাতে পারব, যা কিনা হবে অধিক কার্যকর। সেটি হলো, ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলকে ও এটিকে মদদ দেওয়া জায়নবাদী আদর্শকে অস্বীকার করা। কালক্রমে জায়নবাদের মর্যাদাপূর্ণ মুখোশ হয়তো খসে পড়বে। আর জায়নবাদ বাদ পড়লে, এক বা দুই রাষ্ট্র গঠনের অন্তরায়ও চূড়ান্তভাবে অপসৃত হবে। অবস্থা যদি তা-ই দাঁড়ায়, তাহলে কেন ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি উভয়ের জন্য ন্যায্য সমাধানটির জন্য আমরা প্রচারণা চালাই না?' (পৃ. ২৫১)। বলাই বাহুল্য, কুকের কাছে ন্যায্য সমাধান হলো জাতি হিসেবে ফিলিস্তিনিদের পূর্ণ মর্যাদা, স্বীকৃতি ও সব অধিকার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা।

## টীকা ও তথ্যসূত্র

১. Disappearing Palestine

২. Israel's Experiment in Human Despair

৩. Sixty Years of Sin-Yael Lotan; *Frontline*, Vol-25, No-11, May 24-June 6, 2008.

৪. Anti-Semitic; সেমেটিক-বিরোধী বলতে বোঝায় ধর্মীয় বা নৃতাত্ত্বিক বা জাতীয় গোষ্ঠী হিসেবে ইহুদিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য, ঘৃণা বা সংস্কার। বাইবেলের ভাষ্য ধরে ইহুদিদের দাবি, যারা প্রাচীন হিব্রু সংস্কৃতির ধারক-বাহক, শুধু তারাই সেমেটিক জনগণ। আর সেই ধারায় একমাত্র ইহুদিরাই শুধু সেমেটিক। বলা যায়, এভাবেই জায়নবাদীরা ইহুদিদের সবার চেয়ে আলাদা ও অধিকতর মর্যাদাশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৫. বিস্তারিত রয়েছে জোনাথন কুকের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (http://www.jonathan-cook.net)

৬. Ilan Pappe, *The Ethnic Cleansing of Palestine*, Oneworld Publications, London; 2014. pp-13

৭. বস্তুত, ১৮৯৬ সালে থিওডর হারজেল এই জায়নবাদী ধারণার প্রবর্তন করেন এবং ইহুদিদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি স্থাপনের দাবি তুলে ধরেন। জায়নবাদের মূল কথা হলো, ইহুদিরা নিজেদের পবিত্র ভূমিতে ফিরে যাবে এবং সেখানে নিজেদের রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করবে। পবিত্র ভূমি বলতে জেরুজালেমকে (ইয়ারুশালেম) ঘিরে আশপাশের অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। জায়নবাদের আরও দাবি, এটা ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ভূমি (প্রমিজড ল্যান্ড) আর তাই ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুধু বৈধ কাজই নয়, এটি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইহুদিদের একটি অংশ এই ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরোধী। তারা মনে করে, এই রাষ্ট্র পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তৌরাতের নির্দেশনারও লঙ্ঘন। আর তাই তারা ইহুদিবাদ ও জায়নবাদকে কখনোই এক মনে করে না।

৮. Ethnic Cleansing

৯. John Cherian, 'The Catastrophe,' *Frontline*, Vol-25, No-12, June 7-20, 2008. pp 60-61

১০. John Cherian; ibid, 2008. pp-62

১১. Lotan, ibid, 2008.

১২. অপারেশন কাস্ট লিড ( ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮ থেকে ১৮ জানুয়ারি ২০০৯); অপারেশন পিলার অব ডিফেন্স (১৪-২১ নভেম্বর, ২০১২) এবং অপারেশন প্রটেকটিভ এজ ( ২০১৪)

১৩. ইসরায়েলি সমাজবিজ্ঞানী বারুখ কিমমারলিং 'জেনোসাইড' শব্দের বিকল্প হিসেবে 'পলিটিসাইড' উদ্ভাবন করেছেন এই অর্থে যে ইসরায়েলিরা গণহত্যা চালাচ্ছে না, তবে রাজনৈতিকভাবে ফিলিস্তিনিদের সব দিক থেকে ধীরে ধীরে শেষ করে দিচ্ছে।

১৪. Wait for the Exodus.

১৫. Noam Chomsky, *Fateful Triangle*, India Research Press, New Delhi, 2004. p-6.

১৬. A Self-Declared Ethnic State

১৭. Holy Grail-খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস অনুযায়ী যিশু খ্রিষ্টের শেষ নৈশভোজে ব্যবহৃত পবিত্র সুরাপাত্র।

বই আলোচনা

# কিসিঞ্জারের বয়ানে পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার রূপকল্প

**রেজওয়ান মাসুদ**

*ওয়ার্ল্ড অর্ডার : রিফ্লেকশনস অন দ্য ক্যারেক্টার অব নেশনস অ্যান্ড দ্য কোর্স অব হিস্ট্রি*—হেনরি কিসিঞ্জার, পেঙ্গুইন প্রেস, নিউইয়র্ক, প্রথম সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৪১।

বিশ্বরাজনীতি নানা দিক থেকে এক অস্থির সময় অতিক্রম করছে। মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্ত-পরবর্তী অস্থিতিশীলতা, ফিলিস্তিন সংকট, ইরান ইস্যু, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার-পরবর্তী অবস্থা, ইউক্রেন সংকট—এ রকম বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বনেতাদের মধ্যকার মতভিন্নতা স্পষ্ট। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের ক্ষণে সবাই যদিও অধিকতর স্থিতিশীল বিশ্বের আশা করেছিলেন, বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, গৃহযুদ্ধ, চীনের উত্থান, উগ্রবাদ—বিভিন্ন ইস্যু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আলোচিত হয়ে আসছে। ইসলামিক স্টেটের উত্থান মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই হুমকির সম্মুখীন করেছে। আলোচিত এ বিষয়গুলো কি শুধুই সাময়িক সংকটের প্রতিফলন? আঞ্চলিক বিভিন্ন ইস্যুতে বিশ্বনেতাদের ঐকমত্যে না আসতে পারা কি শুধু রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চলমান প্রতিযোগিতা নির্দেশ করে? আন্তর্জাতিক 'সিস্টেম'-এর ভিত্তি কি নড়বড়ে হয়ে পড়ছে? এসব প্রশ্নের ব্যাখ্যাসংবলিত উত্তর সাবেক প্রতাপশালী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার তাঁর *ওয়ার্ল্ড অর্ডার : রিফ্লেকশনস অন দ্য ক্যারেক্টার অব নেশনস অ্যান্ড দ্য কোর্স অব হিস্ট্রি* বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বরাজনীতির মোড় পরিবর্তনকারী কিসিঞ্জার তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বরাজনীতির বর্তমান সংকট ইতিহাসের দর্পণে বিম্বিত করে সহজভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন।

নয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বইটিতে কিসিঞ্জার বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার উৎপত্তি, বিবর্তন, বর্তমান সংকট এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কার কথা বিশদাকারে আলোচনা করেছেন। বিশ্বব্যবস্থার বর্তমান শক্তির বণ্টন নিয়ে রাষ্ট্রসমূহের অসন্তোষ ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে, যা বিভিন্ন সংকটের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। ভারসাম্যাবস্থায় অস্থিরতা দেখা দিলে রাষ্ট্রসমূহ আগের ব্যবস্থায় ফিরে যেতে তৎপর হয় অথবা শক্তির নতুন বিন্যাস খুঁজতে থাকে।[১] বিশ্বরাজনীতি তদারক করার জন্য রাষ্ট্রের ওপর সার্বভৌম অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নেই—এ কথা সর্বজনবিদিত। তার পরও রাষ্ট্রসমূহের কিছু নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে জাতীয় স্বার্থের ধারণার পরিবর্তন ঘটে, আর এ থেকে সৃষ্ট স্বার্থের সংঘাত সমগ্র ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের সম্মুখীন করে। বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের নানাবিধ ব্যবহারে সচেষ্ট থাকায় তা স্বাভাবিকভাবেই অন্য অনেক রাষ্ট্রের জন্য নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করে। উপরন্তু গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রসার, পরিবেশবিপর্যয়, গণহত্যা এবং সন্ত্রাসবাদে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার সার্বিক নিরাপত্তার ধারণাকে রাষ্ট্রসীমানার বাইরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত করে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রয়োজন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অভিন্ন অবস্থান। কিন্তু যেখানে স্বাধীনতা, সার্বভৌম, জাতীয় স্বার্থ, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ—এসব মৌলিক ধারণার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হচ্ছে তখন বিশ্বব্যবস্থায় শৃঙ্খলার অভাবের উত্থান অনিবার্য। কিসিঞ্জার তাঁর বইয়ের মাধ্যমে পাঠকদের এ বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

বইয়ের শুরুতে কিসিঞ্জার আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্তমান রূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বিশ্বব্যবস্থার প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক সিস্টেমে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।[২] শক্তির ভারসাম্য আনয়নের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রসমূহের বোঝাপড়া, যার অভাব বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে। শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সমঝোতার প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির প্রতি অভিন্ন শ্রদ্ধাবোধ। কিন্তু জাতিরাষ্ট্রসমূহের বিবর্তন এবং ইতিহাসের গতিধারা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, এ ব্যাপারে কখনোই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অভিন্ন সুর ছিল না। আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অন্তর্নিহিত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ফলে বৈশ্বিক পর্যায়ে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে, কিন্তু বর্তমানে তা এক দুর্বল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

## ১.

কিসিঞ্জার জাতিরাষ্ট্রসমূহের বিবর্তন উপস্থাপন করতে গিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আজকের সাফল্য হঠাৎ

করে বেড়ে ওঠেনি। জাতিরাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভবের আগে ইউরোপের একক সত্তা ছিল না। চার্চের শক্তিচর্চার কারণে সেখানে একধরনের শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে বটে, কিন্তু যুক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে পোপদের একচ্ছত্র আধিপত্য বেশি দিন টিকতে পারেনি। লেখক এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, ছাপাখানার আবিষ্কার এবং খ্রিষ্টধর্মের অভ্যন্তরীণ বিবাদ (পৃষ্ঠা-১৯)। প্রোটেস্ট্যান্টদের সংস্কারবাদী আন্দোলন তৎকালীন ইউরোপীয় বিশ্বব্যবস্থার ধারণাকে পাল্টে দেয়। ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের লড়াইয়ে সৃষ্ট ৩০ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮-১৬৪৮) আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অনুপস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরে। এ উপলব্ধি থেকে তৎকালীন বিশ্বনেতাদের প্রচেষ্টার ফলে 'ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় এবং সে সময় থেকে আধুনিক রাষ্ট্রধারণার উদ্ভব ঘটে।

ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি রক্ষার্থে তখন যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছিল, তার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপে স্বাভাবিক অবস্থাই বিরাজ করছিল। কিন্তু এ স্থিতিশীলতা তিনটি কারণে হোঁচট খায় বলে কিসিঞ্জার মনে করেন। এগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবাদের উত্থান, ১৮৫৬ সালে বিভিন্ন দেশে ঘটে যাওয়া বিপ্লব এবং ১৮৫৩-১৮৫৬ সালে সংঘটিত ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ (পৃষ্ঠা-৪৬)।

শক্তির ভারসাম্য নীতির কার্যকারিতা হারায় যখন রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় স্বার্থের ওপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। রাষ্ট্রনেতাদের নিয়ন্ত্রণহীন নীতি অনুসরণ করার পরিণামেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির মধ্য দিয়ে যদিও এ যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং লিগ অব নেশনসের সূচনা হয়, তবে চুক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বিশ্ববাসীকে দুই দশক পরে আরেক বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন করে। জার্মানি, ইতালি ও জাপানের অনিয়ন্ত্রিত আচরণকে তৎকালীন লিগ অব নেশনস সামলাতে পারেনি এবং 'সম্মিলিত নিরাপত্তার' ধারণা ব্যর্থ হলে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসব ব্যর্থতার ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ভারসাম্যহীন অবস্থার ভয়াবহ রূপ তুলে ধরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে ইউরোপ ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের মতো রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট 'কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি' আজ ইউরোপীয় ইউনিয়ন নাম ধারণ করে সুসংহত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ইউরোপের অবস্থান বৈশ্বিক রাজনীতির



কেন্দ্রবিন্দুতে এখন গুরুত্ব বহন করলেও আঞ্চলিক সংহতির প্রতি তাদের অধিক মনোযোগের ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কতটুকু মর্যাদা থাকবে, এ নিয়ে কিসিঞ্জার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন (পৃষ্ঠা-৬০)।

## ২.

মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সময় এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ইসলাম, খ্রিষ্ট, ইহুদি—এ তিন ধর্মের উৎপত্তিস্থল হিসেবে নীতিনির্ধারকদের কাছে এ অঞ্চল আলাদা গুরুত্ব পেয়ে আসছে। ধর্মীয় ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যবস্থার প্রতি পৃথক ধারণা পোষণ এ অঞ্চলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ আর ভবিষ্যতের কৌশলগত বিনির্মাণ—এ দুইয়ের মধ্যে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ দোলাচলে থেকেছে। বর্তমানে এসেও গোষ্ঠীগত সংঘাত, আধিপত্যের লড়াই, পবিত্র যুদ্ধের (Holy War) ধারণা মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। কেবল ভূরাজনৈতিক বিরোধ নয়, আদর্শিক মতপার্থক্য এ অঞ্চলের অস্থির রাজনীতির অন্যতম কারণ। ওয়েস্টফালিয়ান সিস্টেমের ন্যায় রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা আরব ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণার সম্মুখীন হয়। বর্তমানেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যকার অনৈক্য আন্তরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকিকে ক্রমেই দীর্ঘায়িত করছে।[৩] তৎকালীন বৃহৎ শক্তিসমূহ যে উপায়ে এ অঞ্চলের দেশগুলোকে বিভক্ত করেছিল, তার মধ্যেই সুপ্ত ছিল ভবিষ্যতের বিরোধের বীজ। লিগ অব নেশনসের ম্যান্ডেট সিস্টেম এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীসমূহের ঐতিহাসিক গোষ্ঠীগত ও নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য আমলে নেয়নি। ব্রিটিশ সরকারের বেলফোর ঘোষণা ফিলিস্তিন সংকটের সূত্রপাত ঘটায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা কিছুটা সুসংহত হয়। কিন্তু বিরোধী মতকে সহ্য করতে না পারা, বহুমুখী সমাজের ধারণা মেনে না নেওয়ার প্রবণতা এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অপরিণত করে রেখেছে। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে অভ্যন্তরীণ কারণে প্রায়ই মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহ কঠিন সময় অতিক্রম করেছে।

কিসিঞ্জার মধ্যপ্রাচ্যের এসব সংকটের কারণ হিসেবে আদর্শিক কারণকেই বড় করে দেখছেন। তাঁর মতে, মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ইসলামের অনুসারী জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রকে সার্বভৌম শক্তি হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয়। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি হুমকিস্বরূপ বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী এ অঞ্চলে শক্তি সঞ্চার করেছে। উদাহরণস্বরূপ লেখক আল-কায়েদা, আল নুসরাহ ফ্রন্ট, তালেবান, হিযবুত তাহরীর, আইএস, বোকোহারাম—এসব সংগঠনের নাম উল্লেখ করে

বলেছেন আদর্শিক কারণে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ধারণার প্রতি এদের অশ্রদ্ধার কথা (পৃষ্ঠা-৭৫)।

আরব বসন্তের ব্যাপক প্রসারের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রায়ণের যে আশা সৃষ্টি হয়েছিল, তা গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের বাস্তবতা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। স্বৈরাচারী শাসকদের পতন চাই—এ স্লোগান মধ্যপ্রাচ্যে জনজোয়ার তৈরি করলেও এর পরবর্তী বিকল্পের অনুপস্থিতি এ অঞ্চলকে আগের অবস্থাতেই নিয়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জনগণকে এক কাতার নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সংহতি নির্মাণ একটি আলাদা বিষয়। মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুডের উত্থান তাহরির স্কোয়ারের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলেই প্রতীয়মান হয়। সংখ্যালঘু বিরোধী মতকে দমন করার নীতি মুসলিম ব্রাদারহুডকে অজনপ্রিয় করে তোলে। সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদবিরোধী আন্দোলন মিসরের মোবারকবিরোধী আন্দোলনের মতো শুরু হলেও সিরিয়ার সংকটের মাত্রা আরও জটিল হয়ে প্রতীয়মান হয়। শিয়া-সুন্নি বিরোধ দেশটিতে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়, যার ফলে সিরিয়ার রাষ্ট্রকাঠামো আজ হুমকির সম্মুখীন হয়ে আছে। শুধু মিসর এবং সিরিয়াই নয়, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, মালি, বাহরাইনে ছড়িয়ে পড়া সংঘাতসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের অপরিণামদর্শী গণতন্ত্রায়ণের নিরীক্ষার ফল বলে কিসিঞ্জার বইতে উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা-১৭৮)। তাঁর মতে, শৃঙ্খলা জনমতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে না উঠলে তাকে চাপিয়ে দিলে তা বরং বিপর্যয় ডেকে আনে।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে কিসিঞ্জারের লেখনীতে এক দক্ষ কূটনীতিকের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যকার বিরোধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্ভবত সবচেয়ে জটিল একটি ইস্যুর নাম। মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য এই সংকট সমাধানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিসিঞ্জার এ সমস্যা নিরসনে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে এ দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পরিবর্তন, রাজনৈতিক ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির ভবিষ্যতের গতিপথ (পৃষ্ঠা-৮১)। এ দুই দেশের সমস্যা সমাধানে স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারাও এ সংকটের দীর্ঘসূত্রতার অন্যতম কারণ বলে লেখক মনে করেন। কিসিঞ্জার মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতার স্বার্থে সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করার জন্য বিশ্বনেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন। সিরিয়া এবং ইরাকের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়ে লেখক এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে



আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র যখন নিজস্ব জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়, তা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার ওপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। মিসর, ইয়েমেন, লেবানন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সুদান, সোমালিয়া, নাইজেরিয়ার মতো দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতার ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা আঞ্চলিক পর্যায় রাজনীতিতে উত্তাপের সৃষ্টি করে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এমন অস্থির অবস্থার প্রেক্ষাপট প্রকটভাবে বিদ্যমান। ধর্মীয় বিভেদকে ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে মিলিয়ে কৌশল নির্ধারণের ফলস্বরূপ ভবিষ্যতে এ অঞ্চলের সমস্যার রাতারাতি সমাধানের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় না। গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রসারের যুগে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায়ের স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের মূল কারণ খতিয়ে দেখার জন্য কিসিঞ্জার নীতিনির্ধারকদের পরামর্শ দিয়েছেন।

ইরানের পারমাণবিক অস্ত্রের কর্মসূচির ভবিষ্যতের ওপর মধ্যপ্রাচ্যের শক্তির ভারসাম্য অনেকখানি নির্ভর করছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ ব্যাপক প্রচেষ্টা চালালেও ইরানের জাতীয় মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান পারমাণবিক অস্ত্রের পক্ষে বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইরানের শক্তি অর্জন প্রতিদ্বন্দ্বী সৌদি আরবসহ তুরস্ক এবং মিসরের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করবে বলে কিসিঞ্জার মত দিয়েছেন (পৃষ্ঠা-৯৯)। এ প্রেক্ষাপটে ইরানকে হুমকির বদলে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসে বিশ্বনেতাদের এ সমস্যা নিরসনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আহ্বান করেছেন।

## ৩.

পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ওয়েস্টফালিয়ান সিস্টেমের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের আস্থা রয়েছে বটে, কিন্তু বিদ্যমান শক্তি বণ্টন নিয়ে এখানে কিছুটা অসন্তোষও বিরাজ করে। জাতীয় স্বার্থের ক্রমবর্ধমান পরিধি থেকে সৃষ্ট সংঘাত এ অঞ্চলে মাঝেমধ্যেই অস্থির রাজনীতির সৃষ্টি করে।[৪] চীন প্রাচীনকাল থেকেই আলাদা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থার প্রতি দেশটির পরিচয় খুব বেশি দিনের নয় বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রভাব এত বেশি ছিল যে দেশটি অন্য কোনো দেশকে সমকক্ষ বলে কখনো মনে করেনি। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে চীনা উত্থানের প্যাটার্ন লক্ষ্য করলে দেশটির জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মাও সেতুং চীনকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শক্তির মাধ্যমে সুসংবদ্ধ করেন। দেশটির পরবর্তী শাসকেরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে চীনকে বিশ্বরাজনীতিতে অভূতপূর্ব অবস্থায় নিয়ে আসেন। বর্তমান আন্তর্জাতিক সিস্টেমের 'রুলস অব দ্য গেম' নির্ধারণে শুরুর দিকে চীনের অংশগ্রহণ না থাকলেও

আন্তর্জাতিক সব ফোরামে দেশটি সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে (পৃষ্ঠা-১৩৩)। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে উদীয়মান শক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত শক্তির অলিখিত একধরনের প্রতিযোগিতা থাকে। সে প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের বিভিন্ন ইস্যুতে মতবিরোধকে কেবল দুটি দেশের শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করলে ভুল হবে বলে কিসিঞ্জার মনে করেন। তাঁর মতে, বিশ্বব্যবস্থার নীতিনির্ধারণে চীন সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে তার প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ভূমিকাকে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দিচ্ছে। উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতি চীনের গুরুত্ব না দেওয়ার মনোভাব মার্কিন মূল্যবোধের ভিত্তিমূলকে আঘাত করে। লেখক স্পষ্ট করে লিখেছেন যে বিশ্বের ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের শক্তির ভারসাম্যের ওপর, তবে তা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সহযোগিতার মনোভাব। দুই দেশের রাষ্ট্রনায়কদের উপলব্ধিতে আনা প্রয়োজন যে বর্তমানে কোনো একক দেশের পক্ষে খবরদারি করা সম্ভব নয়।

বর্তমান সময়ে এসে জাপান আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরাপত্তার স্বার্থে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনে সক্রিয় হতে চায় বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চীনা উত্থান দেশটিকে প্রো-অ্যাকটিভ পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় প্রভাবিত করে। জাপান কত দিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার গ্যারান্টিভুক্ত হয়ে থাকতে চাইবে, সেটি একটি প্রশ্ন হয়ে আছে। পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতার স্বার্থ জাপানের রাষ্ট্রনায়কদের ভাবনায় রাখতে হবে বলে কিসিঞ্জার মত প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তার ব্যাপারে ভারতকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে বলে কিসিঞ্জার মনে করেন। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে। অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশটি সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতেও পিছিয়ে নেই। কিসিঞ্জার মনে করেন, দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীল ভবিষ্যতের স্বার্থে ভারতের উচিত পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এবং চীনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা (পৃষ্ঠা-১২১)। একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভারত পুরো অঞ্চলে কৌশলী ভূমিকা পালন করতে চায় বলে প্রতীয়মান হয়। মোদির নেতৃত্বে ভারত পররাষ্ট্রনীতিতে জাতীয় স্বার্থ অনুসরণে আরও তৎপর হবে বলে তিনি মনে করেন। এশিয়ায় আন্তর্জাতিক সিস্টেম কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, তা নির্ভর করবে এ অঞ্চলের দেশসমূহের সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করার দক্ষতার ওপর। ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার বিবর্তনের ওপরও নীতিনির্ধারকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে বলে কিসিঞ্জার মনে করেন। আসিয়ানের মতো আঞ্চলিক সংস্থা এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভৌগোলিক



কারণেই পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ায় দুই ধরনের আঞ্চলিক নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে উঠছে, তবে তার দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা নির্ভর করছে দেশগুলোর দায়িত্বশীল আচরণের ওপর।

## ৪.

আন্তর্জাতিক সিস্টেমে নিয়ে আলোচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যতীত হলে তা পূর্ণতা পায় না এবং এ ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই কিসিঞ্জার তাঁর বইয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক কালের বিশ্বব্যবস্থার স্বরূপ নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গণতন্ত্র, মুক্তি, মানবাধিকারের ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব পরিচালনার মূল ভিত্তি বলে মনে করে। মনরো ডকট্রিনের সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্র নিজ সীমানার বাইরে প্রভাববলয় বিস্তারের নীতি পরিচালনা করে আসছে।[৫] মানবতার মুক্তি মার্কিন মূল্যবোধে নিহিত রয়েছে বলে মার্কিনিদের বিশ্বাস। কিসিঞ্জার এ বিষয়ে ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনা করতে গিয়ে থিওডর রুজভেল্ট, উড্রো উইলসন এবং ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সময়কালীন মার্কিন আধিপত্যের রূপ তুলে ধরেছেন (পৃষ্ঠা-১৪৬-১৬০)। এ তিন রাষ্ট্রনায়কই মার্কিন জাতীয় স্বার্থকে সম্প্রসারিত করেছেন, যা আজও মার্কিন নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করে বলে কিসিঞ্জার পাঠকদের জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সিস্টেমে নীতিনির্ধারণী ভূমিকা পালনে সব সময় সামনের সারিতে অবস্থান করেছে। বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে মার্কিনিরা নিজেদের অপরিহার্য বলে মনে করে থাকেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন ও আন্তর্জাতিক সামরিক নিরাপত্তাবেষ্টনী তৈরির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করে। মার্কিন বলয়ের দেশ রক্ষার্থে পরিচালিত নীতিকে যুক্তরাষ্ট্র নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করে। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বিরোধিতাকে দেশটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায়ের স্বার্থে প্রয়োজনীয় হিসেবে অভিহিত করে। কোরিয়ান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক ও আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে যুক্তরাষ্ট্র মূল্যবোধ রক্ষার ব্যাপারকেই বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। দেশটি জাতীয় স্বার্থকে মানবতার মুক্তির স্বার্থের সঙ্গে এক করে উপস্থাপন করে। শক্তির সঙ্গে মূল্যবোধের এ সংযোগের মাধ্যমে দেশটির শাসকেরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের ভূমিকা চলমান রেখেছেন। তবে সব সময় যে তা সুফল বয়ে এনেছে তা নয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রায়ণের নিরীক্ষা— এসব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র যা চেয়েছিল, তা অর্জন করতে পারেনি। দেশটির সম্পৃক্ততা কিছু

কিছু ক্ষেত্রে সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে বলে কিসিঞ্জার স্বীকার করেছেন। ইরাকের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা আজ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে অস্ত্রের বিস্তার সিরিয়াসহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের স্বল্পমেয়াদি স্বার্থলাভের বদলে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল বিবেচনায় নেওয়া উচিত বলে কিসিঞ্জার মনে করেন। নীতি প্রণয়নের জন্য দেশটির অন্যান্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিক, ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র কৌশলী হতে পারেনি বলে বিভিন্ন দেশে মার্কিন ভূমিকা সমালোচনার মুখে পড়ছে বলে লেখক মনে করেন, যা পক্ষান্তরে বিশ্বব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতাকে সামনে নিয়ে আসে। বহুমাত্রিক এসব সংকট উত্তরণে দেশটির উচিত শক্তিধর অন্য দেশগুলোকে অভিন্ন অবস্থানে নিয়ে এসে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা— কিসিঞ্জার এমনটি মনে করেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ভারসাম্য অবস্থা তৈরির দায়িত্ব দেশটির শাসকদের নিতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সেসব যুগের নীতিনির্ধারণে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যযুগে ধর্মের প্রভাব যেমন রাষ্ট্র পরিচালনায় অনস্বীকার্য ছিল, বর্তমানে তেমনি প্রযুক্তির প্রভাবকে কোনো রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারে না (পৃষ্ঠা-১৯২)। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার অকল্পনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় সীমানা আজ কোনো বাধা বলে মনে হয় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রসার নীতিনির্ধারকদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলো সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে কি না, সে প্রশ্ন ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন প্রযুক্তির সহজলভ্যতার ফলে একটি বাস্তবতা হয়ে দাড়াঁতে পারে—এ আশঙ্কাও রয়েছে। নন-স্টেট অ্যাক্টরদের তৎপরতা এবং আদর্শিক উগ্রপন্থা নিরাপত্তাব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। দূরত্বগতভাবে আজকের বিশ্ব ছোট হয়ে এসেছে বটে, তবে ঝুঁকিও এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। এ ব্যাপারে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর দায়িত্বশীল ভূমিকা কাম্য। সাইবার নিরাপত্তার ব্যাপারেও কিসিঞ্জার যুগোপযোগী কৌশল প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্মার্টফোনের যুগে কোনো ব্যক্তি যদিও সাইবার তদারকির বাইরে নয়, তবু ব্যক্তিপর্যায়ে আন্তদেশীয় যোগাযোগের সহজলভ্যতা সন্ত্রাসবাদের পরিধিকে বিস্তৃত করতে পারে।



তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ কোনো দেশ চাইলেই এখন আর বন্ধ করে দিতে পারে না। বাস্তবতা হচ্ছে, সাইবারস্পেস এখন অনেকটাই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রয়েছে।[৬] প্রযুক্তিনির্ভর সামরিক শক্তির যুগে সাইবার আক্রমণ বিশ্বপর্যায়ে প্রভাব ফেলতে পারে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট নীতির অনুপস্থিতির ফলে অপ্রত্যাশিত কোনো পরিণাম থেকে সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অভিন্ন অবস্থান থাকা প্রয়োজন বলে কিসিঞ্জার মনে করেন।

## ৫.

কিসিঞ্জার বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার যে বহুমুখী আশঙ্কার কথা উপস্থাপন করেছেন, তা বাংলাদেশের জন্য বার্তা বহন করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্নায়ুযুদ্ধের কূটকৌশলগত কারণে কিসিঞ্জার প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছেন। চীন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার তাগিদে এ দেশের সাধারণ মানুষের ওপর যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ নেমে এসেছিল, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদের বিচলিত করেনি। নিক্সন-কিসিঞ্জার প্রশাসন বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন।[৭] বাংলাদেশ সম্পর্কে কিসিঞ্জারের তলাবিহীন ঝুড়িবিষয়ক বক্তব্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু ৪৩ বছর পর কিসিঞ্জার আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিয়ে লিখতে বসে বাংলাদেশকে উপেক্ষা করতে পারেননি। দক্ষিণ এশিয়া আগামী দশকগুলোতে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। এ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রভাব ফেলতে বাধ্য। এমন প্রেক্ষাপটে কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য ভারতকে পরামর্শ দিয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য ভারতের দায়িত্বশীল ভূমিকাই কাম্য। কিন্তু বাংলাদেশকে এড়িয়ে গিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারসাম্য অর্জিত হবে না—কিসিঞ্জার এ বাস্তবতা তাঁর বইয়ে স্বীকার করেছেন।

বর্তমান আন্তর্জাতিক সিস্টেমে আরও কৌশলী ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদেরও ভাবা প্রয়োজন। ভূরাজনৈতিক অবস্থানের বদৌলতে বাংলাদেশ আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। জনশক্তি রপ্তানি, পোশাক শিল্পের বিশ্বব্যাপী প্রসার, আর্থসামাজিক বিভিন্ন সূচকে ভালো অবস্থানের কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের আলাদা ভাবমূর্তি অর্জিত হয়েছে। এমন অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় প্রো-অ্যাকটিভ ভূমিকা পালন করা উচিত। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার এবং এ নিয়ে

ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তি এখন আর অজানা নয়। ওবামা প্রশাসনের এশিয়াকেন্দ্রিক নীতির মূলে রয়েছে চীনের প্রভাব বিস্তারকে রোধ করা।[৮] চীন এবং ভারতের নৌবাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং অব্যাহত সামরিক শক্তির বৃদ্ধি এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার কথা জানান দেয়। জাপান, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কাসহ কয়েকটি দেশ তাদের নিরাপত্তাহীনতা এবং অসন্তোষের বার্তা দিচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগর ভূকৌশলগত দিক থেকে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করবে। আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শক্তির দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান শক্তির বণ্টন নিয়ে অসন্তোষ এবং নতুন দেশগুলোতে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ভারসাম্য অর্জনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে চীনের গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের প্রস্তাব, যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া, ভারতের 'ব্লু নেভি' প্রতিষ্ঠায় দৌড়ঝাঁপ, মিয়ানমারের পররাষ্ট্রনীতির দৃশ্যমান পরিবর্তন, রাশিয়া এবং জাপানের তৎপরতা—এ পদক্ষেপসমূহ এ অঞ্চলে এসব রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকেই নির্দেশ করে। ভূরাজনৈতিক এমন বাস্তবতায় বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর নজরে রয়েছে।

বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কী করণীয়? বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে কৌশলী ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশের কেমন প্রস্তুতি প্রয়োজন? কিসিঞ্জারের বই পাঠে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে এমন প্রশ্নের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি যুগোপযোগী এবং কৌশলী কর্মপরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। কোনো একটি নির্দিষ্ট শক্তির সঙ্গে জোটগত সম্পর্ক না করে বংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সময়ের দাবি। চীন এবং জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে গিয়ে যেমন ভারতকে এড়িয়ে চলা কার্যকর কৌশল হবে না; তেমনি ভারতকেন্দ্রিক হয়ে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ভুললে তা সমীচীন হবে না। অন্যদিকে, রাশিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যেমন সুসম্পর্ক বজায় থাকা প্রয়োজন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও কৌশলগত বন্ধনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের যে ধরনের যোগাযোগ থাকা দরকার তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশ্বের বৃহৎ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নজর এখন মিয়ানমারের দিকে। নীতিনির্ধারকদের উচিত হবে এ দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান অমীমাংসিত সমস্যার দ্রুত সমাধান করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কের টেকসই ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। তা ছাড়া নেপাল এবং ভুটানের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের সঙ্গে স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায়ের ক্ষেত্রেও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকদের লক্ষ্য থাকা দরকার। আন্তদেশীয় সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে তা দেশের বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি বাংলাদেশের স্বার্থে কার্যকরী হবে। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ বিশ্বের ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার হলে বাংলাদেশ সে দেশের পুনর্বাসনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। যথাযথ পরিকল্পনা আর কৌশলের মাধ্যমে এসব সুযোগ বাংলাদেশের স্বার্থে কাজে লাগানো যেতে পারে। আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশ নিজের ভূরাজনৈতিক অবস্থানকে কতটুকু কাজে লাগাতে পারে, তা নির্ভর করছে দেশটির প্রস্তুতির ওপর। তবে এর জন্য বিভিন্ন থিংক-ট্যাংক, একাডেমিয়া, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মধ্যে যে ধরনের সমন্বয় থাকা প্রয়োজন, তা এখনো দৃশ্যমান নয়। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিতে এখন থেকেই নীতিনির্ধারক এবং রাজনীতিবিদদের এ ব্যাপারে ভাবা প্রয়োজন।

বইয়ের শেষাংশে কিসিঞ্জার ইস্যুভিত্তিক সমস্যা সমাধানের ধারণা থেকে বের হয়ে ইতিহাস ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নীতি প্রণয়নের তাগিদ দিয়েছেন। অবাধ তথ্যপ্রবাহ হয়তো মুহূর্তের খবর জানিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা বিপুল তথ্যের সম্ভারে নীতিনির্ধারকেরা বিবেচনায় কতটুকু নিয়ে আসছেন—এ নিয়ে কিসিঞ্জার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বর্তমানের ধোঁয়াশা কাটিয়ে ভবিষ্যতের পথের আলোর দেখা পাওয়ার সার্থকতার মাঝে লুকিয়ে রয়েছে নীতি প্রণয়নের সফলতা। ডিজিটাল যুগে এসে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে কিসিঞ্জার ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনার ওপর জোর দিয়েছেন। বাস্তববাদ এবং আদর্শবাদের মধ্যকার ভারসাম্য বজায় রেখে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করলে দেশে দেশে স্বার্থের সংঘাত কমে আসবে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বজায়ের ক্ষেত্রে কিসিঞ্জার চারটি হুমকির কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রের ধারণার পরিবর্তন, বিশ্বপর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, শক্তিধর দেশসমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতভিন্নতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল এভাব। এ জন্য আন্তর্জাতিক সিস্টেমের পুনর্গঠন জরুরি বলে লেখক মনে করেন।

সবশেষে বলা যায়, হেনরি কিসিঞ্জারের *ওয়ার্ল্ড অর্ডার : রিফ্লেকশনস অন দ্য ক্যারেক্টার অব নেশনস অ্যান্ড দ্য কোর্স অব হিস্ট্রি* বইটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিবর্তনের গতিপথ সম্পর্কে নির্মোহ আলোচনার এক অকাট্য দলিল। লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে থাকলেও বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ পর্যালোচনা উপস্থাপন করছেন। কেবল বর্তমানের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে লেখক সংকটের মূল কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, যা পাঠকদের

বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে সহজে সামগ্রিক ধারণা দিতে সক্ষম। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখকের দুর্বলতাও খুঁজে পাওয়া যায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ কিংবা আফগানিস্তান যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুফল বয়ে আনেনি—এটি স্বীকার করলেও এসব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্তকে কিসিঞ্জার ভুল বলতে নারাজ। এ ছাড়া চীন, ভারত ও ইরান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেও বিশ্বব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়ার ভূমিকা নিয়ে লেখকের কম বাক্য ব্যয় পাঠকের চোখে পড়ে। এসব সীমাবদ্ধতা ব্যতীত কিসিঞ্জার তাঁর এ বইয়ের মাধ্যমে বিশ্বরাজনীতিকে একটি বইয়ের মাধ্যমে পাঠকের মাধ্যমে সহজে চিত্রায়িত করেছেন। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক যেকোনো পাঠকের মনের খোরাক জোগাতে বইটি অতুলনীয় ভূমিকা পালন করবে।

**তথ্যসূত্র**


1. Hans J. Morgenthau, (2005) *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, United States: McGraw-Hill, Seventh Edition, p. 180.
2. Kenneth N. Waltz, (1979) *Theory of International Politics*, United States: Addison-Wesley, p. 67.
3. Robert D. Kaplan, (2012) *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate,* New York: Random House, p. 181.
4. Rana Mitter, (2013) *China's War with Japan, 1936-1945: The Struggle for Survival,* London: Allien Lane Press.
5. Howard Zinn, (1980) *A People's History of the United States,* New York: Longman.
6. P.W. Singer, and A.Friedman, (2014) *Cyber Security and Cyber War: What Everyone Needs to Know*, Oxford: Oxford Universtity Press.
7. Gary J. Bass, (2013) *The Blood Telegram: Nixon, Kissinger and a Forgotten Genocide,* India: Random House, p. 237.
8. Robert D. Kaplan, (2014) *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific,* New York: Random House.




# লে খ ক প রি চি তি

**আলী রীয়াজ**

লেখক ও গবেষক। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির পলিটিকস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক। ক্লেফিন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিঙ্কন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা : *রিলিজিওন অ্যান্ড পলিটিকস ইন সাউথ এশিয়া* (রুটলেজ, ২০১০); *ফেইথফুল এডুকেশন: মাদ্রাসা ইন সাউথ এশিয়া* (রাটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮); *ইসলামিস্ট মিলিট্যান্সি ইন বাংলাদেশ: আ কমপ্লেক্স ওয়েব* (রুটলেজ, ২০০৮)।

**জন বেলামি ফস্টার ও রবার্ট ডব্লিউ ম্যাকচেনজি**

**জন বেলামি ফস্টার** *মান্থলি রিভিউ*-এর সম্পাদক এবং ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। **রবার্ট ডব্লিউ ম্যাকচেনজি** ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বিভাগের গাটসেল এনডাউড অধ্যাপক। তাঁরা *The Endless Crisis: How Monopoly-Finance Capital Creates Stagnation and Upheaval from the USA to China* (*Monthly Review Press, 2012*) বইয়ের সহলেখক।

**সৈয়দা রোযানা রশীদ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তিনি ঢাকা, অক্সফোর্ড ও সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি অভিবাসনের ওপর সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। তাঁর গবেষণায় বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছা অভিবাসন, লিঙ্গ, সামাজিক সুরক্ষা ও জীবিকা অন্তর্ভুক্ত। তিনি দেশে-বিদেশে অনেক বই, জার্নাল, আর্টিকেল প্রকাশ করেছেন।

**হোস ম্যাপ্রিল**

হোস ম্যাপ্রিল লিসবনে বাংলাদেশিদের মধ্যে বহুজাতিকতাবাদ ও ইসলাম বিষয়ে থিসিস নিয়ে লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পিএইচডি করেছেন। বর্তমানে নিউ লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক। তাঁর সম্প্রতি যৌথভাবে প্রকাশিত গ্রন্থ *Sites and Politics of Religious Diversity in Southern Europe* (2013)।

**মিজানুর রহমান খান**

সাংবাদিক, আইন বিশেষজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা : *তত্ত্বাবধায়ক সরকার : এর অশনিসংকেত* (আগামী, ২০০৯); *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক* (সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৫); *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড* (প্রথমা, ২০১৩)।

**আসজাদুল কিবরিয়া**

লেখক ও সাংবাদিক। বর্তমানে *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসে* পরিকল্পনা সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। অর্থনীতি বিষয়ে লেখালেখি বেশি করেন। ইতিহাসে আগ্রহী। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *অর্থনীতির অনর্থ* (জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৪); *ট্রানজিটের টানাপোড়েন* (জাগৃতি, ২০১২), *আমির তৈমুরের দেশে* ( দিব্য, ২০১২)। *ভাষা আন্দোলনের গল্প* (প্রজাপতি, ১৯৯৪) গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার।

**রেজওয়ান মাসুদ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ব্র্যাক ইয়াং প্রফেশনাল প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্ট এশিয়া স্টাডি সেন্টার এবং ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে দুটি গবেষণা প্রকল্পে শিক্ষানবিশ হিসেবে জড়িত ছিলেন। তাঁর আগ্রহের বিষয় আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, ভূ-রাজনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং উন্নয়ন।



# গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি গ্রাহক কার্ড দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

**সম্পাদক**
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১


LCBS Dhaka
Welcome to LCBS Dhaka!!!
We are proud to use "THE FIRST" statement:
– The first approved partner (Platinum) in Bangladesh
– The first ACCA CBE Centre in Bangladesh
– The first & only CIMA quality learning partner
– The first CIMA CBE Centre
– The first CIPFA approved Training Partner in the world and Exam Centre
With career development forum and training facilities along with Job Placement.
CIMA
CIPFA
Career Success
Job Placement
Jobebank3D.com
Corporate Training
Public Sector
&
Private Sector
Career Development Forum (CDF)
Exam Centres
ACCA (CBE)
CIMA (CBE)
CIPFA Exam
ACCA/CIMA
CIPFA
Your ONE STOP Career Solution
01746388644-46
www.facebook.com/lcbs.dhaka
www.linkedin.com/company/3008019
Elearning.lcbsdhaka.com
www.lcbsdhaka.com
House # 39/B, Road #14/A, Dhanmondi, Dhaka-1209


Call now 01977667766
একালীন পরিশোধে কাঠা প্রতি মূল্য
২,০৫,০০০/-
টাকা মাত্র!
আজই বুকিং দিন...
PURBACHAL
Sabuj Dhaka
Bestway GROUP
Bestway
Baridhara Zone: 01914702981; Panthapath Zone: 01973333121; Uttara Zone: 01914702983; Mirpur Zone: 01937403296; Shyamoli Zone: 01929917822; Moghbazar Zone: 01919168902; Motijheel Zone: 01929917863; Bongshal Zone: 01914702982; Chittagong Zone: 01939913772